ভুবনপুরের হাট

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

মার্চ
১৯৬১

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯
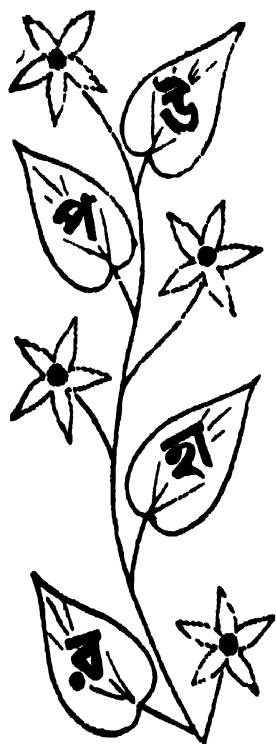
দাম—
[illegible] ২·০০

॥ এক ॥

সারালের হাঠ যাবা?
আমার ঝিন ঝিনি রোগ
নিয়ে যাবা?

একটা গ্রাম্য ছড়া। কাটোয়ার কাছে 'সালার'—লোকের জিভের ডগায় কিভাবে 'সারাল' হয়ে গেছে তা পণ্ডিতেরা বলতে পারেন। কিন্তু লোক সারাল বলে—এবং সালারের হাট বড় হাট প্রাচীন হাট; কারুর ঝিনঝিনি রোগ হলে লোকে বলে. সালারের হাটে গিয়ে বিকিকিনি করলে—বিশেষ করে বিক্রী করবার যদি কিছু থাকে তবে তার সঙ্গে নিজে থেকে 'ফাউ' দিয়ো, 'ফাউয়ের' সঙ্গে তোমার ঝিনঝিনি রোগ সেরে যাবে। কিনবার বেলায় যদি দু'পয়সা ন্যায্য দামের উপর একটা পয়সা বেশী গুঁজে দিতে পার তবে ঝিনঝিনি তার সঙ্গে দেওয়া হয়ে যাবে। সালারের হাটুরেরা না কি খুব সাবধান হয়ে জিনিস বিক্রি করে, কখনও এক পয়সা ঠকিয়ে নেয় না, নিলেই ঝিনঝিনি রোগ নেওয়া হয়ে যায়।

ভুবনপুরের হাট খুব পুরনো হাট। ভুবনপুর অনেকগুলো এ অঞ্চলে; গঙ্গার ধারে গঙ্গাভুবনপুর, ক্রোশ কয়েক পশ্চিমে বিপ্রভুবনপুর, তার ওধারে ছোটভুবনপুর। মাঠান অঞ্চলে শ্রীভুবনপুরের জমি বাংলাদেশের মধ্যে উর্বর, বিঘেতে বারো চৌদ্দ মন—ষোল মন ধানও ফলে। এক বিঘে জমির দাম ওখানে অনেক, আড়াই হাজার টাকাতেও বিক্রী হয়েছে, উৎকৃষ্ট কনকচূড় ধান ফলে তাতে· এ জমির কনকচূড়ে খই হয় নিটোল বড় মুক্তার মত। ধানে যখন শীষ বের হয় তখন সুন্দর গন্ধে বেশ খানিকটা জায়গা ভরে যায়। কিন্তু হাটের ভুবনপুর শুধু ভুবনপুর, ভুবনেশ্বর অনাদিলিঙ্গ আছেন—তাঁর নামে ভুবনপুর। বাইরের লোকে বলে শিবভুবনপুর, কিন্তু এখানকার লোকে বলে শুধু ভুবনপুর—আদি ভুবনপুর—বিশ্বেশ্বরের কাশী,

তারকনাথের তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথের দেবঘর, ভুবনেশ্বরের ভুবনপুর। শিবের সঙ্গে দুর্গার ঝগড়া হয়েছিল ; দুর্গা গয়না চেয়েছিলেন, কাপড় চেয়েছিলেন, শেষ শাঁখা চেয়েছিলেন। শিব বলেছিলেন—আমি ভিক্ষে ক'রে খাই ওসব কোথায় পাব ? এতে একবার দুর্গা রাগ করে বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন। তারপর শিব শাঁখারী সেজে শাঁখা পরাতে গিয়ে দুর্গার মান ভাঙিয়েছিলেন। কিন্তু এ ঝগড়া তো মিটবার নয়, দুর্গারও গয়নার সাধ, শিবও ভিক্ষে ছাড়া কাজ করবেন না। ফিরেবারের ঝগড়ায় না কি শিব বলেছিলেন—বাপু তোমাকেই তো লোকে দেবতাতে দৈত্যতে সকলে বলে তিনভুবনের মালিক। তা নিজেই নিজের ব্যবস্থা তো করতে পার। আমাকে ছাড়ান দাও—আমি আপনার ভিখ মেগে শ্মশানে-মশানে চিতের চুলোয় রেঁধে বেড়ে খেয়ে গাছতলায় পড়ে থাকব। দুর্গা শিবকে শিক্ষা দিতে বিশ্বকর্মাকে বললেন—তুমি ওই মণি-কর্ণিকার শ্মশানে শিব যেখানে ত্রিশূল গেড়ে বসেছে—ওইখানেই একরাত্রে আমার রাজধানী তৈরী কর। বিশ্বকর্মা তাই করলেন ; দুর্গা সেখানে এসে রাজ-রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা হয়ে বসে তিনভুবনের অন্ন হরণ করে কাশীতে অন্নকূট অন্নের পাহাড় তৈরী করে বললেন—যে হাত পাতবে, পাত পাড়বে সেই খেতে পাবে। শিব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ভিক্ষে না পেয়ে কাশীতে এসে অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষের অন্ন খেয়ে বাঁচলেন। কিন্তু মনের দুঃখ তো গেল না। মনে মনে ভেবে চিন্তে একদিন নন্দীকে ডেকে বললেন—নন্দী, আমিও এক রাজধানী তৈরী করব। নন্দী বললে—খুব ভালো হয় দেবতা—মায়ের ওই দুটো ঝি জয়া আর বিজয়ার মুখনাড়া আর সহ্য হয় না।

—কিন্তু গড়বে কে ? বিশ্বকর্মা বেটার মুরদ তো কাশী গড়া। ওর থেকে ভাল তো বেটা জানে না। আমার যে কাশী থেকে ভাল হওয়া চাই।

নন্দী বললে—ভাবনা কি দয়াময়। তোমার ভূতেরা রয়েছে। কত বেটা মন্দির-গড়িয়ে, কেল্লা-গড়িয়ে, রাজপ্রাসাদ-গড়িয়ে মরে ভূত হয়ে তোমার দরবারে রয়েছে। খাচ্ছে দাচ্ছে আর নাচছে তোমার ডম্বরুর তালে হরিনামের সঙ্গে। তাদের বলুন—দেবে বানিয়ে। বিশ্বকর্মা একরাত্রে বানিয়েছে, এরা এক প্রহরে বানিয়ে দেবে।

স্থপতি ভূতেরা শুনে খুব খুশী। বিশ্বকর্মাকে হারিয়ে দেবে। তারা বললে—ঠিক আছে ভূতভাবন আশুতোষ। দিচ্ছি বানিয়ে। শুধু গাঁজার হুকুম হয়ে থাক।

শিব বললেন—নন্দী, পাঁচশো মন গাঁজা দাও বেটাদের। আর শোন—কাশীর সঙ্গে কিচ্ছুর মিল থাকবে না। নদীর ধারে নয়, ডাঙ্গায় ; পাথরফাতর নয়, মণিমানিক স্ফটিক মর্মর কিছু না। স্রেফ মাটি ! আর আমার বাড়ীটা করবি, মাটির ভিত, বাতাসের দেওয়াল, আকাশের ছাদ ! আর তোদের জন্যে মস্ত কেল্লা। বেলগাছ ব্যারাক, বটগাছ ব্যারাক, শ্যাওড়াগাছ ব্যারাক। লোকেদের জন্যে বাড়ি, মস্ত দিঘী জলের জন্যে আর একটা বাজার।

ভুবনপুরের লোকে বলে—ক্ষ্যাপা শিবের ক্ষ্যাপা খেয়াল, ভূতের দলের ভূতুড়ে কাণ্ড, একপ্রহর নাই যেতে তেপান্তরের মাঠের উপর জলটলোমলো সরোবর ঘিরে গড়ে উঠল ভুবনপুর। সরোবরের ঘাটের উপর মড়ার খুলির ঢিপি মাটি দিয়ে ঢেকে তারপর গড়ে উঠল ভুবনেশ্বরের আটন। আজও বিশটা সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়। বাতাসের দেওয়াল আকাশের ছাদ সে লোকে দেখে না—দেবতায় দেখে। আর ভূতে দেখে। চারিপাশ ঘিরে বাবার ভূত-বাহিনীর কেল্লা বেল-মহল, বট-মহল তারই মধ্যে মধ্যে শ্যাওড়া-মহল। বেলবাগানে ব্রহ্মদৈত্য সেনাপতির দল, বটবাগানে ভূতবাহিনী এবং শ্যাওড়াগাছ মহলে প্রেত্নিনী বাহিনী বাসা নিলে। নন্দী ঢাক পিটিয়ে শিঙা বাজিয়ে মাটির ভুবনের মানুষদের জানিয়ে দিলে—ভুবনেশ্বরের ভুবনপুরে যারা বাস করবে তাদের ভূতের ভয় থাকবে না, প্রেত্নিনীদের নজর লাগবে না।

লোকেরা দলে দলে এল—মানুষে মানুষে ভরে গেল ভুবনপুর। কিন্তু বিপদ হল, খাবে কি ? অন্নপূর্ণা তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী কাশীতে, ভুবনপুরের দিকে পিছন ফিরে বসে আছেন। তখন শিব ডাকলেন গন্ধেশ্বরীকে। বললেন—গন্ধেশ্বরী, ভুবনপুরের মা হতে হবে তোমাকে। অন্নপূর্ণা আর লক্ষ্মীর অহঙ্কার ভাঙতে হবে। গন্ধেশ্বরী বললেন—বেশ ! বসলাম আমি বাজারে আটন পেতে। মুগ মসুর ছোলা লঙ্কা তার সঙ্গে মসলা এ এই ভুবনেশ্বরের হাট ছাড়া মিলবে না। অন্নপূর্ণা কাশীতে থাকুন চাল আর ধান নিয়ে।

ভুবনেশ্বর বললেন—আর এই কথা রইল, শিববাক্য—ভুবনেশ্বরে যা আসবে বিক্রীর জন্যে তা বিক্রী হবেই, ফিরে যাবে না। কুবেরের উপর আদেশ রইল সে কিনে নেবে সব।

তাই হল। ভুবনেশ্বরের হাট জমজমাট হয়ে উঠল। কুবেরের অনুচরেরা মনুষ্যজন্ম নিয়ে ভুবনপুরে গদি খুলে বসল। ধন্বন্তরীর শিষ্য এসে

বসল কবিরাজ হয়ে, রোগ নিয়ে এলে এখানেই ভাল হবে। না হলে ভুবনেশ্বরের মাটি আছে চরণোদক আছে।

দিকদিগন্তর থেকে লোক আসে। খবর আসে কাশীতে অন্নপূর্ণা না কি ভাবিত হয়েছেন। ভুবনেশ্বর বললেন—আমি যাচ্ছি না!

দেবতারা এলেন—প্রভু, কাশী ফিরে চলুন। এ কি ক্ষ্যাপামি করছেন!

ভুবনেশ্বর বললেন—কক্ষনো না। ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও না। আমি গন্ধেশ্বরীকে নিয়েই রাজত্ব করব এখানে!

দেবতারা হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। কয়েকদিন পরে গন্ধেশ্বরী কুবের দুজনে এসে শিবকে বললেন—মহা বিপদ!

—কি বিপদ?

—একটি সুন্দরী যুবতী এসেছে একটি ঝাঁপি নিয়ে। তার ভিতরে এনেছে তার মনের দুঃখ। কিন্তু সে কে কিনবে? আমরা কিনতে গেলাম, কিনে না হয় জলে ভাসিয়ে দেব। কিন্তু দাম শুনে পিছিয়েছি। সে দাম তো আমাদের কাছে নেই।

শিব বললেন—কি দাম চাইছে সে? রাজ্য? স্বর্গরাজ্য? মণিমাণিক্য?

—না দেবতা। বলে এক ঝাঁপি সুখ নিয়ে এক ঝাঁপি দুঃখ বেচব।

—এই কথা! এর আর কি? চল, দিয়ে আসি এক ঝাঁপি সুখ। বিষ গলায় আছে দুঃখটা নয় বুকে রাখব, চল।

শিব এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন তো মেয়ের রূপ দেখে হতবাক্। একটু সামলে নিয়ে বললেন—দাও তোমার দুখের ঝাঁপি!

—আগে ঠাকুর সুখের ঝাঁপি দাও।

—ওহে কুবের আনো, একটা ঝাঁপি আনো!

ঝাঁপি নিয়ে বললেন—এই ঝাঁপি আমার বরে তোমার মনের সুখে ভরে যাক। দাও এবার তোমার দুখের ঝাঁপি।

'মেয়ে সুখের ঝাঁপি নিয়ে দুখের ঝাঁপি দিয়ে শিবের জয় জয় ধ্বনি দিয়ে চলল—বললে—শিববাক্য সত্যি করতে শিবদূতরা কোথায় আছ—আমার পালানো স্বামীকে বেঁধে নিয়ে আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এস। স্বামীকে না পেলে মেয়েলোকের মনের সুখ কোথায়? হনহন করে চলতে লাগলেন কন্যে। এদিকে বেলগাছ শিমূলগাছ বটগাছ থেকে শিব-সৈন্যরা, পুরোভাগে স্বয়ং নন্দী ছুটে এল, দড়ি নিয়ে দড়া নিয়ে শিবকে বাঁধতে লাগল।

—একি ? একি ? একি ? ওরে বেটারা ভূতেরা করিস কি ? শিব রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন।

নন্দী বললে—চীৎকার করো না দেবতা! মুখ বুজে চুপ করে থাক। নিজে বর দিয়েছ—তার সঙ্গে তুমিই হুকুম দিয়েছ তোমাকে বাঁধতে। এখন আর চেঁচালে হবে কি! বাঁধ ভূতেরা, ক্ষ্যাপা বাবাকে কষে টেনে বাঁধ। দেখিস যেন খুলে না পালায়। না ছেঁড়ে!

শিব রেগে চীৎকার করলেন—নন্দী!

নন্দী হাত জোড় করে বললে—দেবতা, তোমার চেয়ে তোমার বর বড়ো, বাক্যি বড়ো, কি করব বল! চিনতে পারছ না ও মেয়েকে ? ও যে মা, মা দুর্গা!

শিব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—নে তবে চল নিয়ে। না বাবা একটু দাঁড়া। বলে ডাকলেন—দুর্গা, আমি হেরেছি, হার মানছি। চিনতে পারি নি তোমাকে, সকালে নেশা বড় কড়া হয়ে গিছল। চোখে দেখতেই পাচ্ছিলাম না। তা বেশ। হেরেছি যখন তখন নিজেই যাব আমি। কিন্তু আমার শখ করে তৈরী ভুবনপুর, এর একটা ব্যবস্থা করে যাও। স্বামীর কীর্তি এটা—নষ্ট হলে বদনাম তোমারই হবে!

দুর্গা হেসে বললেন—বেশ। আমি বর দিলাম তোমার এতটুকুন অংশ এখানে থাকবে ভুবনেশ্বর শিব হয়ে, আমি থাকব গন্ধেশ্বরী হয়ে, আর এই হাট থাকবে। এই হাটে অবিক্রি কিছু থাকবে না। সুখের দামে দুখ বিকোবে। দুখের দামে সুখ। তবে আমার মতন পরানের আর্তি থাকা চাই। বিশ্বাস থাকা চাই। দোনামোনা, দেব কি দেব-না ভাব মনের কোণে থাকলে হবে না। দুখের বোঝা বেচতে এসে দ্বিগুণ হবে। সুখের বদলে দুখ পাবে না, সুখ বাড়িয়ে ঘর ফিরবে। এবার খুশী ?

শিব বললেন—খুশী।

—তা হলে চল।

—চল। বাঁধন খুলতে বল।

দুর্গা শিবকে বললেন—বাঁধন খুলবে, কিন্তু নন্দীর কাঁধে চেপে আসতে হবে। নইলে তোমার চরিত্র জানি, কোথায় কোন কেঁচুনী পাড়ায় কোন কন্যেকে দেখে ভাগবে। নইলে চাঁড়াল পাড়ায় গাঁজার গন্ধে সেখানে গিয়ে জমে যাবে।

শিব চড়লেন নন্দীর কাঁধে, ষাঁড়টাকে সিংহের লেজে বেঁধে দেওয়া হল, মা দুর্গা সিংহতে চড়ে ফিরলেন কাশী।

এই এখানকার লোকপ্রবাদ। বাংলাদেশে শিব-দুর্গার অনেক বিচিত্র কাহিনী। এটাও একটা। শিব বাংলাদেশে চাষ করেন, মা দুর্গা শাঁখা পরবার পয়সার অভাবে রাগ করে বাপের বাড়ি যান। শিবের চরিত্র পরীক্ষা করতে মা দুর্গা কেঁচুনী মেয়ে সাজেন, মাছ ধরেন। শিব তাঁর রূপে ভুলে, কেঁচুনী পাড়ায় এসে ঘোরাফেরা করেন, মাছ ধরেন কেঁচুনে পাড়াব কাদা ঘেঁটে মাছ-ধরা পুরুষদের সঙ্গে! ভুবনপুরে ভুবনেশ্বর ভৈরব আজও হাটের দিনে অদৃশ্য থেকে হাটের বেচা-কেনার তদ্বির করেন। গন্ধেশ্বরী পূজোর সময় মেলা হয়, সে সময়ে শিব পূর্ণ হয়ে ভুবনেশ্বরের মধ্যে অধিষ্ঠান হন।

ইদানীং কালে ১৩৩৫ সালে, আবার স্বাধীনতার পর ইংরেজী চুয়ান্ন পঞ্চান্ন সালে সেটেলমেণ্ট হয়েছে—তাতে সরকারী তদন্তে ধরা পড়েছে ও সব গালগল্প, কোন গাঁজাখোর পুরুতটুরুতদের তৈরী, নেহাৎ কবে ভুবনপুরে ওই বেল অশথ শ্যাওড়া গাছের আধা জঙ্গল ঘেরা টিপির উপর একটা পাথর পুঁতে যাত্রী জমাতে এই কাহিনীর সৃষ্টি করেছিল। মুসলমান আমলে ভুবনপুরের পাশের গ্রাম, সেটা গন্ধবণিক-প্রধান গ্রাম—সেই গ্রামে কাটোয়া অঞ্চল থেকে ফৌজদারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে পালিয়ে এসেছিলেন এই গ্রামে তাঁর আত্মীয় স্বজাতিদের কাছে। এবং নিপুণ ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন এই নবীন দে নামক ব্যক্তিটি ওই গ্রামে ব্যবসায় করতে গিয়ে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কোন বিরোধিতা না করে দেখে শুনে ক্রোশ দুই দূরবর্তী এই পতিত প্রান্তর বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। তখন এই পাঁচ ক্রোশ লম্বা লাল মাটি আর পাথর ভরা মাঠের নাম ছিল তিনভুবনের মাঠ। ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সেকালের সড়ক, সড়কের পাশে উত্তরে তিন ক্রোশ দক্ষিণে দু ক্রোশ দূরে দুখানি গ্রাম। এই বট বেল অশথের জঙ্গল ছিল ডাকাত ঠ্যাঙাড়ের আড্ডা। আর এই পাঁচ ক্রোশের মধ্যে কোন ভাল জলাশয় ছিল না। প্রান্তরটা বন্দোবস্ত নিয়ে নবীন দে এখানে কাটিয়েছিলেন একটি ছোট জলাশয় আর এই ডাকাত ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে রফা করে তাদের কিছু কিছু জমি দিয়ে বসত করিয়ে প্রজা বানিয়েছিলেন। তারপর খুলেছিলেন একটি চটি। এই ডাকাতেরাই ছিল এখানকার পাহারাদার। ক্রমে চটি থেকে করেছিলেন ধান চাল কেনার আড়ত। তারপর ছোট পুকুর কাটিয়ে বড়

করে করেছিলেন সরোবর দিঘী। জল হয়েছিল বড় নির্মল; তলা থেকে জল উঠত। রাঢ় অঞ্চলে খোয়াই প্রান্তরে হাত কয়েক খুঁড়লেই যেমন ঝর্না ওঠে তেমনি ঝরনা পেয়েছিলেন দে তাঁর ভাগ্যক্রমে। ক্রমে চটি আড়ত জমে উঠল। বসবাসের বাড়ি করলেন দে। কয়েক ঘর আপন জন বসল আশে-পাশে। তাঁর গুরুও এসে বাস করলেন এখানে; দে তাঁব বাড়ি করে দিলেন—জমিও কিছু দিলেন। এই গুরু এই টিপিটির উপব এসে বসতেন সন্ধ্যে সকাল। অনেক দূব দেখা যায়। নির্জন রাত্রে কিছু জপতপও করতেন। হঠাৎ তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন। এই স্বপ্ন। এবং একদিন শিব সত্যই উঠলেন মাটি ফেটে। লোক ভেঙে পড়ল দেখতে। গুরু তখন বললেন—আগামী পূর্ণিমা—বৈশাখী পূর্ণিমা—নবীন, তুমি গন্ধেশ্বরীর পূজো আনো। আর এখানকাব সকল লোককে বললেন—ওই সরোবব থেকে শিবের মাথায় জল ঢালতে হবে; এক হাজার আট ঘড়া জলে বাবার স্নান হবে।

দিঘীর নাম হল ভুবনদিঘী। তিনভুবনেব মাঠের নাম হল ভুবনপুর। বাবাব নাম ভুবনেশ্বর। লোক সমাগম হলেই দোকানদানি আসে, আপনিই এসেছিল। সেখানে বিকিকিনি হল খুব। দিঘীর পাড়ে ওই প্রবাদে হাটেব পত্তন হল। শিববাক্য বক্ষা করতে নবীন দে হাটের সমস্ত অবিক্রীত জিনিস কিনে নিতেন। সে সব জিনিস গাড়ি করে পরের দিন মঙ্গলবাবে পাঁচ ক্রোশ দূরের গোপালগঞ্জের হাটে পাঠাতেন। লোকসান হলেও সে লোকসান ব্যবসায়ী নবীন দে সয়ে নিতেন। সোম শুক্র শিবের বার, সেই বাবে বাবা ভুবনেশ্ববের হাট; শিবের পূজাও হত, তাতে প্রণামীও পড়ত। আবার হাটে তোলাও উঠত। প্রণামী এবং তোলা ছিল তুভাগ। প্রণামীর বারো আনা সেবায়েত গুরুর, চার আনা দে মশাইয়ের এবং তোলার বারো আনা দে মশাইয়ের চার আনা গুরুর। পরে ১৯০৩ সালে এ নিয়ে সেবায়েত গুরুবংশের সঙ্গে শিষ্য এবং ভূস্বামী দে বংশের মামলা হয়, শিষ্যেরা ভুবনেশ্বর টিপি উঠবার মুখে একটা বাক্স করেছিলেন এবং লোকজনদের ওখানেই দর্শনী দিতে বলেছিলেন। ওই দর্শনীতে পুকুর সংস্কার, ঘাট বাঁধানো টিবিতে উঠবার পাকা সিঁড়ি এবং উপরে পাকা চত্বরে মার্বেল দেবার ব্যবস্থা হবে। এই মামলায় এইসব কথা প্রকাশ পায়। মামলার সোলেনামা তু ঘরেই আছে। সোলেনামা নথিপত্র বের

হয়েছিল সেটেল্‌মেন্টের সময়। তাতে আরও বিচিত্র কথা প্রকাশ পেয়েছে। শিষ্যেরা আপত্তি জানিয়েছিল হাটের তোলায়। হাটের তোলা ভুবনেশ্বরের সেবায়েত বা পাণ্ডা পাবে কেন? ঐ হাটের জমি শিবের দেবত্র নয়। সেটা দে বংশের খাস।

গুরু বংশের বৃদ্ধ ত্রিপুরাচরণ মিশ্র জবাবে বলেছিলেন—হাট শিবের জন্য চলে, শিববার সোমবারে হাট বসে; শিবপূজার জন্য যারা আসে তারাই হাট করে। তা ছাড়া ব্যবসার শূন্য বখরাদার হিসেবে এই মিশ্র বংশ চিরকাল পরিশ্রম করে এসেছে। নজিরস্বরূপ বলেছে—এক সময়ে এখানে মিথিলাভূমের অনুকরণে শিবরাত্রির সময় বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করবার প্রথা চালু করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা নিজে মৈথিলী ব্রাহ্মণ। মিথিলায় মেলা আছে—যে মেলায় পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষের অভিভাবকেরা আসেন, দেব দর্শন করেন এবং পরস্পারের পুত্রকন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। ঐ মেলা এখনও মিথিলায় আছে। ভুবনপুরের হাটে শিবের বরে সুখ দুঃখ বিকিকিনি হয়, সুতরাং কন্যাদায় দুঃখ, পুত্রের বিবাহ সুখ বিনিময় শিব সাক্ষী করে করলে বিবাহ আনন্দের হবে এই বিশ্বাসের উপর ভরসা করেছিলেন। রামকেলির মেলায় বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণবী খোঁজেন, বৈষ্ণবীরা বৈষ্ণব খোঁজেন, মালা বদল করেন। এখানেও তেমনি কিছু করার পরামর্শ গুরুর দেওয়া। শিষ্যরা তা নিয়েছিল। বিবাহ পিছু সওয়া পাঁচ আনা শিবপ্রণামী চার আনা হাটের কর হলে আয় অনেক হওয়ার কথা। চেষ্টা হয়েছিল। কিছুদিন চলেছিল। তারপর উঠে যায়। ১৮৮০।৮১ সালের কথা। ত্রিপুরাচরণ তখন যুবক। তাঁর মনে আছে। দে বংশের প্রবীণ পুরুষ শোভারাম দে তিনি দেখেছেন, তিনি বলুন। ওই প্রথাটা উঠে গেলেও এখনও লোকে বিয়ের সময় বাবার স্থানের সিঁদুর আর এই হাটের লাটাই কুলো কিনে নিয়ে যায়; তাতে নাকি বিয়ে সুখের হয়।

তখন ওই মামলায় একটা আপোসে সোলেনামা হয়। তাতে শিবের আয় গুরুর হয়, হাটের আয় শিষ্যের হয়। তবে একটা তরকারির তোলা গুরুর প্রাপ্য হয়। এক ঝুড়ি তরকারি। সে শিষ্যই তুলে দিয়ে পাঠাত। কিছু তরকারি শিবের দরবারেও পড়ে। তার মধ্যে কচুর ডাঁটি ওল উচ্ছে; নিমের সময় হোক বা না হোক—নিম, এই সবই বেশী। মধ্যে মধ্যে মিষ্টি, দুধ এবং সুগন্ধি আতপ আসে, মধুও আসে।

একটা ছড়া আছে এখানে—ভুবনপুরের হাট গেলে মাটি দিয়ে সরা মেলে, তিতো দিলে মিঠা মেলে, খুদ দিলে চাল পায়, অম্বলের রোগ যায়, দুখ দিয়ে সুখ পাবে—মন হারালে মন পাবে ; এমনিতর অনেক বড় ছড়া। কচুর ডাঁটি, কলমীপাতা, শাকের নাম পাতা চোতা—যা নিয়ে যাবে তাই বিকোবে। দৈব ওষুধে শাক অম্বল গুড় মুড়ি প্রায় বারণ থাকে—এখানে বাবার ওষুধ খেলে শাক, সে এই হাটের শাক খেতেই হয়। খানিকটা দূরে ময়ূরাক্ষীর একটা বিল আছে সেখানে প্রচুর কচুর শাক আর কলমী শুষনে জন্মায়। বিলটা দে মশায়দের। শাক খাওয়ার বিধানটা সেবায়েত মিশ্র মশায়দের।

এ সব ছোট কথা। বড় কথা ভুবনপুরের গঞ্জটা, হাটখানার পাশেই ওই সড়কটার দুপাশে একসময় মস্ত গঞ্জ জমে উঠেছিল। এখনও ছোট নয় তবে ভাঙ্‌টা পড়েছে। ওই শিব মাহাত্ম্যে আর হাট মাহাত্ম্যে আর ওই দিঘীর জলের জন্যে ধান চাল কলাই মুগ লঙ্কা মসুরির গাড়ি এখানেই আঁট দিতো। ভুবনপুরের দু ক্রোশ দূরে গোপালপুর গন্ধবণিক-প্রধান সমাজ। যেখানে নবীন দে এসে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন সেইটেই ছিল পুরনো কালে বড় আড়তদারির গঞ্জ। আর উল্টো দিকে তিন ক্রোশ দূরে ছিল ছোট একটা বাজার ; এই দুটোকেই কানা করে দিয়ে জমে উঠেছিল ভুবনপুরের হাট এবং আড়তদারির গঞ্জ। বছর চল্লিশেক আগে ভুবনপুর থেকে ক্রোশ তিনেক দূর দিয়ে পড়ল একটা লাইট রেলওয়ে। ওই গোপালপুর থেকে এক ক্রোশ তফাতে। তখন থেকে ভুবনপুরের হাটের বিশেষ ক্ষতি না হলেও আড়তদারী ব্যবসায় কিছু ভাঙন ধরল। গোপালপুরে বণিকেরা রেলস্টেশনের মুখে একটা গঞ্জ জমাবার চেষ্টা করলে এবং কিছুটা পেরেও উঠল। ষোল বছর আগে দেশ স্বাধীন হল। তার পর বছর দশকের মধ্যে আবার দান ওল্টালো। এই সড়কটাকে সরকার করলে পিচ-দেওয়া পাকা রাস্তা। তার ওপর চলতে লাগল বাস লরী ট্রাক। একজন মারোয়াড়ী এসে করলে একটা রাইস্ মিল। তারপর ষাট সালে অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটল। এই রাস্তার ধারে ধারে লোহার খুঁটি বসল দুসার। একসার টেলিগ্রাফের, তারপর সারি বসল, সে সব বড় বড় লোহার খুঁটির সারি ; বসল জমির মাঝে মাঝে, তার উপর তিনটে মোটা তার চলে গেল, খুঁটিগুলোর গোড়াতে কাঁটা তার বেড়ে

দিয়ে লাল রঙে মড়ার খুলি-আঁকা ছোট বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হল। তাতে লেখা থাকল—সাবধান। এ যে কল্পনার অতীত ব্যাপার। ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে!

ভুবনপুরের আড়তের এলাকার গ্রামে ইলেকট্রিক আলো জ্বলল। জ্বলল গোপালপুরেও, ওই স্টেশন এলাকাতেও। এ ইলেকট্রিক লাইন আসছে মাইথন থেকে দুর্গাপুর হয়ে গোটা দেশে এদিক ওদিক নানান দিকে, বলতে গেলে দেশময়। এখন অবিশ্যি বড় বড় গাঁয়েই জ্বলছে ছোট গাঁয়ে কিন্তু ভিতরের দিকে যাচ্ছে না। তবে পরে নাকি যাবে। ভুবনপুরের হাটের ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু খুঁটির মাথাতেও একটা আলো ঝুলে গেল।

হাট বসে বেলা তিনটে থেকে। ভাঙতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। বা সন্ধ্যে হলেই ভাঙতে হয়। আলো জ্বেলেও অবিশ্যি সোমের হাট্টা চলে; কেউ হেজাক জ্বালে, কেউ লণ্ঠন, কেউ কেরোসিনের দুমুখো কুপি। কিন্তু ঝড়ে বা বাতাসে অসুবিধে ঘটে, এবার সে অসুবিধে ঘুচল।

সব থেকে খুশী হল টিক্‌লির মায়ের গুষ্টি। আর ঠ্যাংকাটা চুনারিয়ার বাবা। আর শিবে জমাদার। সব থেকে অসুখী এবং অখুশী হলো বুড়ো হেঁপো রাখাল। হেঁপো রাখাল গাঁজা খায়, ভিক্ষে করে, তার অখুশী হওয়ার কারণ আলো চোখে লাগলে তার ঘুম আসে না। বদ্ধ ঘরে সে শুতে পারে না। ঘরদোরও নেই, পড়ে থাকে গুঁইদের কাপড়ের দোকানের বারান্দায়। তার থেকেও অসুখী মানে অত্যন্ত বিরক্ত হল চুনারিয়া। রাত্রে তার বাপকে ফাঁকি দিয়ে কোন গাছের আড়ে দাঁড়িয়ে কেউ ডাকলে সে উঠে যেতে পারবে না। টিক্‌লির চুনারিয়ার মত বাবার ভয় নাই, ওর মা সব জানে, সে সব থেকে বেশী খুশী হল—রাত্রের খরিদ্দার এলে দূর থেকেই দেখতে পাবে; চুনারিয়া খদ্দের ভাঙিয়ে নিলে সে ঝগড়া করতে পারবে।

এরা, হাটের আবর্জনা যেমন একপাশে ডাঁই হয়ে থাকে, তেমনি এই হাটেই এরা জমে আছে। এখানেই ওদের জন্ম এখানেই ওদের মৃত্যু। এর মধ্যে আর বিশেষ মানে বিয়েটিয়ের খুব কড়াকড়ি নেই। হঠাৎ একদিন টিক্‌লির সিঁথিতে সিঁদুর চড়ে গেল, কে দিলে কেউ খোঁজ করলে না।

হঠাৎ এই ভুবনপুরের হাটে এল রূপসী মেয়ে মালতী। ভরা যৌবন। উনিশ কুড়ি বছরের অবিবাহিতা মেয়ে। আশ্চর্য মেয়ে। গায়ে সাদা

সেমিজ, পরনে টকটকে রাঙা পাড় শাড়ি, কাঁখে একটা চ্যাঙারি আর একটি আধবুড়ী মেয়ের মাথায় একটা বড় ঝুড়ি চাপিয়ে হাটে এসে ঢুকে, তন্তুবায়দের চালার সামনে এসে বললে—ধরণী দাস, সুরভি গাঁয়ের ধরণী দাস, তাঁতের কাপড় বেচেন, তাঁর চালা কোন্‌টা বলতে পারেন ?

হাটে তখন লোকজন কম, সবে পসারীরা আসছে। খদ্দের সমাগম হয় নি। তবুও যে কিছু লোকজন এসেছিল সবার মুখ ঘুরে গেল ওই চালার দিকে। একটা ছোঁড়া কোমরে একটা লম্বা লাঠির গায়ে আড়াআড়ি ক্রুশের মত আর একটা খাটো বাঁশের লাঠি বেঁধে—তাতে কার, চাবকী, ফিতে, তাব সঙ্গে চুলের কাঁটা হেয়ার ক্লীপ বিক্রি কবে আর হাঁকে—দু-দু আনা, চাবকী ফিতে কার লম্বায় হাত চাব। চুল বাঁধলে খুলবে না, চল্লে গেলে মিলবে না। জামাই বাঁধলে ছিঁড়বে না। জামাই বাঁধা কার, চুল বাঁধা ফিতে। দু-দু আনা! দু-দু আনা,—সেই ছোঁড়াটা চেঁচিয়ে হেঁকে উঠল—কুমকুমের টিপ তবল আলতা!

কথাটা তার বৃথা গেল না—মেয়েটা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে বারেকের জন্যে তাকিয়েই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

তাঁতের কাপড়ের ওই ব্যবসায়ীটিই ধরণী দাস। সে প্রবীণ লোক। মালতীর মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—কি কাজ তোমার বাছা? ধরণী দাসের সঙ্গে?

—আপনিই। আমি চিনেছিলাম। তবু জিজ্ঞাসা করলাম। আমাকে চিনতে পারছেন না? আমার বাবা—

—তুমি শ্রীমন্ত দাসের কন্যে?

—হ্যাঁ আমি মালতী।

—তুমি? তুমি—কথাটা যেন বলতে পারছিল না ধরণী দাস।

মালতী বলল—আমি সাত দিন হল খালাস পেয়েছি!

ধরণী দাস বললে—আমি বাপের তুল্য মা—কিন্তু মনে করো না, জেলখানাতে তা হলে খারাপ ছিলে না তো! বড় সুন্দর হয়েছ তো দেখতে।

মালতী হাসলে, বললে—হ্যাঁ বাড়ির চেয়ে অনেক ভাল ছিলাম। বাড়িতে থাকলে ঝিগিরি করতে হত নয়তো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাঁদী খাটতে হত!

—তোমার তো চার বছর মেয়াদ হয়েছিল।

—হ্যাঁ। কিন্তু সাড়ে তিন বছরেই খালাস পেয়েছি।

আবার সে ছোঁড়াটা হেঁকে উঠল—কুমকুম তরল আলতা পাউডার স্নো সাবান, সস্তায় যায়। সস্তায় যায়!

আলুওয়ালা—সেও প্রবীণ লোক, সে উঠে দেখতে গিয়েছিল মালতীকে। সে ফিরে এসে তার চ্যাটাইয়ে বসতে বসতে বললে—রসিক নাগর, ও মেয়ে সোজা মেয়ে নয়, খুনে মেয়ে! বুঝে সুজে সস্তায় বেচতে যেয়ো!

—খুনে? আঁতকে উঠল ছোঁড়াটা।

॥ দুই ॥

(ক)

শ্রীমন্ত বৈবাগী ভুবনপুবেব হাটে মাথায় চ্যাঙাবি করে মনিহাবীব দোকান আনত। এবং অন্য অন্য দিন এ-গ্রাম ও-গ্রাম মাথায় বয়ে ফিবি কবে বেড়াতো। মনিহারী বলতে সস্তা তেল সিঁদুর চাবকী মালা ফিতে, কার, হেয়ার ক্লিপ হেয়ার পিন, তালা চাবি, পেন্সিল, রবার, একসাবসাইজ বুক, চিনে মাটির পুতুল, শ্লেট, শ্লেটপেন্সিল, প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ ধারাপাত, কাপড়ের সাবান গায়েব সাবান, খুবসস্তা সেন্ট—এই। এর সঙ্গে ছিল শ্রীমন্তেব আসল মাছ ধরাব সবঞ্জাম। দু'চারটে হুইল তার সঙ্গে বিভিন্ন আকারের বঁড়শি, মুগার সুতো আর তগী মায় তগীর সুতো। এই সুতো ছিল শ্রীমন্ত দাসের নিজেব হাতের পাকানো। আর ছিল ওর বন্ধু গোলক কামারেব কাটা বঁড়শি। শ্রীমন্ত বলত স্পেশাল বঁড়শি এই সুতো দিয়ে আধমন বাটখাবা ঝুলিয়ে রাখত একটা। তগীর বঁড়শি এবং সুতোতে ময়ূরাক্ষীর বিলে দু-দুটা মেছো কুমীর ধরা পড়েছে। একটার ছালচামড়া শ্রীমন্ত দাসের ঘরেই ছিল। নুন দিয়ে চামড়াটা শুকিয়ে নিয়ে তার ভিতবে খড় পুরে একটা ট্যারাব্যাঁকা কুমীর শ্রীমন্তের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। নিজে ছিল পাকা মেছুড়ে। যে দিন ফিরিতে বেরুত না সে দিন বিলে যেত মাছ ধরতে। এবং রাত্রে গ্রামে সম্পন্ন গৃহস্থের পুকুর থেকে মাছ ধরত। সে মাছ-ধরা সাংঘাতিক মাছ-ধরা। সাত আট দিন ধরে ভাল

মাছের পুকুরে চুপিচুপি গিয়ে একসময় একই জায়গায় চার খাইয়ে আসত। তারপর একদিন একটা কঞ্চির মাঝামাঝি জায়গায় কাপড়ে মোটা পরিমাণে চার বেঁধে সেটাকে পুঁতে দিত, জলের উপর বেরিয়ে থাকত আঙুল চারেক কঞ্চি। ওই মাথায় দু'তিনটে শামুকের খোলা সুতোয় গেঁথে বেঁধে দিত। এতে আটদিন একই জায়গায় গন্ধভরা খাদ্যের সন্ধান পেয়ে মাছেরা এসে জমত। ঘুরত। কঞ্চিতে বাঁধা কাপড়ের ভিতরের খাদ্যের জন্য ওটাতে ঠোক্কর মারত, তাতে জলের উপরে শামুকের খোলাগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঠোক্কর মেরে খুট-খুট-খুটু-খুট-খুটু-খুট শব্দ তুলত। তখন একদিন শ্রীমন্ত যেত রণসজ্জায় সেজে। রাত্রে গিয়ে একটা মোটা খাটো ছিপে মোটা তগীর সুতো পরিয়ে বড় বড় দুটো তিনটে বঁড়শি গেঁথে বঁড়শিগুলিকে ওই চারের থলির সঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে দিত। এবং নিজে এককোমর জলে দাঁড়িয়ে পেটের নিচেই কাপড়ের খাঁজের উপর ছিপটা রেখে এবং কোমরের সঙ্গে বেঁধে দু'হাতে শক্ত করে ধরে থাকত। বেশীক্ষণ লাগত না। প্রলুব্ধ মাছগুলো ওই বঁড়শি পরানোর সময় সরে গেলেও মানুষটা উঠে গেলেই আবার ছুটে আসত এবং চারের থলিতে ঠোকরাতে আরম্ভ করত। শামুক-গুলো খুটুখুটু শব্দে বাজত।

এইখানেই শিকারীর কেরামতি। বাঘ শিকারী রাত্রে মড়ির হাড় চিবোনের শব্দে যেমন অন্ধকারে মাচায় বসে বুঝতে পারে এ শব্দ শেয়ালের, এ শব্দ নেকড়ের, এ শব্দ বড় ডোরাদারের—মাছ শিকারী শ্রীমন্তও তেমনি শব্দ থেকে বুঝতে পারত, এটা আড়াইসেরী এটা পাঁচসেরী এটা দশ এটা পনেরসেরী রুই বা কাতলা বা মৃগেল। অপেক্ষা করত সে এবং যেই পনেরসেরী রোহিতের ঠোক্করে খটো খটো, খটো-খটো খটো-খটো—খটো খটো খটো খটো খটো শব্দ উঠেছে অমনি দুই হাতের প্রবল ঝাঁকি দিয়ে মাথার পিছন দিকে মারত ঘাই।

সবল সাহসী মরদ ছিল শ্রীমন্ত। সেই ঘাইয়ে পনেরসের রোহিত বঁড়শিতে গেঁথে তার মাথার উপর দিয়ে শূন্যমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একেবারে পিছনে পাড়ের উপর ডাঙ্গায় গিয়ে পড়ত। এ সহজ কথা নয়, এ প্রায় মাটির উপর দাঁড়িয়ে বাঘ শিকার, বাঘকে লাফের সঙ্গেই পেড়ে ফেলার মত কঠিন। কোমরে বাঁধা ছিপটার ঘাইয়ে যদি মাছটা পিছনের দিকে মাথা পেরিয়ে পড়ল তো শিকারীর জিত; যদি না পড়ল—মাছ যদি জলে থাকল

বা একটু উঠে সঙ্গে সঙ্গেই জলে পড়ল তবে কোমরে ধাক্কা খেয়ে শিকারীকে জলে পড়তে হয় উপুড় হয়ে—এবং পনের বিশ সেরী মাছের জলের ভিতরে টানে ডুবতে হয় মরতে হয়। তবে মরে কমই। এ ক্ষেত্রে ঠিক মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ শিকারের সঙ্গে অনেক তফাত, কারণ বাঘ শিকারে এ রকম শিকারী অনেক বেশী মরে।

শ্রীমন্ত দাস এ শিকারে সুনিপুণ এবং দেহের দিক থেকেও সত্যিকারের মর্দানা পুরুষ। শুধু মর্দানা পুরুষই নয় সুপুরুষ ছিল শ্রীমন্ত।

ওই গোপালপুরের ভিক্ষাজীবী বৈরাগীর ছেলে বাচ্চা বয়স থেকে এই ভুবনেশ্বরের দে মশায়দের বাড়িতে খানসামাগিরিতে ভর্তি হয়েছিল। দে মশায়দের বাড়িতে এবং জগৎপুরের বাজারে নূতন হাওয়া লেগেছে। প্রথম যুদ্ধের পর, ১৯২৬।২৭ সাল; একদিকে বন্দেমাতরম—অন্যদিকে মোটর গাড়ির আমদানি, একদিকে বিদেশে বিলেতে মানুষের আকাশে ওড়ার খবর —অন্যদিকে জাত জন্ম উঠে যাওয়ার ধুয়ো তোলার মধ্যে দেশের সব কিছু এলোমেলো উল্টেপাল্টে দেবার গাওনার গৌরচন্দ্র শুরু হয়েছে। দে মশায়রা ১৯২৪ সালে মোটর বাস এনে সার্বিস খুলেছিলেন—বাসখানার নাম ছিল 'জয় গন্ধেশ্বরী'। দে বাড়ির ছেলেরা ক্লাব করেছিল জগৎপুরে। ওদের দেওয়া চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে জুতো জামা ঘেরাটোপ ধাঁচের কাপড় এবং চশমাপরা মিডওয়াইফ এসেছিল।

আলখাল্লা-পরা, দাড়ি গোঁফ চুলওলা, করতাল-বাজিয়ে টহলদেওয়া অবধূত বৈরাগী ছিল শ্রীমন্তের বাপ; অল্প-বয়সীর দল তখন তাকে অদভূত বলে ডাকতে শুরু করেছে। এই সব নানান কারণে শ্রীমন্ত বৈরাগী বাপ দাদার ধারা ছেড়ে অন্যরকম হয়ে গেল। বাবুদের মাছ ধরার শখ ছিল। সুতো বানানো ওখানেই শিখেছিল। মাছের নেশা ধরেছিল ওখানেই। বৈরাগীর ছেলে হয়ে বোতল থেকে চুমুক দিতেও শিখেছিল। হঠাৎ তার নবযৌবনে ভুবনপুরের বাবুদের খানসামা শ্রীমন্ত, মালতীর মা, বিমলার প্রেমে পাগল হয়ে তাকে নিয়ে পালাল। তখন ২৭।২৮ সাল। বিমলা কোড়াদের মেয়ে, বালবিধবা এবং রূপসী। চরিত্র তার মন্দই ছিল। বাপের বাড়ি ভুবনপুর থেকে দেড় ক্রোশ দূরে ওই বিলের ধারে। শ্বশুরবাড়িতে নানা দুর্নাম রটাই নয় আরও বেশী ঘটেছিল; দুষ্ট বদমাইশের দল জোর করে ওকে রাত্রে তুলে নিয়ে গিয়ে মাঠে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরেরা ওকে বাপের

বাড়িতে ফিরে দিয়ে গিয়েছিল ; বাপ মা নিরুপায়—ফেলতে পারে নি। দিয়ে গিয়েছিল বাবা ভুবনেশ্বরের সেবাইয়েত মিশ্র মশায়দের চরণতলে,—দুটো খেতে পরতে দেবেন, বাবার থানের আগ্‌নে ঝাঁট দেবে, বাসন মাজবে। তখনও তাদের বিশ্বাস ছিল বাবার স্থানে সেবা করলে মেয়ের পরকাল হবে, এবং জাগ্রত বাবা ভুবনেশ্বরের পরিচারিকার অঙ্গে আর কেউ হাত দিতে পারবে না। কিন্তু কলিকালে বিশেষ করে ইওরোপে প্রথম যুদ্ধেব পর বাবা যে ঘুমিয়ে পড়েছেন সমুদ্রমন্থনের বিষের মত যুদ্ধের বিষে। পেট্রোল বারুদের ধোঁয়া, গ্যাস বোমার গ্যাস, কামান বন্দুকের আওয়াজ থেকে বাঁচবার জন্য নাকে কানে তুলো গুঁজে না ঘুমিয়ে উপায় ছিল না তাঁর। ফলে এমন একটি সুন্দরী এবং লাস্যময়ী দেবতার দাসীর দিকে অনেক হাত প্রসারিত হল নির্ভয়ে।

ধরণী দাসও তখন জোয়ান। তাঁতের শাড়ি বেচে। তার মনে আছে যে দিন বিমলা কাঁখালে ঝুড়ি নিয়ে বাবার তোলা নিতে হাটে ঢুকেছিল ঠিক আজকের মালতীর মত সে দিনের কথা। বাবার থানের শেষ সিঁড়িতে যেই ঝুড়ি কাঁখে ঈষৎ বঙ্কিমঠামে হেলে বিমলা দাঁড়িয়েছিল অমনি গোটা হাটের মুখটা ফিরে গিয়েছিল বাবার থানের দিকে। অথচ এপাশে সড়কটা থাকায় হাটের মুখটা, তা দশ পনের বছরেবও বেশী হবে, বাবার দিকটা পিছনে ফেলে সড়কের দিকেই ঘুরে গেছে। বিমলা যখন মিশ্রঠাকুরের পিছনে পিছনে ঝুড়ি কাঁখে তার চালার সামনে দাঁড়িয়েছিল একটা পয়সার (তোলার বদলে) জন্য তখন ধরণী পয়সাটা মিশ্র মশায়কে দিয়ে আজকের ওই কারওয়ালা ছোঁড়ার মতই আচমকা হাঁক মেরে উঠেছিল—মনমোহিনী লাল গামছা—পাকা রঙ—নিয়ে যাও! পাশের সকলে খিলখিল করে হেসেছিল। বিমলা ঘাড় ঘুরিয়ে মুখ মুচকে কটাক্ষ হেনে বলেছিল—ফড়িংখেকো গিরগিটির শখ দেখ—ময়না ধরে খাবে! হাটের এইখানটিতে হাসিব হট্টরোল পড়ে গিয়েছিল। ধরণীর মান বাঁচিয়েছিল বাবা ভুবনেশ্বর। হঠাৎ সকলের নজর পড়েছিল শ্রীমন্তের মনিব শৌখিন দেবাবু কোঁচানো কাপড় গিলেকরা পাঞ্জাবী পরে বাবা ভুবনেশ্বরের সিঁড়ির উপর ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বিমলাকে দেখছেন। ধরণী বলে উঠেছিল—গাছের শিরডগালে বাজপাখী! ময়না গেল! মনিবের পিছনে শ্রীমন্ত। তার গায়ে বাবুর পুরনো শৌখিন গেঞ্জি—পরনে শৌখিন পাড় ধুতি! সেও তাকিয়ে আছে বিমলার দিকে।

এর এক মাসের মধ্যেই শ্রীমন্ত বিমলা উধাও। পালাল পালাল ওই গন্ধেশ্বরী বাসে চড়েই পালাল! না-হলে হয়তো বাবার দাসী নিয়ে পালানো সম্ভবপর হত না—ওদের তুজনের একজন হত খোঁড়া একজন হত কানা। পথেই আটকে যেত।

তিন বছর পর শ্রীমন্ত ফিরেছিল—বাবুর মৃত্যুর পর। সিঁথিতে সিঁতুরপরা বিমলা এক শ্রীমন্তের সঙ্গে ছোট একটা মনিহারীর দোকান।

দোকান নিয়ে হাটে কিছুদিন আসেনি শ্রীমন্ত। তারপর এল হাটে। বিজ্ঞাপন একটা করেছিল। ওই সুতোই গাঁথা বঁড়শিতে ঝোলানো একটা আধমনি বাটখারা, তার সঙ্গে গাঁথা একটা শোলার মস্ত বড় মাছ। ধরণী দাসের সঙ্গে শ্রীমন্তের আগে থেকেই সুখ ছিল। সে এসে ধরণীকে বলেছিল—তোমার চালায় একটু জায়গা দেবে একপাশে? দোকানটা খুলি!

ধরণী তা দিয়েছিল। শ্রীমন্ত কৃতজ্ঞতাবশে ধরণীকে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে বিমলার হাতের ভাজা তালের বড়া এবং দোকানের মিষ্টি খাইয়েছিল। বিমলা একটু হেসে পুরস্কৃত করেছিল—সে শ্রীমন্তের সামনেই।

শ্রীমন্ত মধ্যে মধ্যে মাছও খাওয়াতো তাকে। অধিকাংশ দিন সে এই মাছ ধরার ব্যাপারে একটু চতুরতার আবরণ দিয়ে মাছ ধরত। পুকুরে চার খাওয়াতো রাত্রে। কাঠি গুঁজত রাত্রে। বিল থেকে মাছ ধরে ফেরবার পথে। এবং মাছ যেদিন ধরত সে দিনও ওই বিল থেকে ফেরার পথে মাছ মেরে গামছায় বেঁধে নিয়ে ফিরত। অবিশ্বাস করবার জো ছিল না। কেউ অবিশ্বাস করতও না। তার আগেই সে বিলে মেছো কুমীর মেরে কিস্তি মাত করে রেখেছিল।

মাছ মেরে নিজেরা খেতো—বন্ধুদের বিলুতো, বিক্রিও করত। ব্যবসাও ভালই চলছিল। অনেক জায়গার অনেক লোক এসে বঁড়শি সুতো তগী তগীর সুতো কিনে নিয়ে যেতো। কিন্তু যে শ্রীমন্ত অবধূত বৈরাগীর ছেলে থেকে বাবুদের খাস খানসামা—তারপর সেই খানসামাগিরি ফেলে বাবুর শিকার আত্মসাৎ করে পালায় এবং আবার ফিরে আসে (সে-বাবুর মৃত্যুর পর হলেও) সে শ্রীমন্ত সহজ জীব নয়। ধরণী দাস বলে, সহজ জীব, কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণের দয়ায় বাঁচে। শ্রীমন্ত কারুর দয়ায় বাঁচে না। ও কামড় খায় না, আগেভাগেই কামড়ায়। শ্রীমন্ত সত্যই ওই বিমলাকে নিয়ে ভেগে গিয়ে

যে সাহসে যে বুকের পাটায় আবার ফিরে আসে মাথা উঁচু করে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে সব বাক্য বলত তা খদ্দেবের পক্ষে হজম করা কঠিন ছিল।

সুতো নিয়ে বেশী টানাটানিব পরখ করলেই শ্রীমন্ত একটা বঁড়শি সুতোয় বেঁধে বলত—নাও বাবা হাঁ কব দেখি, সোনা।

হাঁ কবব?

—হ্যাঁ! কয়েষে বিঁধে দি—তুমি টানো—ছিঁড়ে বেবিয়ে যাও। দেখো ছেঁড়া যায় কিনা! এব চেয়ে ভাল পবখ তো হয না। না হয় বাখো। বেখে বাড়ি যাও।

একদিন তাব পুবনো মনিবেব এক মোসাহেব বন্ধু—শহবে আমমোক্তারি কি টাউটেব কাজ কবে সে দে মশায়দেব বাড়ি এসেছিল আদালতেব কাজে। সেদিন ছিল হাট। হাটে এসে বন্ধুব পুবনো খানসামা শ্রীমন্তকে দেখে হয় স্নেহ নয় করুণা নয় একটা কিছু উথলে উঠেছিল, সবিস্ময়ে সে বলেছিল—আবে শ্রীমন্ত যে! এ্যাঁ!

শ্রীমন্ত উত্তব দেয় নি।

সে ফেব ডেকেছিল—এই ব্যাটা শ্রীমন্তে!

শ্রীমন্ত মুখ তুলে গম্ভীবভাবে বলেছিল—কি বে ব্যাটা কি বলছিস?

—আবে!

—আবে কি? আবে? হ্যাঁ বে আমি তোর ব্যাটা? না আমি তোর বাবাব চাকব? ব্যাটা!

আমমোক্তারবাবু রাগ কবে বাবুদের বাড়ি গিয়েছিলেন নালিশ করতে। শ্রীমন্ত গিয়েছিল সেকালে কংগ্রেস আপিসে। কিন্তু একদিন বেকায়দা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কিল মেবে বসেছিল দাবোগাব নাকে। থানা আগে ছিল গোপালপুরে, পরে সেটা ভুবনপুরে উঠে এসেছে। দাবোগা ছিল শিবেন চাটুজ্জে, এক নম্বরেব লম্পট আর ঘুষখোব। নজর দিয়েছিল বিমলার উপব। এখানে সঙ্গী জুটিয়েছিল শ্রীমন্তের পুরনো মনিবের খুড়তুতো ভাইকে। বিমলা এককালে যা ছিল তা ছিল কিন্তু শ্রীমন্তেব কাছে সে ছিল সতী স্ত্রী। বিমলা বলে দিয়েছিল কথাটা। শিবেন দাবোগা শেষ পর্যন্ত ওর নামে চুরিব মাল সামলানোর চার্জ এনে বাড়ি তল্লাস করতে এসেছিল। এসে চাল ডাল এক করে তচনচ করে দিয়েছিল সব, কিন্তু

চোরাই মাল কিছু মেলেনি। আর সামলাতে পারে নি নিজেকে শ্রীমন্ত, হঠাৎ দারোগার নাকে মেরেছিল একটি কিল। দারোগার নাক ভাঙেনি কিন্তু রক্তে সব ভেসে গিয়েছিল, এবং ফুলেও ছিল বেশ কয়েক দিন। আর বাবুর গালে মেরেছিল চড়। এবং হনুমানের মত লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে হয়েছিল ফেরার। কিন্তু ফেরার ক'দিন থাকা যায়; ধরা পড়েছিল শ্রীমন্ত এবং জেলও হয়েছিল তার ছ মাস। তবে শিবেন দারোগাও থানা থেকে বদলী হয়েছিল, ওদিকে বাবুও সাবধান হয়েছিল। শ্রীমন্ত বলে গিয়েছিল—কিছু ভাবিসনে বিমলি, জেল হচ্ছে, শূলি ফাঁসি নয়, ছ মাস পর ফিরব, ফিরে যদি শুনি যে কেউ তোকে চোখের পাতার ইশেরা করেছে তবে তার চোখ উপড়ে নেব। তাতে মরি তো ফাঁসি যাব।

এই শ্রীমন্ত, এই শ্রীমন্তের মেয়ে মালতী। ওর বাবা ছেলেবেলায় ডাকত 'মালা' বলে।

মালতী খুন করেছে, করে চার বছর জেল খেটেছে। সেও শ্রীমন্তের ওই মাছ ধরার জন্যে।

প্রথমবার জেল থেকে ফিরে শ্রীমন্ত কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছিল। মেজাজটাকেও সংযম শৃঙ্খলার জুতো-পরা পায়ের মত, জামা-পরা শরীরের মত নরম আর ফরসা করে ভদ্র করে তুলেছিল। তারপর হল মেয়েটা। শ্রীমন্ত আরও হিসেবী হয়ে সংসারী হল। বছর তিনেকের মেয়েটাকে রেখে বিমলা গেল মারা। শ্রীমন্ত বেশ কিছুদিন বিয়ে করলে না। মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরত। হাটে আসত, মেয়েকে নিয়ে আসত। শ্রীমন্ত দোকান করত জিনিস বেচত, ফুটফুটে মেয়েটা ঘুরে বেড়াত হাটে। রূপ তার তখন থেকেই। কখনও বাপের পাশে বসে ছবির বই দেখত নয় একটা পুতুল নিয়ে খেলা করত। বিলে শ্রীমন্ত মাছ ধরতে যেতো মেয়ে যেতো সঙ্গে, চার মাখাতো, টোপ ঘাঁটতো গাঁথতো। বছর চারেক পর শ্রীমন্তের কি হল, কোত্থেকে নিয়ে এল এক নতুন বষ্টুমী। অল্পবয়সী নয়, পরিণত যুবতী। নিয়ে এল আটচল্লিশ সালে। সে এক পূর্ববঙ্গের মেয়ে। নবদ্বীপ গিয়ে তাকে নিয়ে এল কণ্ঠিবদল করে। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, স্বভাবটা কিন্তু ভাল ছিল না। প্রথম দোষ ছিল হাসি, যেমন তেমন কোন একটা সুড়সুড়ির মত কথা হলেই হি হি করে হেসে সারা হত। কথাবার্তাতেও বেশ হিসেব ছিল না। বুড়ো বললে শ্রীমন্ত রাগত কিন্তু চাঁপা ওকে

বুড়ো বলবেই। কথায় কথায় বলত, মরণ বুড়ার। কিংবা বলত, রকম দেখ বুড়ার! কিংবা বলত, হবে নি, বুড়া বয়সে এত ভাল? শ্রীমন্ত গর্জন করত। কিন্তু গর্জনে থামত না চাঁপা। শ্রীমন্ত তখন কিল বসাতো পিঠে।

চাঁপা কিছুক্ষণ কাঁদত তারপর গুম হয়ে বসে থাকত—তারপর হাসত, বলত, যার যেমন নেকন—আমার নেকনে সারা জীবনটাই ভাদর মাস। পাকা তাল দুপদাপ পড়ছেই পড়ছেই। ভাদরেরও সংক্রান্তি নাই গাছের তালেরও শেষ নাই। মাঝে মাঝে পালাত তালতলা থেকে অর্থাৎ বাড়ি থেকে। প্রথম দুবার মার খেয়েই রাগ করে পালিয়েছিল নবদ্বীপ। শ্রীমন্ত গিয়ে ধরে এনেছিল। তারপর না বলে গঙ্গাস্নান দশহরায়, এখান ওখানকার মেলায়, দু তিন দিন পর ফিরত। যেত পাড়ার লোকের সঙ্গে। সঙ্গে ঠিক নয় পিছন ধরে যেতো। এক আধবার একলাও গেছে। লোকে কিন্তু মন্দ বলত। তবু শ্রীমন্ত ওকে ত্যাগ করতে পারেনি। সম্ভবতঃ বেশী বয়সের মোহ। আর ওই মেয়ে মালতীর জন্য। মালতীকে চাঁপা বশ করে ফেলেছিল এবং ভালও বাসত। মালতীর সঙ্গে পুতুল খেলত। বাড়ির উঠোনে কুমীর মানুষ খেলত। মালতীর জন্যে খেলত তা নয়, নিজের জন্যেও খেলত। পালিয়ে গিয়ে নিজেই ফিরত চাঁপা; মালতীর জন্য কিছু না কিছু, কাঠের পুতুল, মাটির ঘোড়া কিংবা লোহার হাতা বেড়ি হাঁড়ি থালা খেলনা যা হোক নিয়ে ফিরত, ফিরত সময় বুঝে, অন্ততঃ বাড়ি ঢুকত যে সময়টা শ্রীমন্ত থাকত না সেই সময়ে। এবং মালতীর সঙ্গে খেলাঘর পেতে খেলতে বসত। শ্রীমন্ত বাড়ি ঢুকেই বলত—হুঁ এই যে!

চাঁপা আড়চোখে চেয়ে দেখেই আপন মনেই বলত—পিঠের ফুলাটা পুরানো হয়েছে, কিল মার। মার আস্তে মার!

কিংবা বলত—মালা আয় তো রে মা—পিঠে চাপ তো! কিন্তু ফুলো পুরনোই হোক আর মালতীই পিঠে চাপুক কিল যা মারবার সে শ্রীমন্ত মারতই।

মধ্যে মধ্যে কিল না মেরে শ্রীমন্ত চাঁপাকে ঘর থেকে বের করে দিত। চাঁপা দরজায় বসে কাঁদত এবং বলত—দোর খুল গো, পায়ে পড়ি। কিল তোমার যত খুশী মার, দোর খুল।

দু একবার শ্রীমন্ত রাগ করে নিজের চুল ছিঁড়েছে, খেদ করেছে—এ কি করলাম! এ কি পাপ ঢুকোলাম ঘরে! হে ভগবান্!

চাঁপা এসে বলেছে—পায়ে পড়ি এমন করো না। আমারে মার! যত খুশী মার! পিঠ আমার সুড়সুড় করছে!

এরই মধ্যে, অর্থাৎ সৎমা চাঁপা এবং বাপ শ্রীমন্ত দুজনের ঝগড়ার মধ্যে প্রায় আপন মনে বেড়ে উঠেছিল মালতী! চাঁপাকে যখন ঘরে আনে শ্রীমন্ত, তখন মালতীর বয়স ছিল বছর ছয়েক। চাঁপার স্বভাবচরিত্র যেমনই হোক ওর মধ্যে বিষ বা কাঁটা এ দুটোর একটাও ছিল না। স্বভাবটা ছিল মিষ্ট। পালাতো ফিরে আসতো মার খেতো, সবেব মধ্যেই সে হাসত এবং বেশ একটি রসিকতার অধিকারিণী ছিল সে। চাঁপাব বয়স তখন বিশ থেকে পঁচিশের যে কোনটা হতে পারত। সে মালতীকে বাড়িতে দেখে মুখ ভারও কবে নি আবার মায়ের স্নেহও গ্রহণ কবে নি। হেসেই সারা হয়েছিল মুখে কাপড় চাপা দিয়ে—মরণ, এত বড় মেয়ের মা হতে পারি নাকি?

শ্রীমন্ত রাগ করেছিল। চাঁপা বলেছিল—রাগ কইরো না। ওর সাথে তোমার সম্বন্ধটা ডবল কইরা দিব। বাবারে মেসো কইবে আজ থেকা। আমি অর মা হইতে পারব নি মাসি হব।

মালতীর চিবুক ধরে বলেছিল—আমারে মাসী কইয়ো। হ্যাঁ সোনা!

মালতী হেসে বলেছিল—আমি সোনা নই, আমি মালা। মালতী।

—হুঁ। তুমি আমার সোনার মালতী গ! বেহুলার গান জান?—"জলে ভেসে যায় গ সোনার মালতী।"

মালতী বলেছিল—তুমি তো বেশ ভাল গান কর মাসী!

—শুধু গান? নাচতে পারি সোনা। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ কইরা দেখাব তোমারে!

চাঁপার স্নেহ-মমতা চাঁপা তাকে আপনার মত করে দিত, শ্রীমন্ত সেও তার স্নেহ দিত আপনার মত করে—তার মধ্যে স্নেহ অকৃত্রিম এবং অনেক হলেও যত্ন রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট ছিল না। সে বেড়ে উঠেছিল আপনার প্রাণশক্তিতে ইচ্ছামত রুচির মধ্য দিয়ে। গাছে চড়ত, সাঁতার দিত, পাড়ার মেয়েছেলেদের সঙ্গে দাপাদাপি কবত। হি হি করে হাসত। রাগলে চিৎকার করে গাল দিত। ফল ফুল চুরি করত। কারুর বাগানে ভাল গাছ দেখলে সেটা কোন সময়ে ঢুকে উপড়ে ফেলে দিত। ভয় তার ছিল না। বাপের কাছ থেকে পেয়েছিল সাহস।

ভোরবেলাতেই ওই ছ বছরের মেয়ে একগাছি পাঁচন লাঠি হাতে বের হত গ্রামের পথে। গাইটাকে খুঁজতে যেত। ওদের একটা গাই ছিল ; সেটার স্বভাব ছিল বিচিত্র ; সন্ধ্যেবেলা গোয়ালে পুরতে গেলেই হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে উঠে অতর্কিতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেত। সারাটা রাত্রি কারুর বাগানে গাছ খেয়ে, কারুর খামারে খড় খেয়ে, কারুর ক্ষেতে ফসল খেয়ে পেট ভরিয়ে সকালের আলো ফুটলেই নিরীহের মত কোন গাছতলায় শুয়ে রোমন্থন করত। মালতী ভোরবেলা যেত সেই গাই খুঁজতে। খুঁজে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনত। তারপর বেলা সাড়ে দশটার সময় গাইটার সঙ্গে আর দুটো গরুকে খুলে গ্রামের পথে পথে ওদের 'ডাকিয়ে' অর্থাৎ তাড়িয়ে নিয়ে প্রায় গ্রাম পার করে কোন পুকুরপাড়ে বা ঘাসভরা জমিতে লম্বা দড়ি বেঁধে খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে দিয়ে আসত। আবার বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসত। সন্ধ্যের মুখে এক একদিন বের হত ছাগলের সন্ধানে। ছাগলগুলোকে সকালেই ছেড়ে দিত—তারা গ্রামের ভিতর ঘুরে খেয়েদেয়ে সন্ধ্যায় আপনিই বাড়ি ফিরত। যেদিন ফিরত না সেদিন মালতী বের হত এবং পথে যেতে যেতে এক এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ডাকত—এ র্ র্ র্—আ—। এ র্ র্ র্ র্!

সেদিন চাঁপা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁসগুলোকে ঘরে ঢোকাতো।—কোর—কোর—কোর—তি—তি—তি। কোর—কোর—কোর।

অন্যদিন মালতীই ডাকত।

চাঁপা আসবার আগে পাঁচ বছর বয়স থেকে এসব দায়িত্ব মালতী নিজেই নিয়েছিল নিজের ঘাড়ে। চাঁপা এসে ওর কাজ বাড়িয়ে দিল কিছু। শ্রীমন্তকে বললে মাইয়ারে ইস্কুলে দাও না ক্যানে।

—কি করবে ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল শ্রীমন্ত।

—ল্যাখাপড়া শিখবে!

—নিয়ে ?

—নিয়া আবার কি ? দ্যাশ স্বাধীন হইছে। মাইয়ারা চাকরি করছে। করছে না ? ওই তোমাদের গেরামের স্বন্নকারদের মাইয়াটা বিধবা হইয়া ল্যাখাপড়া শিখছিল বইলা চাকরি করছে ইস্কুলে। না শিখলে কি করত ? ঝিগিরি।

কথাটা শ্রীমন্তের মন্দ লাগে নি। ফ্রি প্রাইমারি বালিকা বিদ্যালয়ে ভরতি করে দিয়েছিল মালতীকে।

যেদিন ছাগল হারাতো সেদিন মালতী জানতো তার কপালে আজ লাঞ্ছনা আছে। ছাগল যখম ফেরে নি তখন সর্বনাশী কারু বাগানে ঢুকে গাছ খেয়েছে কিংবা কারুর উঠানে ঢুকে রোদ্দুরে দেওয়া ছোলা মসুর খেয়েছে এবং ধরা পড়ে হয় বাড়িতে বাঁধা আছে নয় গেছে হাফিজ মিয়ার খোঁয়াড়ে। বাড়িতে বাঁধা থাকলে কপালে বকুনি আছে, খেতে হবে। খোঁয়াড়ে গেলে কাল সকাল ভিন্ন পাওয়া যাবে না এবং পয়সা লাগবে। সে যেত শ্রীমন্ত। ছাড়িয়ে নিয়ে ছাগলটাকে পিটতে পিটতে বাড়ি আনত, এবং বলত, পালাতে যদি না পারবি তো পরের বেড়া ভেঙে ঢুকলি কেন? বকুনি যা খাবার সে খেতো মালতী।

মুখ বুজেই দাঁড়িয়ে থাকত। ক্রমে তারা ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিত। —যা নিয়ে যা! কিন্তু বকুনি সহ্য হলে অকস্মাৎ মালতী সাপের মত ফণা তুলত। বলত—খেয়েছে অবোলা জীব, বুদ্ধি নাই—তোমাদের লোকসান হয়েছে, ধরেছ বেশ করেছ কিন্তু খোঁয়াড়ে দাও নাই কেন? কোন্ আইনে বেঁধে রেখেছ? ছেড়ে দেবে তো দাও নইলে বাবাকে বলছি সে থানায় যাবে। বেঁধে রাখবার আইন নাই!

এ সব শিখিয়েছিল তাকে শ্রীমন্ত।

চাঁপা এসে তাকে অন্য শিক্ষা দিয়েছিল।

(খ)

চাঁপা এসে তাকে শিখিয়েছিল—মিষ্টি কথা বইলা, কিছুটা তোষামদ কইরা মন ভিজাইয়া কথা কইলি পর দেখবা কোন কষ্ট পাবা না। কড়া কথা নাই বা বললা মাসী!

সে দিন মার খেয়ে এসেছিল মালতী।

ছাগলটা গিয়ে ঢুকেছিল ভুবনপুরের শিবের পাণ্ডাদের এক শরিকের বাগানে। বাগান ওদের ছিল পূজোর ফুলের জন্য। সেই বাগানে ওরা সেবার নতুন করে শীতকালে মরসুমী ফুল লাগিয়েছিল। শখ, বাড়ির একমাত্র ছেলে এবং সেই বাড়ির মালিক তখন, বাপের অকালমৃত্যুর পর।

তার মামার বাড়ি বর্ধমান শহরে, সেখান থেকে মরসুমী ফুলের চারা এনে লাগিয়েছিল। ফুলও হরেক রকম ফুটেছিল। ছেলেটির বয়স বছর বারো হলেও বেশ পোক্ত ছেলে এবং পাকা ছেলে। বাগানের মধ্যে চৌকি পেতে বসে থাকে, গান গায়। গলাটি ভাল। দেখতেও সুন্দর। বাড়িতে পিসিমা আছে—তার আদরের নিধি। বাপও ছিল ভাল গায়ক।

ছাগলটা তাদের বাগানে ঢুকে ফুল সমেত গাছগুলোর একটা দিক প্রায় মুড়িয়ে খেয়ে দিয়েছিল। ধরে তারা ছাগলটাকে বেঁধে রেখেছিল। মালতী খুঁজতে খুঁজতে পথ চলছিল আর ডাকছিল—এ—র্—র্—র্। এর্—র্— র্!

ছাগলটার অভ্যাস ছিল মালতীর ডাক শুনলেই সাড়া দেওয়া, সে দে'দের বাড়ির ভেতর থেকে ম্যা ম্যা শব্দে সাড়া দিয়েছিল। মালতী সেদিন ঘুরেছিল অনেক। তাদের বাড়ি দেগঞ্জ, সে গ্রামের শেষ প্রান্তে ভুবনপুরের শিবের সেবায়েতদের পাড়াটা যেখানে এখন একরকম মিলে গেছে ততদূর চলে গেছে লক্ষ্মীছাড়ি হতচ্ছাড়ি ছাগলটা! দেগঞ্জে না পেয়ে মালতী ভাবছিল হয়তো খোঁয়াড়ে গেছে কিংবা পাইকারেরা পথে পেয়ে নিজেদের পালে মিশিয়ে নিয়ে চলে গেছে কিংবা গেছে শেয়ালের পেটে। ছাগলটার আওয়াজ পেয়েই বাড়িতে ঢুকে সে আবার ডেকেছিল—এর্ র্র্ এর্ র্-র্!

ছাগলটাও সাড়া দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গলায় কে ভেঙিয়েছিল এ-র্-র্-র। এস! তোমার ছাগল!

মালতী দেখেছিল দশ বারো বছরের দিব্যি কাত্তিকের মত একটি টেরিকাটা ছেলে! একগাছা কঞ্চি হাতে বেরিয়ে এসে বলেছিল—তোমার পিঠে ভাঙব!

থতমত খেয়ে চুপ হয়ে গিয়েছিল মালতী।

—এগিয়ে আয়! এদিকে আয়!

মালতী বলেছিল—ছাগল ছেড়ে দাও। বেঁধে রেখেছ কেন?

—দেব। আগে পিঠের চামড়া তুলব তোর তারপর দেব। পাঁঠা হলে কেটে খেতাম। মাদী ছাগল। খাবার জো নেই। তোর পিঠ ভাঙব।

—কি করেছে আমার ছাগল?

—দেখ্ কি করেছে! ওই দেখ্!

দেখে মালতীর সত্যিই আপসোস হয়েছিল—এক পাশটা ফুলে ভরা, অন্য পাশটায় একেবারে মাটি বের করে গাছ খেয়ে দিয়েছে। তবে খুব বেশী নয়।

—কি, চুপ করে কেন?

এবার মালতী বলেছিল—ওই তো এতটুকু জায়গা! ওই তো বাকী সবটাই রয়েছে।

—এতটুকু জায়গা? বেশ তোর মাথায় চুল তো দেখি অনেক—আয় এক গোছা চুল কেটে নি!

—ফক্কড়ি করবার জায়গা পাও নি! ছেড়ে দাও ছাগল। খেয়েছে তো খোঁয়াড়ে দাও নি কেন? বেঁধে রেখেছ কোন্ আইনে? ছেড়ে দাও নইলে থানায় যাব!

—থানায় যাবি? আইন? যা—ছাড়ব না!

মালতীব আর সহ্য হয় নি—সে জোর করে ছাগল খুলতে গিয়েছিল। ছেলেটা তার চুলের মুঠো ধরে টেনে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল।

মালতী বাড়ি এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে। বাপ শ্রীমন্ত শুনে রাগ করেই তার সঙ্গে গিয়েছিল সেই বাড়ি পর্যন্ত। তখন ভিতর থেকে চমৎকার গলায় ভাঁজা তান ভেসে আসছিল। কেউ—কে আবার হবে সেই ছেলে—তখন বাগানে চৌকি পেড়ে বসে আ-আ-আ-আ-আ-আ তোম না—তোম না—তেরি তোমনা দ্রোম না করে তান ভাঁজছিল।

শ্রীমন্ত মেয়েকে হেসে বলেছিল—এই বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—এ তো খাসা গান গাইছে! খাসা গলা।

সে কথা মালতীরও মনে হয়েছিল কিন্তু মুখে কিছু বলে নি। বাপ বেটীতে বাড়ি ঢুকে দেখেছিল ওই ছেলেটিই বসে পাকা ওস্তাদের মত গালে বাঁ হাত রেখে ডান হাত নেড়ে নেড়ে তেরে তোম—দ্রোম না দ্রিম—দ্রিম লাগিয়ে দিয়েই মধ্যে মধ্যে গিঁঠকিরি ঝাড়ছে—আ-আ-আ। হা-হা-হা। সে যেন নদীর বুকে বর্ষার বাতাসের ঝাপটায় অসংখ্য ছোট ঢেউয়ের হিল্লোল খেলে যাচ্ছে। ওরা ঘরে ঢুকেও কিছু বলতে পারে নি, অমন গানের মাঝখানে কথা তুলে বাধা দিতে ইচ্ছে হয় নি। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনেছিল। একবার বরং মালতী বলেছিল—আমাদের ছাগল নিতে এসেছি—

শ্রীমন্ত বাধা দিয়েছিল—চুপ কর।

বেশ কিছুক্ষণ পর হা-হা, হা শব্দে গানে ছেদ টেনে থেমে ছোকরা বলেছিল—কি? ছাগল?

—হ্যাঁ। আমরা নিয়ে যাব!

—পুলিস কই?

—পুলিস? শ্রীমন্ত প্রশ্ন করেছিল।

—হ্যাঁ। তোমার কে হয়? মেয়ে? তুমি তো শ্রীমন্ত, হাটে মনিহারীর দোকান কর?

—হ্যাঁ। আমার মেয়েকে মেরেছেন কেন?

—তোমার মেয়ে জবরদস্তি ছাগলটা খুলে নিয়ে যাচ্ছিল কেন? পুলিসের হুমকি দেখায় কেন? দেখতো কি করেছে গাছগুলোকে খেয়ে! আবার মুখের উপর উত্তর কত! অত্যন্ত মুখরা ঝগড়াটে মেয়ে!

শ্রীমন্তের মেজাজটা কিছুতেই গরম হয়ে ওঠে নি। আশ্চর্য! শুধু তাই নয়, মালতীরও মার খাওয়ার জন্য সে ক্ষোভটুকুও আর ছিল না। বরং লজ্জাই হচ্ছিল ওর।

শ্রীমন্ত বলেছিল—তা মেয়েটা একটুকু ইয়ে বটে! লে ঠাকুরকে প্রণাম কর।

মালতী কিন্তু তা করে নি। এবার গোঁ ধরে দাঁড়িয়েছিল।

ছেলেটি বলেছিল—নিয়ে যাও ছাগল। বেঁধে রেখো!

ঠিক দুদিন পর আবার। ওই যে সেদিন বিলিতী ফুলের রস পেয়ে লুব্ধ হয়েছিল সে আর ভুলতে পারে নি। আবার ছাগলটা গিয়ে ওদের বাড়ির বাগানে ঢুকেছিল। এবং বাঁধাও পড়েছিল।

সেদিন মালতী খবরটা শুনেছিল মাঝপথেই। শুনেছিল—ওই সেবায়েতদের বাড়িতেই আবার বাঁধা পড়েছে। গ্রামের মধ্যে না পেয়ে এ অনুমান মালতীরও হয়েছিল। কিন্তু সেদিন আর তার পা ওঠে নি। মাঝপথ থেকে বাড়ি ফিরে এসে বলেছিল—আমি পারব না। আবার হতভাগী' সেই বাড়িতে গিয়ে ফুলসুদ্ধ গাছ মুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছে। বাবা যাক। আমি যাব না।

চাঁপা বলেছিল—যাও না মাসী। বাপ তো তোমার মাছ ধরনে গেছে গিয়া। ফিরতি রাত পহর গড়াবে। যাও গিয়া মিষ্টি কইরা বইলা দেখ।

মিষ্টি কথা বইলা কিছুটা তোষামদ কইরা কথা কইলি পর দেখবা কোন কষ্ট পাবা না! কড়া কথা নাই বা বলল‍া মাসী!

—তুমি যাও না!

—আমি! অরে বাপ! বউমানুষ না। সাঁঝের বেলা, বেটাছেলে—।

—বারো বছরের বেটাছেলে? বড় তো নয়!

—সেই তো।

—সেই তো কি?

হেসে ফেলেছিল চাঁপা। বলেছিল—বড় হলি সমঝাবা মাসী। ছাওয়াল তো। বারো বছর বয়স। আমি তার সাথে কি কথা বলব? তুমি যাও। তুমি কইলি পর তার মন ভিজবে। বুঝলা!

কথাটা গন্ধে গন্ধে যেন কিছুটা বুঝেছিল মালতী। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—তার উপর শ্রীমন্তের মেয়ে চাঁপার ভালবাসার সৎমেয়ে! চাঁপা দুপুরে ঘরে খিল দিয়ে গান গায় নাচে—মালতীকে শেখায়। শ্রীমন্তের সঙ্গে চাঁপার কথাবার্তা হয়—সে তারা মেয়েকে গ্রাহ্য করে রেখে ঢেকে বলে না। তার অর্থ মালতী অক্ষরে অক্ষরে না বুঝলেও কিছু কিছু বোঝে।

সেই বুঝেই মালতী কথাটার উত্তরে মুখ মচকে হেসে বলেছিল—যাঃ! তুমি বড় ফাজিল!

চাঁপা গান গেয়েছিল আস্তে আস্তে—

ফাজিল হইয়া রইলাম সখি
ফাউ দিলেও কেউ লয় না।
ফাজলামি উছলাইয়া পড়ে
যৈবন জ্বালা যে সয় না।

বলে হিহি করে হেসে উঠেছিল। তারপর বলেছিল—চল, আমি বরং সাথে যাই। আমি সান কাইড়া দাঁড়াইয়া থাকব—তুমি কথা বলবা।

—কি বলব? বলব হাতজোড় করছি পায়ে ধরছি ছেড়ে দাও।

—দোষডা কি? বাম্‌নের ছেলে। ভদ্দর জন—

—না—পারব না।

—বেশ। বলবা না পায়ে ধরি হাতজোড় করি—কাজ নাই বল্যা।

—তবে?

—বলবা—ঠাকুর, অবোলা ছাগলের দোষ ধইরা কি করবা? রাগ করতি নাই সোনা।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল মালতী—রাগ করতি নাই সোনা?

—না বললি উপায় কি? কচি বাচ্ছা দুটা ঘরে রইছে। দুধ না খাইয়া মরবে?—চল চল।

অগত্যা গিয়েছিল মালতী। পিছন পিছন চাঁপাও গিয়েছিল। সেদিনও খোকাঠাকুরটি বসে গান করছিল। সেদিন তান নয়, গান!

—ওই নীল উজ্জল তারাটি!

কিবা সলাজ মাধুরী মাখানো অধরে

অমিয় মাখানো হাসিটি!

বাড়ির বাইরেই ওরা দুজনে থমকে দাঁড়িয়েছিল। মালতী হাত ইশারা করে জানিয়েছিল—ওই শোন্। আজ তার আরও ভাল লেগেছিল কারণ গানটা আজ তেরে না—তেনা না-না-না নয়। কথা রয়েছে। এবং কথাগুলি কী সুন্দর! আকাশে সন্ধ্যে বেলা পশ্চিমদিকে যে নীল ধকধকে তারাটা ওঠে সেই তারাটির কথাটা মনে পড়েছিল। ভোরবেলা মধ্যে মধ্যে দেখা পূব আকাশের ভুক্কো তারাটিকে মনে পড়েছিল। গানটাও যাত্রাদলে শুনেছে গন্ধেশ্বরীতলায় তাও মনে পড়ল।

চাঁপা বলেছিল—অ বুনঝি এ তো বেশ গ! লীল উজ্জল তারাটি।

মালতী বলেছিল—হ্যাঁ! কী সুন্দর গাইছে!

—তোমার অই তারাটি হইতে সাধ হইতেছে না মাসী?

—ধ্যেৎ! তারপর বলেছিল—ওসব বলবে তো বাবাকে বলে দেব!

—তোমার বাবার যে আমি ওই তারা গ।

—চুপ কর—কে দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যিই আর একজন কেউ ওদের বাড়ি ঢুকবার ভাঙা আগড়ের দরজাটায় যেন দাঁড়িয়েছিল। সেও চুপচাপ গান শুনছে।

চাঁপা বললে—মানুষটা মরদ মানুষ বুনঝি!

—হ্যাঁ!

গাইয়ে কিন্তু খুব মত্ত হয়ে গান করছে। সেই মত্ততাতে সন্ধ্যাটাকেই যেন মাতিয়ে দিয়েছে! গান শেষ হতেই সামনের লোকটা এগিয়ে গেল বাড়ির ভিতরে। চাঁপা বললে—চল চল বুনঝি, মানুষটা গেছে ভিতরে,

আমরাও যাই। এই সময় কিছু বলতি পারবে না। হাজার হক মানুষের ছামনে ত।

বাড়ির ভিতরে তারাও গিয়ে ঢুকেছিল। ঢুকেই দেখে সে এক কাণ্ড। যে লোকটি দাঁড়িয়ে গান শুনছিল সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে খোকাঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়েছে আর খোকাঠাকুর যেন বোকা ঠাকুর সেজে গেছে! লোকটি হাত বাড়িয়ে খোকাঠাকুরের দুই কান ধবে বললে, নীল উজল তারাটি! ইস্কুল যাও না কেন? এ্যাঁ?

মালতী খিল খিল কবে হেসে উঠল। সেই হাসিতে খোকাঠাকুরের বোকামি বোধহয় কেটে সে বলে উঠল—কান ধরবেন না শূদ্দূব হয়ে। আমি মন্তব নিয়েছি! গুরুর কান। ছেড়ে দেন!

—গুরুর কান? ভাল—চুল—চুল কার! খামচি কেটে লোকটি চুলের মুঠো ধরলে।

—ছেড়ে দেন।

—দেব। দিচ্ছি। ইস্কুলে যাস্ না কেন?

—জ্বর হইছিল মাস্টারবাবু। আজ ভাত খাইছে। উ কি কবছেন? ছাড়েন ছাড়েন। চাঁপা ঘোমটা-টা ঈষৎ সরিয়ে বলে উঠল।

মাস্টার একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু চুল ছাড়লে না।

—জ্বর? এই চকচকে চেহারায় জ্বর? বললে সে। তুমি কে? সাক্ষী দিচ্ছ?

চাঁপা বললে—আমি পাটকাম করি—আসি যাই বাড়ি। আজ ক'দিন থেক্যা জ্বর! আজ ভাত খাইছে। মাথাডা কাগের বাসা হইয়া গেছিল গিয়া। তাই ত্যাল দিছে! মারেন ক্যানে?

মাস্টার এবার ছেড়ে দিলে। বললে—জ্বর তো এই শীতের সন্ধ্যেতে খোলায় হিমে বসে নীল উজল তারাটি করছে কেন?

খোকাঠাকুর এবার যা করলে তা কল্পনাতীত। চট করে বাগানেব একটা পড়ে থাকা বাঁশের খুঁটি কুড়িয়ে সেটাকে বাগিয়ে ধরে বললে—বেশ করছি রে ব্যাটা বেশ করছি। তোর মুখে, তোদের ইস্কুলের ছাদ্দতে কেত্তন করছি। এখন যাবি না বাঁশের বাড়ি খাবি?

মাস্টার আর কথা বলে নাই, সে নীরবে পিছন ফিরে চলে গিয়েছিল, বাড়ি ঢুকবার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তোকে রাস্টিকেট করব।

—আমার কচু হবে। আমি বাবা ভুবনেশ্বরের মাথায় বেলপাতা চড়িয়ে খাই, মা গন্ধেশ্বরীর আটনে ফুল দি, মা সরস্বতীকে ডাকলে আসে। তোদের ইস্কুল আমি ছেড়ে দিলাম। যা!

মাস্টার তবু দাঁড়িয়ে ছিল। বোধ হয় এই মেয়েদুটির সামনে এই অপমান তার সহ্য হচ্ছিল না। সে বলেছিল—বেটা বাপকে খেয়েছে, মাকে খেয়েছে, বুড়ী পিসীমার আদরে বখে গিয়েছে! শেষ পর্যন্ত গাঁজা মদ খাবি যা পাণ্ডারা চিরকাল করেছে!

খোকাঠাকুর বলেছিল—যাবি—না তোকে ওই ছাগলটার মত বেঁধে রাখব বিনা হুকুমে ঘরে ঢুকেছিস বলে? আমি আইন জানি।

মাস্টার এবার চলে গিয়েছিল।

খোকাঠাকুর এবার বাঁশটা ফেলে দিয়ে পৈতে ধরে বলেছিল—আমি শাপ দিলাম তোর অম্বলশূল হবে!

তারপর বাঁশটা ফেলে দিয়ে রুক্ষস্বরে বলে উঠল—কি? আজ ফের ছাগল ছেড়ে দিয়েছ তোমরা। এই মেয়েটা! আজ সত্যিই তোকে মারব!

—আগে শুনেন—কথাটা শুনেন সোনাঠাকুর!

—সোনাঠাকুর কি? এ্যাঁ—? খোকাঠাকুরও এবার হকচকিয়ে গেল।

চাঁপা বলেছিল—সোনার পারা দেহের বরণ, বাঁশীর মতন গলার স্বর। তুমি ঠাকুর সোনার গৌর! তাই কইছি সোনাঠাকুর!

—ও বললে হবে না। রোজ রোজ ছাগলে গাছ খাবে আমি ছাড়ব না! বেঁধে রাখ না কেন?

তাইতো কই সোনাঠাকুর কথাটা শুনেন। আমার বুনঝি গিয়া কইল—মাসী তুমি শুনলা না, সে কী গান! যেন বাঁশী! কদম্বমূলের বাঁশী! রাতে মাইয়া ঘুমায় না। আজ বললাম—যাওনা গান শুইনা আসো, তা কয়, কী বইলা যাব। তো কইলাম—বুনঝি ছাগলডারে ছাইড়া দাও, ও ঠিক যাইবে গিয়া ওই ফুলের গাছের লোভে লোভে—ধরাও পড়বে, তখন তুমি যাইবে। তা অর সাথে আমিও আসলাম। কান জুড়াইয়া গেল সোনাঠাকুর তোমার গান শুইনা। তা অখুন ছাগলডারে ছাইড়া দাও, বাড়িতে দুইটা বাচ্ছা কাঁইদা সারা হইল।

সোনাঠাকুর সত্যই ছেড়ে দিয়েছিল ছাগলটাকে বিনা বাক্যব্যয়ে।

চাঁপা মাসী পথে বলেছিল—বস' বুনঝি হেঁস্যা লই।

সত্যিই সে খুব হেসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মালতীও হেসেছিল। তার কাছে আজ সন্ধ্যেবেলার সবটাই অপরূপ উপভোগ্য হয়ে রয়েছে। ওই গানখানা কী ভালই লেগেছে! গান শুনছে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে খুঁজছে নীল তারাটিকে। কিন্তু পশ্চিম দিকটা শিবঠাকুরের সেবায়েতদের বাড়ির চাল আর গাছপালায় ঢাকা পড়ে আছে। দেখা যায় নি। আকাশে তারা আজ বেশী নেই। যা আছে সব যেন মিটমিটে হয়ে গেছে জ্যোৎস্নায়। আজ পূর্ণিমা কিংবা শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। শীতও বেশ পড়েছে। কিন্তু শীতের কথা মনে হয়নি। কী সুন্দর গান খোকাঠাকুরের। তারপরই খোকাঠাকুরের সঙ্গে মাস্টারের কী কাণ্ড! খোকাঠাকুর বেশ। বলে—গুরুর কান! খবরদার ধরবে না। মনে পড়লেই হাসি পাচ্ছে। তারপর বাঁশের খুঁটি নিয়ে ঠাকুর একেবারে পুচকে ভীমের মত কাণ্ড বাধিয়ে দিলে! মাস্টার সুড়সুড় করে লেজ গুটিয়ে পালাল। মাস্টারের যে অন্যায়! এমন সুন্দর গলা, এমন সুন্দর গাইতে পারে, সে আপন বাড়িতে বাগানে বসে গান গেয়েছে তাতে আর দোষটা কি হল? ইস্কুল যায় না। তা পড়তে ওর ভাল লাগবে কেন? আর পড়ার দরকারটাই বা কি? যাত্রাদলে চলে যাবে। গন্ধেশ্বরীতলায় কলকাতার বড় বড় দল আসে—তাদের দলের ছেলেদের গানও তো শুনেছে মালতী! তাদের ক'জনের এমন গলা! বেশ বলেছে—শিবঠাকুরের মাথায় বেলপাতা চড়িয়ে খাই, মা গন্ধেশ্বরীর পুজো করি, মা সরস্বতী আপনি আসে! তারপর চাঁপা মাসী! চাঁপা মাসী—খুব! খুব তুমি চাঁপা মাসী। খুব জাঁহাবাজ, খুব ফাজিল খুব ফক্কড়। কেমন না হেসে বেশ বিনিয়ে বিনিয়ে বললে—তোমার গান শুনবে—তা আসবার তো একটা ছুতো চাই। তাই ছাগলটা ছেড়ে দিয়েছে। আর কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে বললে—সোনার গৌরের মত চেহারা তোমার, বাঁশীর মত গলা—তুমি সোনাঠাকুর! সব মিলিয়ে ভারী মজার ব্যাপার মনে হয়েছিল মালার। কিন্তু চাঁপা মাসীর জিত—তাতে তার সন্দেহ ছিল না।

কথাগুলি ধরণী দাসকে শ্রীমন্ত বলেছিল পরের দিন শুক্রবারের হাটে। শ্রীমন্তকে কথাটা চাঁপা মাসী বলেছিল। সে বেশ হাত পা নেড়ে ভঙ্গি করে হেসে প্রায় উলটে পড়তে পড়তে বলেছিল।

শ্রীমন্ত প্রথম একবার চটে উঠে বলেছিল—ফ্যাকফ্যাক করে হাসে দেখ্‌।

চাঁপা আরও হেসে উঠেছিল। শ্রীমন্ত বলেছিল—নোড়া দিয়ে দাঁতগুলো তোর ভাঙব আমি।

চাঁপা বলেছিল—তুমি ঠকবা। শ্যাষম্যাষ আবার বাধাইয়া দিবা। তুমি এত চট ক্যানে গো কর্তা ; তোমার দাঁত তো ভাংগে নাই!

শ্রীমন্ত বলেছিল—মালা, বল তো হাসির এত কি হল?

মালা বলেছিল—আমি পারব না। হাসি আসছে!

—তোরও হাসি আসছে?

—ও মানিক, তুমি যদি খোকাঠাকুরেব বাঁশেব খেঁটে নিয়ে গুরুমশায় তাডানটা দেখতা! তা হলে তুমিও ভূঁয়ে পইড়া হাঁসতা।

না দেখেও কানে শুনে, ভূঁয়ে পড়ে না হলেও, যথেষ্ট হেসেছিল শ্রীমন্ত। কোন বকমে চাঁপাই কথাগুলি বলে শেষ কবেছিল।

পবদিন খোকাঠাকুর হাটে এসেছিল পাণ্ডা সেজে! এর আগে পর্যন্ত ওব পিসীই আসত, বাবা ভুবনেশ্ববতলায় দাঁড়াত, হাটযাত্রী ও থানের যাত্রীদেব পুষ্প দিত। অম্বলেব ওষুধেব গুঁড়ো দিত। পয়সা নিত। বাবার স্থানেব প্রণামীব টাকাব দুপযসা ভাগ নিত। দে'দেব পাঠানো তোলাব নিয়ম ছিল। তোলা পাবে পালিদাব, তবুও একটা বেগুন দুটো মূলো চারটে আলু সে আঁচলে ভবে নিয়ে যেত জোর কবে। বলত—নাবালক ছেলে। পাবে কোথা? বড় হলে নেবে না।

এ কথাতেও কেউ প্রতিবাদ করলে বলত—দেখ বাবা বকো না। আমার ভাইপো বড় হলে পাণ্ডাগিরি করতে আসবে না। এ দেখে নিয়ো।

পিসী ওকে অনেক সাধ আশা করে পড়তে দিয়েছিল, ছেলে চাকরি কববে। না হলে বড ওস্তাদ হবে। নবু, অর্থাৎ খোকাঠাকুবের নাম নবগোপাল, নবগোপালের বাবাও ওস্তাদি করে বেড়াত। নামও ছিল এ অঞ্চলে। তখন দেশে গানের বেশ চল্‌তি হয়েছিল, বিশেষ করে ভদ্রঘরের মেয়েদের বিয়ের জন্যে। মেয়েরা এখানকার ইস্কুলে মাইনর পর্যন্ত পড়ত, কেউ পাস করত কেউ করত না! কিন্তু ওতেই লেখাপড়াজানা বলে চলে যেত। কিন্তু শুধু লেখাপড়ায় বিয়ে হত না, বিয়ের সম্বন্ধ হলে পাত্রপক্ষ জিজ্ঞেস করত—গানটান জানে?

করত ঠিক নয়, শহরবাজারে এ জিজ্ঞাসা করে সুতরাং এখানেও করবে এ প্রত্যাশাতেও বটে, আবার শহরের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেব মেয়ের এই গোপন ইচ্ছাতেও বটে রেওয়াজটা উঠেছিল। নবুর বাবা নিত্যগোপাল মিশ্রেরও গলা খুব ভাল ছিল, গান তারও ছিল জন্মগত সম্পত্তি—শিখেওছিল সে ভাল ওস্তাদের কাছে। ওস্তাদের কাছে গানও শিখেছিল নেশাও শিখেছিল। নেশা অবিশ্যি শিবঠাকুরের পাণ্ডারা করে। তারপর ওস্তাদি করে বেড়াত। গ্রাম অঞ্চলের তখন থিয়েটারেরও চলন হয়েছে—থিয়েটারেও বৈতালিক সেজে গান গাইত রোজগার কিছু হত। এই সময়েই গাঁয়ে এসেছিল নতুন ডাক্তার নিশিবাবু। ডাক্তাবখানার চাকরি নিয়ে এসেছিল—সঙ্গে স্ত্রী আর দুই মেয়ে। মেয়েদের ইস্কুলে ভরতি করেই ডাক্তার কর্তব্য শেষ করে নি—প্রাইভেট মাস্টার রেখেছিল; বড় মেয়ে তখন মাইনর ক্লাশে পড়া শেষ করেছে। তার সঙ্গে নিত্যগোপালকেও বেখেছিল গান শেখাবার জন্যে। তারপর দেখাদেখি দে বাবুদের বাড়িতেও রেওয়াজ ঢুকেছিল।

নিত্যগোপাল্ হঠাৎ মারা গিয়েছিল তিবিশ বছর বয়সে। তখন স্ত্রীর কোলে নবগোপাল তিন বছরের ছেলে। নবগোপালের আগে দুটি সন্তান হয়ে মারা গেছে। নবগোপালের পাঁচ বছর বয়সে মারা গেল মা। পিসী ছিল বাড়িতে—মকু বা মোক্ষদা ঠাকরুন—সেই মানুষ করেছিল ভাইপোকে। এবং ছেলেবেলাতেই বাপ মা খাওয়াতে প্রত্যাশা করেছিল ভাইপো মস্ত লোক হবে।

নবগোপালের জন্যে প্রাইভেট মাস্টারও রেখেছিল। কিন্তু নবগোপাল ইস্কুলে ফেল করলেই মাস্টার বদলাতো। এই কানধরা মাস্টার এবারকার বরখাস্তকরা মাস্টার।

নবগোপাল কাল সন্ধ্যেতেই পিসীকে বলে দিয়েছে—ও পড়াশুনো আমার দ্বারা হবে না। কাল থেকে আমি বাবার থানে যাব। কুলকম্ম করব।

পিসী বাদপ্রতিবাদ করেছে কান্নাকাটি করেছে কিন্তু নবগোপাল অনড়। বারো বছর বয়সে সে বাইশ বছরের মত আইন শিখেছে; সে বলেছে—তুমি আমার গার্জেন লও। সংসারে বাপ মলে মা গার্জেন হয়, যার বাপ মা দুই মরে তার কাকা টাকা গার্জেন হয়। তুমি পিসী, ভিন্ন গোত্র—তুমি গার্জেন হতেই পার না। আমি নিজেই আমার গার্জেন।

সে আজ স্নান করে পাটের কাপড় পরেছে, কপালে ছাইয়ের একটা লম্বা তিলক কেটেছে, হাতে বেতের একগাছা ছড়ি নিয়ে দস্তুরমত পাণ্ডা সেজে হাটের এবং ভুবনেশ্বরের ঢিপির মুখটাতে দাঁড়িয়েছে।

শুক্রবারের হাট বড় হাট নয়। সোমবারের হাট বড়। সোমবারে চার দিনের অর্থাৎ সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতির হাট পড়ে, শুক্রবারে তিন দিনের—শুক্র শনি রবি; এ ছাড়া সোমবারটা শিবের পূজোর প্রশস্ত বার। তবে শুক্রবাবে লোকে বাবার থানে ঢেলা বাঁধতে আসে। ভুবনেশ্বরের থানের ওপাশে যেখানে এককালে বট অশত্থ শিমুল বেল গাছে বাবার ভূতবাহিনীর কেল্লা ছিল সেখানকার কয়েকটা প্রাচীন বটগাছ আজও আছে—সেগুলো থেকে অসংখ্য ঝুরি নামে, লোকে এসে পুকুরে ভুবনদিঘীতে স্নান করে গোপন মনস্কামনা বাবাকে জানিয়ে ভিজে চুলে ভিজে কাপড়ে ওই ঝুরিতে একটি পাথর কি ঘুটিং কি ইটেব টুকরো বেঁধে দিয়ে যায়। এতে নাকি মনস্কামনা পূর্ণ হতেই হয়। যখন হয় তখন লোকে আবার এসে বাবাকে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে ঢেলাটি খুলে দিয়ে যায়। কারুর কারুব ঢেলা আপনিই খসে যায়। কেউ কেউ এসে খানিকটা চুন গাছের গায়ে লেপে দেয়। এটার মধ্যে নিহিত অর্থ বা মনের অভিপ্রায় বুঝতে কারুর বাকী থাকে না—লোকে বুঝতে পারে কারুর উপর বিশেষ আক্রোশ করে চুন লেপেছে—এর ফলে যার উপর আক্রোশ তার গায়ে এমনি সাদা দাগ শ্বেতি রোগ হয়ে ফুটে বেরুবে। শুক্রবারে চুনুরীরা চুন নিয়ে আসে—একেবারে বাবার থানের কাছটাতেই বসে।

কাউকে ঢেলা বাঁধতে বা চুন লেপতে দেখলেই পাণ্ডারা গিয়ে কাছে দাঁড়ায়, বলে—সংকল্প করে বাঁধতে হয় বাবা। সংকল্প কর। বল—অদ্য পৌষ মাসে কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে আমি—বল, নাম বল নিজের—হ্যাঁ তারপর মনে মনে বল, সংকল্পের কথা বল—যা সংকল্প—দারিদ্র্যমোচন চাও তাই বল—মকদ্দমায় জয় চাও তাই বল—কাউকে যদি ভালবাস তাই বল—বল অমুককে ব্রাহ্মণ হলে দেবী বল, শূদ্র হলে দাসী বল—তস্ত মনপ্রাপ্তি হেতু অদ্যমহং লোষ্ট্রবন্ধনং করিষ্যে। বাবা ভুবনেশ্বর সত্য হলে পূর্ণ হবে। তবে মনকে যাচাই কর বাবা এ কামনা সত্য না মিথ্যা। হ্যাঁ। বাঁধ

বেশ ভাল করে বাঁধো হ্যাঁ। এখন এস—চরণোদক খাও আর পুষ্প নিয়ে যাও—রেখে দিয়ো যত্ন করে। দক্ষিণে দু পয়সা পাঁচ পয়সা যা ইচ্ছে দাও। এক পয়সায় দক্ষিণে হয় না। কাঞ্চনমূল্য কিনা! বাবাকে প্রণামী এক পয়সা দিতে পার। ভুবনেশ্বরের হাট—মা গন্ধেশ্বরীর দরবার, এখানে দুধ দিয়ে সুখ পায়, রোগ দিয়ে আরোগ্য পায়, সোনার হরিণের মত পালানো মন জালে পড়ে; খোদ বাবার বর আছে।

কথার শেষে হেঁকে ওঠে—হর হর বোম্ হর হর বোম্। বোম্ ভুবনেশ্বর বিশ্বনাথ!

বিকেলবেলা হাট—হাটুরেরা অধিকাংশই আসে বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে। গাড়িতে আসে মাল ভারে আসে মাল—মাথার ঝুড়িতে আসে মাল। আপন আপন বাঁধা জায়গায় বড় বড় চ্যাটাই বিছিয়ে মাল ঢেলে সাজায়। শীতকালে তরকারির মরসুম। নানান তরকারি। বেগুন, মুলো, নতুন আলু, কাঁচা কুমড়ো, লঙ্কা, নতুন পেঁয়াজ, এমন কি কপি মটরশুটিও আজকাল আসে। ফুলকপিটা কম—বাঁধাকপি একটু দেরিতে হলেও প্রচুর আসে—আর সে সব কপি খুব বড় বড়। ওই ভুবনপুরের যে বিলটায় শ্রীমন্ত মাছ ধরত সেই বিলের ধারের জমিতে এবং ময়ূরাক্ষীর চরে খুব বড় রকম কপির চাষ হচ্ছে। কপি তো কপি এখন দুটো চারটে হাঁস আসে মুরগী আসে। মুরগীর হাঁসের ডিম আসে। মাছ এখানে বড় আসে না, মেছুনীরা ডালায় করে পাড়ায় পাড়ায় নিত্য বেড়ায়। তবে বড়সড় মাছ পেলে হাটে এনে বসে। নিয়মিত মাছ আসে কাঠ মাছ। কই মাগুর ন্যাটা। 'উরো' হাড়ির পেশা হল ওই গ'ড়েতে ডোবাতে বিলে লোপা দিয়ে কাঠ মাছ ধরা! মাছ ধরে এনে বাড়িতে বড় হাঁড়িতে জিইয়ে রাখে, হাটের দিন উরোর বউ খালুই ভরতি করে এনে হাটে বসে। বসে ঠিক কুমোরদের মাটির জিনিসের পাশে, তার পাশে বসে যত তালপাতা খেজুরপাতার তালাই ও চ্যাটাই; তার পাশে বসে মাছধরা পলুই বাঁশের মোড়া ডালা কুলো ঝুড়ি এবং মাথালীওয়ালারা। দু'চারটে ফুলের সাজিও থাকে। খেজুরপাতার কাজ করে বীরবংশীরা তার পাশেই বসে হাঁস ও হাঁসের ডিমওয়ালী দুনো গাঁয়ের রুইদাসদের মেয়ে দুজন। সরু গলায় হাঁকে—হাঁস লেবা গো? হাঁস। ডিম লেবা গো? ডি—ম হাঁ—স!

বেশ বলার ঢঙটি। প্রথম ঠাণ্ডা গলায় বলে হাঁস লেবা গো? তারপর

চেঁচিয়ে ওঠে—হাঁ—স ! তারপর সমান জোরে বলে—ডিম লেবা গো— ? তারপর গলা নামতে থাকে—ডি—ম ! হাঁ—স ! মধ্যে মধ্যে হাঁসটার বুকে বা পাঁজরায় আঙুল দিয়ে টিপে দেয়—সেটাও ডেকে ওঠে প্যাঁ—ক প্যাঁক শব্দ করে।

ওসমান পাইকার দড়ি বেঁধে একটা খাসি ও ছাগল নিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকে—খাছি—খাছি ছাগল—গরুর মতন দুধ ! বলে হাঁকে। ওর পাশে পায়ে পায়ে বাঁধা কয়েকটা মুরগী থাকে। ওসমান পাইকারের খদ্দের সব বাঁধা আছে। দে বাবুদের ছোকরারা। সাবরেজিস্ট্রার। দারোগা। দু'একজন ইস্কুলমাস্টারও আছে। হাটের কলরব কোলাহল ছাপিয়ে ওসমানের গলা শুনলেই তারা আসে খাসি ছাগলের দর করতে এবং মুরগী কিনে থলের মধ্যে পুরে নিয়ে যায়। ওসমানের পাশে বসে হামিদ চাচী। সে হাঁকে—মুরগীর এণ্ডা ! মুরগীর এণ্ডা !

এরা সব বসে হাটের পিছন দিকটায় একপাশে।

সামনে বসে ফলওয়ালারা। ফল আর কি ? গ্রীষ্মকালে আম জাম কাঁঠাল ফুটি আসে। ময়ূরাক্ষীর ধারের তরমুজও আসে। শীতের সময় শাকআলু, নারকুলে কুল আসে—কিছুদিন থেকে কমলালেবু আসছে। ডাব এখানে কম। তবে দু'চারটে থাকে। আর বারোমাস হিন্দুস্থানী সাহানীরা নিয়ে আসে কাগজে মোড়া খেজুর, শুকনো বেদানা, বাক্সবন্দী দাগিধরা আঙুর, কিসমিস আর অল্পসল্প বাদাম পেস্তা।

এ একেবারে বাবার থানের সামনে। তার পাশেই ধরণী দাসের একখানি চালা। কাপড় মশারি গামছা। তারই আধখানায় শ্রীমন্তের মনিহারী আর মাছ ধরার সরঞ্জাম। তার পাশে গোবিন্দ বণিকের কাপড় জামা ফ্রকের দোকানের চালা। চালার সারি চলে গেছে দু'পাশে। মিষ্টির দোকান। তেলেভাজার দোকান। আরও কতকগুলো মনিহারীর দোকান। এ ছাড়াও ভুবনেশ্বরের থানের সিঁড়ির মুখ থেকে রাস্তার দু'ধারে চ্যাটাই পেতে অনেক দোকান বসে। তার মধ্যে কুম্ভকারদের মাটির ঘোড়ার দোকান অনেক পুরনো। বাবার থানে ঘোড়া কিনে দিয়ে যায়।

প্রবাদ বিশ্বেশ্বরের ওখানে ষাঁড় বাঁধা আছে, এখানে ভুবনেশ্বর তাই ঘোড়ায় চড়েন। তবে ঘোড়াগুলির একটা পা ছোট। অর্থাৎ খোঁড়া। ডান ঠ্যাংটি লটরপটর বাঁ ঠ্যাংটি খোঁড়া বাবা ভুবনেশ্বরের

ঘোড়া। ওই ঘোড়ায় চড়ে নাকি বাবা রাত্রে মা গন্ধেশ্বরীর আটন পর্যন্ত যান।

টিকলির মা এখানে এসেছিল যখন ভরতি যুবতী! এসেছিল গঙ্গারামের সঙ্গে। টিকলিই এখন প্রায় যুবতী হয়ে উঠেছে টিকলির মা বলে সে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেছে।

চুনারিয়ার বাবা সেও বুড়ো—সেও বলে শুনেছে।

জমাদারেরা এখানকার তিন পুরুষের ঝাড়ুদার—তারা বলে তারা বাপ দাদার কাছে শুনেছে।

এ ছাড়া আর আছে খানদুয়েক বইয়ের দোকান। লক্ষ্মীর পাঁচালী কৃষ্ণের শতনাম থেকে সুরথ-উদ্ধার গীতাভিনয়—সচিত্র প্রেমপত্র—তার সঙ্গে গুম খুন বশীকরণ-বিদ্যা কামরূপতন্ত্র—তার সঙ্গে প্রথম ভাগ ধারাপাত পর্যন্ত।

এই কোলাহলের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে পাণ্ডাদের ওই জোর হাঁক শোনা যায়—হর হর বোম্। বো—ম্ ভুবনেশ্বর।

সেদিন শীতের দিনটি বেশ মৌজের শীতের দিন ছিল। আগের রাত্রে শীতটি জমাট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বেলা দুটো নাগাদ রোদটি চড়ে ভারী মিঠে লাগছিল। এরই মধ্যে সুমিষ্ট কিশোর কণ্ঠে খোকাঠাকুর নবু হেঁকে উঠেছিল—

বাবা ভুবনেশ্বরো মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করো!

হর হর বোম্! হর হর বোম্! বো—ম্ ভুবনেশ্বর!

ধরণী দাস সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলছিল—নিত্যঠাকুরের ছেলে! ও তো ইস্কুলে পড়ত! ওর পিসী বলত নবু হাকিম হবে! তা—

হেসে উঠেছিল মালতী। হি-হি-হি-হি-হি!

শ্রীমন্ত না-হেসে পারেনি। শীতের দিন মাছের সরঞ্জামের বিক্রী কম। তার জন্যে মেজাজ শ্রীমন্তের ভাল থাকে না। তবু শ্রীমন্ত হেসেছিল।

ধরণী বলেছিল—হাসলে যে!

শ্রীমন্ত বলেছিল—ঠাকুর আচ্ছা ঠাকুর। কাল—

মালতী আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

শ্রীমন্ত সবিস্তারে বলেছিল আগের দিনের সন্ধ্যার বিবরণ। ধরণী দাসও খুব হেসেছিল। বলেছিল—এ ছেলে যে আঁটি হে পুঁতলে গাছ হয়। এ্যাঁ?

—যে-সে আঁটি নয়। ম্যাজিক আঁটি। ফাং গঙ্গারামের ম্যাজিক আঁটি মনে পড়ে?

গঙ্গারাম বলে একজন বাউণ্ডুলে ভেলকিবাজিওলা কিছুদিন ভুবনপুরের হাটেব বটতলায় বাসা নিয়েছিল। সে সাপ ধরত। সাপের বিষ গেলে গাঁজার সঙ্গে মিশিয়ে খেতো। এসেছিল ওই টিকৃলির মাকে নিয়ে। তখন টিকৃলির মা যুবতী। সেই গঙ্গারাম খেলা দেখাত ম্যাজিক আঁটির। একটা শুকনো আঁটি মাটিতে পুঁতে জল ছিটিয়ে ঝুড়ি ঢাকা দিত। তারপর ঝুড়ি তুললেই গাছ দেখা যেত।

ধরণী দাস বলেছিল—ঠিক বলেছ! তাই বটে! মাস্টারকে বাঁশের খেঁটে নিয়ে—। বলতে বলতে একটা কোঁক শব্দ করে হেসে উঠেছিল হা-হা শব্দে।

মনে আছে ধরণীর ঠিক এই সময়টিতেই একটা হৈ হৈ শব্দ উঠেছিল বাকুলের চাষী হরিদাসের বেগুনের ওখানে।

—মার—মার—মার!

—কি হল? ঘাড় তুলেছিল ধরণী দাস।

—আবার কি? চুরি! শ্রীমন্ত বলেছিল।

মালতী ছুটে দেখতে গিয়েছিল। চুরিই বটে। মরি বাউড়িনী দর করতে বসে কখন একটা বেগুন আঁচলে পুরেছিল দেখতে পায় নি হরিদাস। দরে বনল না বলে যেই মরি উঠেছে অমনি নজরে পড়েছে হরিদাসের। সঙ্গে সঙ্গে সে ধরেছে তার হাত চেপে। হাত চেপে ধরতেই বেগুনটা পড়েছে মাটিতে। ওদিকে হরিদাসের কিল পড়তে শুরু করেছে ম'রির পিঠে! শুধু হবিদাসের নয়, আরও অনেকের। আরও অনেক কিলই পড়ত মরির পিঠে। কিন্তু ওই খোকাঠাকুর এসে তুই হাতে ভিড় সরিয়ে ধমক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং সব থামিয়ে দিলে। ছেলেটির জোর আর কতটুকু, কিন্তু হঠ যাও হঠ যাও বলে এমন চীৎকার করলে এবং চীৎকারের মধ্যে এমন একটা তেজ ছিল যে সকলেই হঠে গিয়ে জায়গা দিলে তাকে ভিতরে ঢুকতে। তারপর সে তুহাত তুলে বলল—থাম সব থাম।

কপালে ছাইয়ের তিলক, গলায় পৈতে, ধবধবে রঙ, সুন্দর চেহারা খোকাঠাকুর যেন ভেলকি লাগিয়ে দিলে। এমন একটি মানুষকে তারা অমান্য করতে পারলে না। খোকাঠাকুর বয়সে বাচ্চা হলেও তার ভেতর

থেকে যেন অন্য একটা মানুষ বেরিয়ে এল। এবং বিচারও সে করলে। মরি বাউড়িনীর চুল খুলে গিয়েছিল—ছিঁড়েও গিয়েছিল অনেকগুলো, গায়ের কাপড়ও খুলে গিয়েছিল—ছিঁড়েও গিয়েছিল—ধুলো লেগেছিল সর্বাঙ্গে কিন্তু সে এতক্ষণ ঠিক কাঁদে নি, শুধু চীৎকার করছিল। প্রতিটি কিল চড়ের সঙ্গে চেঁচাচ্ছিল—ওরে বাবারে! বাবারে! আর মেরো না। বাবারে! মারে বলে। এবার কিল চড় থেমে যেতেই সে পরিত্রাতা খোকাঠাকুরের চরণ ধরে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল—ওগো ঠাকুর গো—মরে গিয়েছি—বাবাগো! আর মেরো না—বাঁচাও গো! তোমার পায়ে ধরি বাবাগো।

লোকেরা হেসে উঠল হো-হো করে।

ঠাকুর বললে—থাম! থাম!

থেমে গেল সকলে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে—বেগুন চুরি করেছিলে ক্যানে?

—দোষ হইছে বাবাগো! নাক মলছি কান মলছি আর কখনও করব না গো! বেশী লিই নাই—একটো লিয়েছিলাম বাবাগো! তার তরে কিল খেয়েছি বিশ গণ্ডা—আর মেরো না বাবাগো!

খোকাঠাকুর বললে—কেউ যাও তো চুনুরীদের কাছ থেকে চুন নিয়ে এস! যাও! মুখে লেপে দাও হারামজাদীর!

লোকে উৎসাহিত হয়ে উঠল। বুঝেছে সকলে মরির মুখে চুনের হিজিবিজি এঁকে দেবে। মরি তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল—ওগো ঠাকুর গো, একটো বেগুনের তরে চুন দিয়ো না বাবাগো! ফুল হয়ে ফুটে উডবে গো! বাবা শিবের থান গো!

কিন্তু ছাড়লে না ঠাকুর। মরির তুই গালে কপালে চুনের দাগ দিয়ে বললে—যা!

মরি উঠেই কোন রকমে হাট থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল। খানিকটা দূর গিয়ে তার চেহারা পাল্‌টাল—কোমরে কাপড় জড়িয়ে মাথার এলোমেলো চুলগুলো হাতে জড়িয়ে নোটন বাঁধতে বাঁধতে চেঁচাতে লাগল—যত দোষ মরির। মরি মরা কিনা বুড়ী কিনা তাই। ওই যে টিকূলি কাঁচা লঙ্কা নেবু মুঠো মুঠো তুলে এক-কোঁচড়ে করেছে, আলু নিয়েছে—তার বেলাতে? ওই চুনারীয়া, উ যে কমলানেবু লিয়েছে! এ্যা! ওই যি বাবুরা লঙ্কা নেবু দেখতে গিয়ে পকেটে ভরেছে—দেখুক পকেট দেখি! উঁ! চুনে

আমার কিছু হবে না। ধুয়ে নিলে উঠে যাবে। একটো বেগুনের লেগে বিশ গণ্ডা কিল!

হাট তখন আবার বিকিকিনিতে কারবারে মগ্ন হয়ে গেছে। হরিদাস হাঁকছে—এই বেগুন বাকুলের বেগুন। মাখন মাখন! মাখন ফেলে খেতে হয়।

—নতুন আলু। নতুন আলু।

—চাব হাত কার! চাবকী ফিতে।

ধবণী দাসও হেঁকে উঠল—তাঁতের শাড়ি! নকশীপাড়! চৌখুপী ডুরে! লাল গামছা!

তুটি বসিকা বেশ-বিলাসিনী মেয়ে ওর দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ধবণী দাস হেঁকে তাদের আহ্বান করলে—এস!

শ্রীমন্ত হাঁকলে—তরল আলতা! গন্ধতেল!

মেয়ে তুটি থমকে দাঁড়িয়ে এ ওর গা টিপে হেসে ইঙ্গিত করে দাঁড়িয়ে গেল। একজন বললে—সস্তা না আক্রা?

মালতী কখন ফিরে এসে বাবার পাশে বসেছিল। সে বললে—বাবা খোকাঠাকুব!

খোকাঠাকুরই বটে। সে মেয়ে তুটোকে বললে—এই সব! শুনছিস্?

—ও বাবা—ডেঁকা ঠাকুর!

'ডেঁকা'র মানে কেউটে গোখরোর বাচ্চা! তারা সরে দাঁড়াল!

নবু ধরণী দাসেব দোকানে দাঁড়িয়ে সেদিন চেয়েছিল গামছা।

বেশ বড় আর মোটা খাপি গামছা আছে? ও লাল গামছা নয়। সাদা জমি। আছে?

—আছে বইকি! কি করবেন?

—কি করে গামছা নিয়ে?

ধরণী দাস অপ্রস্তুত হয় নি—বলছিল—গামছায় গা মোছে আবার গায়ে দিয়ে ঘুরেও তো বেড়ান গো আপনারা!

মালতী বলে উঠেছিল—পাণ্ডারা গামছা পূজোও করে। বামুনেরা কাপড়ের ওপর জড়িয়ে ভাত রাঁধে পরিবেশন করে।

—উ! সেই মেয়েটা। বলে ছাগলের জন্যে পুলিসে খবর দোব ভারী মুখরা।

—আর তুমি যে বাঁশের খেঁটে নিয়ে মাস্টারকে মারতে যাও।

—বেটা আমার গুরুর কান ধরলে ক্যানে ?

একখানা বড় গামছা বের করে ফেলে দিয়ে ধবণী দাস বললে—এই আছে। পছন্দ না হলে, তোয়ালের মত বুনন একরকম সাড়ে তিন হাত গামছা উঠেছে—সাঁইতের হাট থেকে এনে দোব সোমবারে।

—ঠিক দেবে তো! আমি সেই রকম খুঁজছি।

—আমি না যাই শ্রীমন্ত যাবেই। ও এনে দেবে।

—কি শ্রীমন্ত ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দোব।

—হ্যাঁ—না হলে এবার তোমার ছাগল আমি ছাড়ব না।

—আমরা বেঁধে রেখে দোব। আর যাবেই না।

মালতী বলে উঠেছিল।

—মন্তরের চোটে আমি নিয়ে আসব ছাগল।

মালতীর মুখ শুকিয়েছিল।

শ্রীমন্ত বলেছিল—আমি ঠিক এনে দোব—দেখবেন আপনি।

যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে নবু বলেছিল—তুমি সাঁইতে প্রতি হাটে যাও ?

—প্রতি হাটে যাই না। রবিবার বড় হাট—রবিবারে যাই।

—আমার আর একটি কাজ করে দেবে ?

—কি বলুন ?

—আমার বাবার ডুগি তবলা আর পাখোয়াজ ছিঁড়ে পড়ে আছে। সাঁইতের হাটে শুনেছি বায়েনরা আসে—তারা খুব ভালো ছাওয়ায়। ওগুলো ছাইয়ে এনে দিতে পার ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের নামসংকীর্তনের দলের খোল ওরাই ছাইয়ে দেয়। আলাপ আছে আমার সঙ্গে। দেবেন। মুশকিল নিয়ে যাওয়াব আনার।

—তা একটা মুনিষের দাম আমি দোব।

—আর কি দেবে বাবাকে মজুরি ?

মালতী আবার বলে উঠেছিল।

—তুই হলে কচুপোড়া দিতাম। শ্রীমন্তকে আশীর্বাদ করব।

—উহু । আমাদের বাড়িতে এসে একদিন গান শোনাতে হবে।

—তা শোনাব!

বলে চলে গিয়েছিল নবুঠাকুর। ধরণী দাস শ্রীমন্ত মালতী ওর যাবার পথের দিকেই তাকিয়েছিল। হাট তখন জমে উঠেছে—প্রায় চারটে সওয়া চারটে বাজে। লোক জমজম গমগম করছে। শীতের কাল, ধান উঠেছে—পয়সা আছে লোকের হাতে; তা ছাড়া গরম নেই। খারাপের মধ্যে শুধু ধুলো। ওদিকে গন্ধেশ্বরীতলায় গদিতে গদিতে ধানের গাড়ি লেগেছে। ওদিকে গঙ্গার ধার থেকে এসেছে শাঁকআলু, রাঙ্গা আলু, লঙ্কা, মসুর, ছোলা। কেনাবেচার দারুণ মরসুম। জমাট ভিড়ের মধ্যে মাথায় খাটো বাচ্চা ঠাকুর মিশে গেল। ধরণী দাস বললে—পাক্কা পাণ্ডা হবে ঠাকুর!

—কই গো লাল গামছা ডুরে শাড়ি? কই দেখাও? কই তোমারই বা তরল আলতা কই?

মেয়ে ছুটো আবার ফিরে এসেছে। ধরণী বললে—এস। এস বস ভাল করে। দাঁড়িয়ে কি দেখা হয়?

শ্রীমন্ত বললে—যা তো মালা ঠাকুরকে বলে আয় আজই যেন ডুগি তবলা পাখোয়াজ পাঠিয়ে দেয়!

মালাকে ইচ্ছে করে তাড়ালে শ্রীমন্ত। মেয়ে ছুটো রসিকার ওপরে কিছু। ওদের নিয়ে খানিকটা ডগমগ রসের কথার খেল্ খেলবে।

মালা ঠাকুরকে ভিড়ের মধ্যে পেলে না। সে গিয়ে বাবার থানের গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল। লোকে পাথর বাঁধছিল সেখানে। সেও একটা পাথর বাঁধবে ঠিক করলে—তার যেন ওই ঠাকুরের মত বর হয়। খুব আড়ালে গিয়ে কিন্তু বাঁধতে গিয়েও বাঁধলে না। ছি! আর—ঠাকুর যে বামুন!

॥ তিন ॥

(ক)

কথা তো আজকের নয় অনেক দিনের—।

মালতী হাটে ধরণী দাসের চালায় বসে মনে মনে হিসেব করে দেখলে সে প্রায় ন' বছর আগের কথা! সেদিনও সে বাবার পাতা দোকানের

পাশে এইখানেই বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেছিল। এই খুঁটিটাই বোধ হয়।

মালতী জিজ্ঞাসাও করলে—জেঠা, সেই খুঁটিগুলোই আছে? রঙ করেছ—নয়?

ধরণী দাস বললেন—না মা। নতুন খুঁটি। দেখছ না হাটের উন্নতি! এখন কি আর পুরনোতে চলে? যেমন কাল তেমনি চাল। হাট জাঁকাল। গুঁইরা দালান-বাড়ি করলে। শ্রীমতীর মিষ্টির দোকানের সামনে পাকা বারান্দা টানলে। সত্যও তাই করলে। ওই দেখ সরকারদের ছেলে কাঠের কারবার করছে—চেয়ার টেবিল বানাচ্ছে। ওই দেখ পশ্চিম পাশে ইঁট ঢেলেছে—এই পাশের ফ্রকওলা, পাকা করবে চালা—ইলেকটিরি লেবে সব। আমি মশারি বেচি মোটা কাপড় বেচি—আমি পাকা করব কি করে—আমি ভোগপুর থেকে ওই বাঁশ আনলাম। দেখছ না কেমন সোজা আর মোটা বাঁশ! সরল। তাতে রঙ লাগালাম। আর কি করব? ইচ্ছে ছিল থাম করে টিন দি। আছে ইচ্ছে। তা তোমরা ভাগ না ছাড়লে তো পারছি না! তোমার বাবা আমাকে দুশো টাকা নগদ দিয়ে চালার অর্ধেক কিনেছিল। জোর করে কি না-জানিয়ে পাকা না হয় কবে করে নিতে পারতাম—তা ধম্মকে জবাব দোব কি?

মালতী চুপ করে রইল। সে ভাবছিল।

ধরণী দাস বললে—আমি মা বলেছিলাম তোমার বাবাকে। বলেছিলাম—শ্রীমন্ত, সব বেচে মানুষ খায় ভাই, ধম্ম বেচে খায় না। তু ওই বামুনের ছেলের সম্পত্তি—সম্পত্তি আর কি, পুকুরের অংশ আর পাঁচ বিঘে ভাঙা জমি—ও নিয়ে তু ভাল করলি না!

একটু থামল সে। মালতীও চুপ করে রইল। দুজনের কাছে এবার হাটের শোরগোলটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। যেন পিছন দিক থেকে ঘুরে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল হাটটা। উঃ কত লোক! আগের কালেও লোক অনেক হত কিন্তু এত নয়। একটু উপর দিকে চাইলে শুধু মাথা মাথা আর মাথা। ঘোমটার কাপড়ও আর দেখা যায় না। একটু নীচে তাকালে জামার ছিট আর খালি গা। মেয়েদের গায়ের কাপড়ের নানান রঙ। আর কোলাহল। কত ভদ্রলোক। হাল ফ্যাশানের মেয়ে, চোখে চশমা পায়ে জুতো একদল। ওই সামনে ওপাশে কে একজন বেশ একটা বড় সাদা রঙের

মোরগকে ডানায় ধরে মাথার উপরে তুলে ধরেছে—মুরগীটা চেঁচাচ্ছে ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দে। কোন যন্ত্রণা পাচ্ছে। ওঃ তখন মুরগী কিনত লোকে বেশ লুকিয়ে ; এখন হাতে তুলে ধরে লোকটা হাঁকছে—বিলিতী মুবগী ! বিলিত মুবগী !

দুজন খদ্দের এসে দাঁড়াল।—মশারি, বেশ ভাল খাপি, আছে ?

—আছে বইকি, এস। বস। ক' হাত ?

—বেশ বড় চাই। ছেলেপিলে নিয়ে শোবে, পাঁচজন ছ'জন।

—চার হাত পাঁচ হাত দিই ?

—দাও।

ধবণী দাস মশারি বের করে ফেলে দিলে সামনে। —দেখ। দেখ বুনন দেখ। সুতো দেখ। খুলে দেখ—মাপো। হ্যাঁ। জিনিস লেবে বাবা দেখে লেবে ! দেখ—

সে উঠে দাঁড়াল—এই দেখ আঠারো ইঞ্চি দাগা গজকাঠি। তোমার হাত বড়—এক ইঞ্চি বড়। লাও মাপো !

মালতীর চোখের সামনে থেকে হাটটা আবার সরে যাচ্ছে। হাটটা যাচ্ছে না তার চোখের দৃষ্টি যাচ্ছে। মনের ভিতরের দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, নবুঠাকুর খোকাঠাকুরকে তার বাবা ঠকিয়ে নিয়েছিল। ঠকিয়ে নয়, ভুলিয়ে। ওই ডুগি তবলা পাখোয়াজ ছাইয়ে এনে দেওয়া নিয়ে খোকাঠাকুরের সঙ্গে আলাপ শুরু। ডুগি তবলা পাখোয়াজ তার বাবাকে দিয়ে গিয়েছিল ঠাকুব। পয়সাও দিয়েছিল, একটা মজুরের দাম, সাইতে নিয়ে যাবার জন্যে।

মনে আছে মাসী বলেছিল—তা সোনাঠাকুর আমাগো মজুরিডা ?

খোকাঠাকুর বলেছিল—আর তো পয়সা আনি নাই। শ্রীমন্ত তো চায় নাই।

—আমার কপাল ! নিজে মালারে বলেছ—দিব।

মালা বলে উঠেছিল—গান শোনাবে বলেছ।

—অ ! তা গান কি যখন তখন হয় ?

শ্রীমন্ত বলেছিল—যেমন তেমন গান যখন তখন হয়। গান না গেয়ে।

খোকাঠাকুর বেশ আসন করে বসেছিল। তারপর একটু গুন গুন করে সুর ভাঁজতে শুরু করেছিল। শ্রীমন্ত বলেছিল—দাঁড়ান দাঁড়ান খোলটা

আনি। সে খোল পেড়ে এনে ডান হাতে চাঁটি এবং বাঁ হাতে গুব্ শব তুলে বলেছিল—নেন।

খোকাঠাকুর বলেছিল—না। রেখে দাও। বাঁধা নাই। ঢ্যাব-ঢ্যা করছে। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল—গানের অপমান হয় ওতে রাখ। বলে সে গান গেয়েছিল। গানটার ক'টা কলি আজও মনে আছে

এ ফুল খুঁজে নিতে হয় এ ফুল খুঁজে নিতে হয়,
দুনিয়ার কোন বনে সে কোন কোণে সে
কোন মনেতে ফুটে রয়!
এ ফুল করতে আহরণ কত চাই নিশি জাগরণ—

আর মনে নেই। সুন্দর সুর ছিল। ভারী সুন্দর। গানটা একবার নয় দুবার গাইয়েছিল চাঁপা মাসী। তারপরও মধ্যে মধ্যে বলত—সেই গানটি গাও ঠাকুর! তারিফ করত—যেমন সোনাঠাকুর তেমনি সোনা গান!

বাড়িতে যখন তারা দুজনে শুধু থাকত তখন চাঁপা মাসী এই গান গাইত। নাচত। বলত, তুমিও গাও মাসী। এস দুজনায় নাচি। নাচের গান। একলা হয় না!

সেও গাইত—সেও নাচত। চাঁপা বলত—এ ফুল পেল্যা মালা গেঁথে পর‍্যা যমুনায় ঝাপ খাইতাম মাসী। জান?

সে প্রথম প্রথম ভাবত স্বর্গের পারিজাত। একদিন বলেছিল—পাবে কোথা? স্বগ্‌গের পারিজাত—

চাঁপা মুখ হাত নেড়ে বলেছিল—না গো মাসী না। এই পিথিমীতেই ফোটে। তার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল—প্র্যামের ফুল গো কন্থে—প্র্যামের ফুল!

প্রেমের ফুল! লজ্জা হয়েছিল মালতীর। প্রেম কি সঠিক জানত না তখন কিন্তু লজ্জা-মাখানো মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পেতে আরম্ভ করেছে। এবং এটাও জেনেছিল প্রেম হয় পুরুষে মেয়েতে। বিয়ের সঙ্গে কাছাকাছি। প্রেম হলে বিয়ে হয়, বিয়ে হলে প্রেম হয়। চাঁপার কথায় লজ্জা পেয়ে সে বলেছিল—ধের্-র।

চাঁপা বলেছিল—হঁ গ। বুঝবা পরে। বলেই গিয়েছিল—এ ফুল করতে আহরণ কত চাই নিশি জাগরণ। কন্থে, রাত জাইগা প্র্যামের কথা কইতে নিশি ভোর হইয়া যায়। ফুটবে—তোমারও ফুটবে গ। তা

সবার তো ফুটে না। বিয়া সাদী হইলেও না। ফুটলে পাগলিনী হয় বাধার মত !

কত কথাই মনে পড়ছে !

বাবার তাব অন্যায় হয়েছিল—সেই দিনই খোকাঠাকুরকে গাঁজা খাইয়েছিল। না কোন বদ মতলব করে খাওয়ায় নি। তখনও কোন বদ মতলব তার ছিল না। তার বাপ বষ্টম মানুষ, বষ্টমের ধর্ম পালন কববার মধ্যে মাংস খেতো না, চৈতন রেখেছিল, গলায় কণ্ঠি নিয়েছিল আর গাঁজা খেতো। গাঁজা ধরণী জেঠাও খেতো। এখনও নিশ্চয় খায়। সেদিন খোকাঠাকুর যখন গান গাইছিল তখনই সে গাঁজা টিপছিল। খাওয়াব সময় তখন তার। খোকাঠাকুব গান শেষ করবার পর উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীমন্তের গাঁজার সরঞ্জামপত্র দেখে বলেছিল—বাঃ এ তো তোমার অনেক তরিবত হে! চন্দনের গন্ধ উঠেছে !

—তরিবত না করলে খেয়ে সুখ হয় ঠাকুব ?

তাব বাবা তখন শ্বেতচন্দনের কাঠটা থেকে ধারালো ছুরি দিয়ে হালকা হাতে চেঁচে তার গুঁড়ো বের করছিল মেশাবে বলে।

খোকাঠাকুর বলেছিল—তা বটে। তা নইলে শিব খাবে ক্যানে ? এঁ্যা !

শ্রীমন্ত বলেছিল—তুমি খাও না ঠাকুব ? শিবঠাকুবের পাণ্ডা তুমি !

—উঁহুঁ ! গলা খারাপ হয়ে যাবে !

—গলা খারাপ হবে ? কে বললে তোমাকে ? অত বড় ওস্তাদ শরৎ মুখুজ্জে—বাবা, গাঁজা না খেলে গলাই খোলে না ! বলে ধ্যান আসবে কিসে ? ধ্যান না হলে গান হয় ?

—তা বটে। ধ্যান না হলে গান হয় না।

—দেখ না খেয়ে !

—উঁহু মাথা ঘুববে। সিদ্ধি খাই। তাতেই যে নেশা !

—সিদ্ধির নেশা পাজী নেশা। চিতিসাপের বিষ ! ও খেও না !

—সত্যি শরৎ ওস্তাদ খায় ?

—এই গাঁজার কলকে ছুঁয়ে বলছি ; ভুবনেশ্বরের দিব্যি !

—শরৎ ওস্তাদের কাছে একদিন নিয়ে যাবে আমাকে ?

—যেতে হবে ক্যানে—বল তুমি আমি নিয়ে আসছি তোমার বাড়িতে

গোটা পনের টাকা দিয়ো গাঁজা দিয়ো। ভাল করে খাইয়ো। মুখুজ্জে মশায় তাতেই খুশী!

—যদি মাসে ছু দিন করে গান শিখি? তবে কত নেবে?

—জিজ্ঞাসা করব। তবে তোমার মত শিষ্য পেলে তো আহ্লাদ করে শেখাবে গো! তোমার বাবার সঙ্গে ভাল পোট্ ছিল। গাঁজা মদ ছুজনে অনেক খেয়েছে, আনন্দ করেছে! বলব?

—বলো!

—বলব। এই কালই বলব। সাঁইতের ওদিকে অনেক শিষ্য তো! পেরায়ই দেখা হয়। আমার হাতের গাঁজা খেতে খুব পছন্দ! বলে—এমন তাবটি কারুর টেপাতে আসে না শ্রীমন্ত।

তখন টিকের আগুনটি আলগোছে হাতে তুলে কলকের ওপর চড়িয়েছে তার বাবা। চড়িয়ে কলকেটি এগিয়ে বললে—দাও পেসাদ করে দাও। মনে মনে বাবা ভুবনেশ্বরকে ডেকে বল—খাও বাবা। তার পরেতে দাও আমার হাতে দাও, আমি ছেঁদে ধরি, ধরতে ঠিক পারবে না। আস্তে আস্তে ফুস ফুস করে টান, উড়িয়ে দাও। হ্যাঁ আস্তে আস্তে। এইবার জোরে জোরে ওড়াও। লাও এইবার একটান দম লাও! ফেলো না ফেলো না। ধরে রাখ। তা বেশ পড়ে গেল, ভাল হল—পেরথম দিন কম নেশা হবে।

কম নয়, ওতেই বেশ নেশা হয়েছিল খোকাঠাকুরের। বাবা যখন টেনে যাচ্ছিল তখন খোকাঠাকুর বসেই ছিল—ভাম হয়ে বসে ছিল। একটি কথা বলেনি। মনে আছে মালতী একটু দূরে বসে অবাক হয়ে দেখছিল। এইটুকু ছেলে—! ঠাকুরের মুখখানা দেখতে দেখতে কেমন বোকা বোকা হয়ে যাচ্ছিল। চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল।

তার বাবা টানা শেষ করে কলকেটা ঠাকুরের দিকে বাড়িয়ে ধোঁয়া গিলে দম ধরে বসেছিল—কথা বলবার জো ছিল না—বলতে গেলেও ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ঠাকুরের সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। তার বাবা বাঁ হাতে ঠেলা দিয়েছিল। ঠাকুর এতক্ষণে বলেছিল—উঁ?

বাবা হুস্ করে ধোঁয়া আকাশের দিকে ছুড়ে শেষ করে বলেছিল—লাও, আর এক দম!

ঠাকুর জড়ানো গলায় বলেছিল—না। তারপর কথাবার্তা নেই সটান হাত ছড়িয়ে পা ছড়িয়ে সেই দাওয়ার উপর শুয়ে পড়েছিল।

—এই দেখ। শুলে যে!

ঠাকুর কি বলতে গিয়েছিল কিন্তু পারে নি, কোঁক কোঁক শব্দ করে হেঁচকি তুলতে শুরু করেছিল। তারপর বলেছিল—জল খাব।

চাঁপা গ্লাসে করে জল এনেছিল তাড়াতাড়ি। এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়েছিল ঠাকুর। তার বাবা একটা ঘটিতে জল এনে মাথায় দিয়েছিল থপথপ করে, মুখ চোখেও বুলিয়ে দিয়েছিল।

চাঁপা বলেছিল—কর কি? শীতের দিন—

হেসে শ্রীমন্ত বলেছিল—কিচ্ছু হবে না। ঠাকুর এখন ডুব সাঁতার কেটে ভুবনদীঘি পেরিয়ে যাবে।

ঠাকুর সত্যিই বলেছিল— আরও খানিকটা মাথায় দাও।

সেদিন তার বাবা ঠাকুরকে সঙ্গে করে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। আশ্চর্য, পরদিন ঠাকুর নিজেই এসেছিল তাদের বাড়ি।—শ্রীমন্ত!

চাঁপা হেসে উঠেছিল। তার খিলখিল হাসি আর থামে না। মালতী জিজ্ঞাসা করেছিল—হাসছ ক্যানে? তার রাগ হচ্ছিল।

চাঁপা বলেছিল—মাসী মাছটা কাতলা গ।

—মাছ?

—ওই ঠাকুর। চার খাইতে আসছে। গাঁজা—গাঁজা।

ঠাকুব ঘরে ঢুকে বলেছিল—কই শ্রীমন্ত?

চাঁপার হাসি বেড়ে গিয়েছিল। মালতী বলেছিল—বাবা তো সাঁইতে গিয়েছে।

—অ। ফেরে নি?

—না ফিরুক—তুমি বইস! আমি তোমারে খাওয়াব গ। বলে ঘরে গিয়ে একটা পুরিয়া এনে ঠাকুরকে দিয়ে বলেছিল—গুঁড়া কইরা বিড়ির ভিতর দিয়া খাও। বিড়িটা খুলে ফেলাও। হ্যাঁ।

বিড়ি খেয়ে ঠাকুর বলেছিল—এ ভাল। হ্যাঙ্গামা নাই। আর কালকের মত মাথা ঘোরে না। না একটু একটু ঘুরছে।

তারপর চুপ করে গিয়েছিল। ওদিকে চাঁপা খিলখিল করে হেসেই চলেছিল। একটু পর ঠাকুরও হাসতে লেগেছিল। তাদের সঙ্গে মালতীও হাসতে সুরু করেছিল। কিছুক্ষণ পর মাসী তাকে বাতাসা জল খাইয়ে গান গাইতে বলেছিল—ঠাকুর গেয়েছিল একখানা নয়, তিন চারখানা। মাসী

তার আগে দোর বন্ধ করেছিল। নইলে গান—এমন সুন্দর গান শুনে পড়শীরা তো না-এসে থাকবে না।

এরপর তার বাবা জুটিয়ে দিয়েছিল ওস্তাদ শরৎ মুখুজ্জেকে। শরৎ মুখুজ্জে খুব খুশী হয়েছিল ঠাকুরের গলা শুনে। বলেছিল—খুব বড় ওস্তাদ হবে হে তুমি!

মুখুজ্জের আসর পড়েছিল নবুঠাকুরের বাড়িতে। মাসে দু'দিন আসতেন, থাকতেন তিন চার দিন করে। খোকাঠাকুরের বাড়িতে ছোট ছোট ভোজ হত। ঠাকুরের পিসী চীৎকার করত। কিন্তু নবু বলত—চেঁচাবে তো যেখানে যাবে যাও। এ বাড়িতে চেঁচিয়ো না। আমার গুরু।

পিসী বলত—আসবে কোত্থেকে রে? ওরে ও হারামজাদা! পুঁজি তো পাঁচ বিঘে জমি আর দে পুকুরের বারো আনা অংশ। বাবার থানে বছরে ষোল দিন পালি!

ঠাকুর বলত—আকাশ থেকে আসবে, মাটি ফুঁড়ে আসবে—তোমাকে ভাবতে হবে না।

আসত তাই। নবু ধার করে আনত। দিত তার বাবা।

এই টাকা দিতে গিয়েই মালতী এক দিন নয় দু'তিন দিন পিসী ভাইপোর ঝগড়া শুনে এসেছিল। ঠাকুর তখন বিকেলে তাদের বাড়িতেই একবাব নয়, মুখুজ্জের সঙ্গে সকাল বিকেল রাত্রি তিনবার চারবার গাঁজা খাচ্ছে। বিকেলে আসরটা তাদের বাড়িতেই বসত। মুখুজ্জে আসতেন, খোকাঠাকুর আসত, মুখুজ্জে মশায়ের দুজন তিনজন শিষ্য আসত। গাঁজা খেতেন।

মুখুজ্জে মশায়ই মালাকে ইস্কুলে দিতে বলেছিলেন শ্রীমন্তকে। বলেছিলেন—হ্যাঁরে বাবা শ্রীমন্ত, মেয়ের বয়স কত হল রে?

—আট বছর হবে মুখুজ্জে মশায়।

—ছেলেবয়সে বিয়ে দিবি নাকি?

—না না না। সে কাল আছে না কি?

—তবে? ইস্কুলে দিস না কেন রে? এ্যাঁ! মেয়েরা হাকিম হচ্ছে রে। ভোটে দাঁড়াচ্ছে। জুতো পায়ে দিচ্ছে। স্বাধীন দেশ! ইস্কুলে দিস। না হয় গলা থাকে তো গান শেখা। রেডিয়োতে গ্রামোফোনে গান গাইবে রে।

শ্রীমন্ত বলেছিল—গলা টলা নাই। তা বলেছেন ভাল। ইস্কুলেই দোব।

—হ্যাঁ। দিয়ে দিস। দিদিমণিতেই তো পড়ায়? না কি?

—হ্যাঁ তিনজন দিদিমণি আছে।

—তা হলে তো ভাল রে। দে ভরতি করে দে। তুই একটু দেখিয়ে দিস প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ—তার পর ও ঠিক পড়বে। এখানে পাস করলে দিবি সাঁইতেতে। ওও দিদিমণি হয়ে যাবে। তোর বাবা ছিল অবধূত ভিক্ষে করত। তুই খানসামাগিরি আরম্ভ করেছিলি, এখন দোকানদার হয়েছিস। তোর মেয়ে তো আর তেলক কেটে চূড়ো বেঁধে খঞ্জনি বাজিয়ে গান করে বেড়াবে না! ও দিদিমণি হবে! আমার ছেলেটাকে দেখ না ইস্কুলে দিয়েছি—বলেছি গান শিখিস তো রেডিয়ো গ্রামোফোনের গান শেখ। তা শিখেছে। আবার পড়ছেও। আবার হিন্দু মহাসভা করে। গান গাইতে পারে তো! ওপ্‌নিং সং গায়।

শ্রীমন্ত বলেছিল—ছেলে আপনার খুব মুখোল চোখোল!

—হ্যাঁ রে। নইলে লীডার হবে কি করে? পড়েও মন্দ নয়। তা তোর মেয়ে তো খুব চটপটে। মুখ চোখও বেশ ভাল রংও মাজা মাজা। চুলও এক পিঠ—বেশ দিদিমণি হবে রে! তা দিদিমণিগুলো দেখতে কেমন রে?

—কালোকালোই বটে তবে সেজেগুজে থাকে তো! নে নে সেজে ফেল্। ও—নবু সাজছ। নাও নাও। দেরী হয়ে যাচ্ছে। নাও। সুয্যি ডুবব ডুবব করছে। বলেই হুঁ-হুঁ করে তান ভাঁজতে শুরু করেছিলেন।

এরপর থেকেই সে ইস্কুলে যেতে শুরু করেছিল। প্রথম ভাগ পড়া ছিল। কিন্তু প্রথম ভাগের ক্লাস থেকেই শুরু করেছিল। সকালবেলা ওই পালান হুড়কো গরুটাকে খুঁজে দড়ি দিয়ে বেঁধে বাড়িতে এনে দিয়ে শ্লেট বই বগলে ইস্কুলে যেত।

ইস্কুলটা ছিল নবুঠাকুরদের বাড়ির সামনে। একটা পুকুরের এপাড় আর ওপাড়। নবুঠাকুর সকালবেলা থেকেই তানপুরোতে গ্যাঁও-গ্যাঁও সুর তুলে কেবলই করত আ-আ-আ। আ-আ-আ। আ-আ-আ! আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ—। চড়িয়ে চড়িয়ে যেত। আবার নামাতো—আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ।

আর ওপাড়ে পুকুরের ঘাটে বসে ঠাকুরের পিসী কোন দিন নেকনকে গাল দিত। কোনদিন মরা ভাই ঠাকুরের বাপের জন্য কাঁদত। ঠাকুর

ওকে ভেন্ন করে দিয়েছিল। পিসী দে বাবুদের বাড়ি ভাতরান্নার কাজ নিয়েছিল।

মেয়েরা ঠাকুরকে ভেঙাতো—এ্যা—এ্যা—এ্যা। দে বাবুদের মেয়ে সে আবার বলত—ব্যা—ব্যা—ব্যা। ছাগল ডাক! ঘণ্টা পড়ত—ওরা ইস্কুলে ঢুকত। ওদের ক্লাসে আট দশটা মেয়ে একসঙ্গে শুরু করত—ঐ কয়ে য-ফলা ঐক্য—ঐ কয়ে য-ফলা ঐক্য। অন্য ক্লাসে একসঙ্গে মেয়েরা পড়ত—হুগলী জেলায় মহম্মদ মহসীন নামে এক মহাত্মা মুসলমান ছিলেন। হুগলী জেলায়—।

কোন ক্লাসে দিদিমণি বলতেন—এক লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশো পঁচিশ। লেখ এক লক্ষ পাঁচ হাজার—।

এর মধ্যে ঠাকুরের গলা মধ্যে মধ্যে শোনা যেত—মধ্যে মধ্যে শোনা যেত না। টিফিনের ঘণ্টা বাজলেই মেয়েরা সব বেরিয়ে এসে নামত পুকুর ঘাটে। পরিষ্কার ন্যাকড়ায় বাঁধা মুড়ি কারুর মুড়কি জলে ডুবিয়ে নিয়ে বারান্দায় বসে খাবে। ওপাড়ে তখন বিপন জেলেরা বাপ বেটা বসে তামাক খেতো আর জাল ফেলবার জন্যে হাতের উপর জাল সাজাতো। ঠাকুর দাঁড়িয়ে থাকত। মাছ ধরবে। ওস্তাদ আছেন শিষ্য আছেন—মাছ চাই। বড় মাছ শেষ হয়েছে—এখন চুনো মাছে দাঁড়িয়েছে। পুকুরটা ঠাকুরের। জেলেদের কাছে ভাগে দেওয়া ছিল। ঔই বিপনের কাছে। মাছ ধরিয়ে ঠাকুর চান করত এই পুকুরেই। সময় ঠিক বাঁধা ছিল। ওদের ছুটি হত দশটায়। ঘণ্টা বাজলে মেয়েরা কলরব করে বের হত—তখন পুকুরে একগলা জলে দাঁড়িয়ে ঠাকুর সেই তান ছাড়ত—আ-আ-আ!

মেয়েরা হেসে সারা হত। সেও হাসত। একগলা জলে দাঁড়িয়ে—!

মালতীর মায়া লাগত। বেশ তো নিজেই গাইছ ঠাকুর। কি সুন্দর গলা! কি সুন্দর গান!—এ ফুল খুঁজে নিতে হয়! সে সব ছেড়ে গলাটাকে ইচ্ছে করে মোটা করে কি যে আ-আ-আ করছে ঠাকুর! শরৎ মুখুজ্জে ওস্তাদ না মাথা। বলবার জো নাই। ওর বাবা শ্রীমন্ত এই বয়েসে মুখুজ্জের কাছে বাজনা শিখছে।

কত দিন বলি বলি করেও বলতে পারে নি মালতী। ঠাকুর স্নান সেরে উঠে চলে যেত। ভুবনেশ্বরতলা যাবে। পাণ্ডাগিরি আছে। সিঁদুরের কৌটা পরবে, আজকাল আবার বাবার রুদ্রাক্ষমালাটা গলায় ঝুলাচ্ছে।

কত দিন হাত মুখ ধোবার অছিলা করে সে এপাড়ের ঘাটে নেমেছে।

জল তুলিয়েছে হাত দিয়ে পা দিয়ে। কিন্তু ঠাকুর আপন মনেই হয় আ-আ করত, না হয় স্নান সেরে জয় শিব শঙ্কর, জয় ভুবনেশ্বর, হর হর হর ব্যোম বলতে বলতে উঠে চলে যেত।

এই পুকুরটা।

এরই কথা বলছে ধরণী জেঠা। এইটেই নিয়েছিল তার বাবা ঠাকুরের কাছে। এই পুকুর থেকেই—।

হঠাৎ একটা উচ্চরোলের হাসি হাটের সব গোলমাল ঢেকে দিয়ে সব মানুষের চুল ধরে ঝাঁকি দিয়ে টানলে—বললে—ফিরে তাকাও!

কি হল?

একটা জায়গায় লোকজন ভয়ে যেন পালাতে চাচ্ছে? মেয়েরা চেঁচাচ্ছে —ই বাবারে! ও মারে! ই—! ই! ই!

পুরুষেরা ধমক মারছে—এই—এই!

কতকগুলো সাঁওতাল মেয়ে হাততালি দিয়ে হি-হি করে হাসছে। দূরে পুরুষেরা হো-হো শব্দে হাসছে।

কি হল?

হঠাৎ ওই জনতার মধ্য থেকে একটা মুখ-পোড়া বীর হনুমান লাফ দিয়ে উঠে একজনের ঘাড়ে চড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে উপ শব্দ করে আবার লাফ দিল। এবার মাটিতে। হনুমানটার এক হাতে একটা লাউ। সেখান থেকে লাফ দিয়ে হাট পার হয়ে উঠল গিয়ে সরকারদের কাঠের কারখানার চালে—সেখান থেকে কাছের বটগাছটায়।

একজন রসিক হেঁকে উঠল—জয় রাম!

(খ)

ধরণী দাস বললে—বড় উপদ্রব করছে বেটারা! একটা সন্ন্যেসীর দলের বাসা হয়েছে ওই পল্টনবাগানে। পল্টনবাগান ওই অশথ বট বেলগাছের আধা জঙ্গলটা। যেখানে শিবের ভূতবাহিনী থাকত। সেটেলমেণ্টে বলে এই রাস্তাটা ছিল মুরশিদাবাদ থেকে নবাবী সড়ক। এ পথে পল্টন চলত। বর্গী হাঙ্গামার সময় এখানে ছাউনি পড়েছিল।

গাছগুলো তখনকার। পল্টন থেকেই বট অশথের ডাল পুঁতেছিল। বেড়া দিয়েছিল।

মালতী বললে—মস্ত বড় হনুমান।

—সব পুরুষ। বললাম তো সন্ন্যেসীর দল। সেদিন তাড়া খেয়ে একটা আমার চালায় ঢুকে সব তছনছ ক'রে দিয়েছে!

খদ্দের একটি ছিল—সে তাঁতের শাড়ি দেখছিল। যারা মশারি কিনতে এসেছিল তারা কখন চলে গেছে মালতীর খেয়াল হয়নি। সে সেই সব পুরানো কথাই ভাবছিল। খদ্দেরটি বললে—আর কিছু কম করেন।

—আর কম হয়? তৈরী খরচ উঠবে না! আর হবে না। ওই টাকাই লাগবে। আনা পয়সা ছেড়ে দিলাম। যান। বাজারে দোকানে গেলে সাড়ে বারোর কম পান তো আমার কাছে আসবেন আমি অমনি দোব। বলছেন মেয়েকে দেবেন। যান, নিয়ে যান। আমরাও কন্যের পিতা।

—দেন।

লোকটি টাকা দিয়ে কাপড়খানা নিয়ে চলে গেল। হাটের হাসি থেমে গেছে—আবার সব যেন জমাট বেঁধে গেছে মাটিতে পড়া মিষ্টির উপর পিঁপড়ের চাপের মত। না। বড় বুনো মৌমাছির চাকে চাপবাঁধা মৌমাছির মত। ভন-ভন-ভন-ভন শব্দ উঠছে। মৌমাছিগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়ে সরছে নড়ছে চলছে। মধ্যে মধ্যে একটা দুটো যেমন পাখার শব্দ ক'রে ওড়ে তেমনিভাবে চেঁচাচ্ছে, কমল, আলুর দর কমল! কেউ একটা হাতঘণ্টা নেড়ে দিচ্ছে। একজন ফিরিওলা চোঙা মুখে লাগিয়ে হাঁকছে। একজন ও শাঁখের মত কি বাজাচ্ছে।

কারা সার্কাসের ঢাকের মত ড্রাম বাজিয়ে ঢুকছে—টেরা টাম—টেরা টাম—টেরে—টেরে—টেরে—। সঙ্গে একটা বাখারির মাথায় একটা চৌকো বোর্ডে রঙীন ছবি। একজনের পরনে পাজামা—একটা ছিটের কামিজ—উস্কোখুস্কো চুল—সে একটা চোঙা মুখে তুলে বলতে লাগল—ভুবনপুর টকী—। নতুন ছবি। নতুন ছবি! প্রেমের পিদিম। প্রেমের পিদিম। শ্রেষ্ঠাংশে সুনেত্রা বরুণ। আর দু'দিন মাত্র। একজন কাগজ বিলুচ্ছে।

খদ্দেরের দেওয়া নোটটা মুড়ে গেঁজলেতে পুরতে পুরতে ধরণী বললে—

ব্যবসা আর করা নয় মা। এ আর চলবে না। বুঝে! চুরিচামারি না কবতে পারলে খদ্দেরের গলা কাটতে না পারলে লোকসান। এই তো বিক্রি করলাম চল্লিশ টাকার ওপর—চারটে টাকাও থাকবে না। তাঁত নিয়ে বসে আছি। স্থতো নাই। আছে স্থতো—বেলাকের দাম দিতে হবে। ইদিকে বাজারে আগুন লেগেছে। গবরমেণ্টাব ঠুঁটো হয়ে বসে আছে। কবছে অনেক। বাস্তা ঘাট হাসপাতাল ইস্কুল—

ধবণীব কথায় বাধা দিয়ে মালতী বললে—পাণ্ডাদের চলতি এখন কেমন জেঠা?

—ওদেব ভাল মা। ভাল চলছে। এই তো দু'তিন বছরের মধ্যে কজনাই ঘবে টিন দিলে! লোকের হাতে নগদ পয়সা আসছে যাচ্ছে তো বেশী। মানত ঢেলা বাঁধা এসব বেড়েছে। গিয়েছিলে বাবার থানে?

—না।

—গেলেই দেখতে পাবে। দে মশায়রা পাকা চত্বর করেছিল বাবার—তাব চাবিদিকে সব নাম নিকে নিকে মার্বেলের ট্যাবলেট বসিয়েছে! শুনছি ওই মিলওলা মাড়োযাবী নাকি এবার লাভ করেছে খুব, এসে মানত করেছিল। সে বাবার থানের চারিপাশে গোলথাম করে তার ওপর গম্বুজ কববে। ঢেলা বাঁধা তো রাশি রাশি! দেখে এস ক্যানে নিজের চোখে!

মালতীব মনে পড়ল তারও বাঁধা একটা ঢেলা আছে। সেও বেঁধেছিল। খুব ছেলেবয়সে একদিন বাঁধতে গিয়ে লজ্জা করে বাঁধে নি। পবে বেঁধেছিল। বব কামনা কবেই বেঁধেছিল। কিন্তু খোকাঠাকুব নয়। খোকাঠাকুব তখন দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ। বেঁধেছিল বসন্ত—শরৎ মুখুজ্জের, ওস্তাদের ছেলের জন্যে। তার বয়স তখন এগারো। বসন্তের বয়স পনের ষোল। বসন্ত সেবার ভোটাভুটির সময় এই ভুবনপুরে আদি চাটুজ্জেকে ভোট দাও করে বেড়াত। আদি চাটুজ্জে হিন্দু মহাসভার লোক। বসন্ত গান গাইত—

দ্রৌপদী কাঁদে দুঃশাসনেরা রজস্বলার টানে বসন—

পাণ্ডব নত মস্তকে বসি—জাগো নর নারায়ণ!

তাবপব বক্তৃতা করত। বলত—কংগ্রেস জুয়ো খেলতে গিয়ে আজ হাত পা বাঁধা দাসে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানে মেয়েদের ইজ্জত যাচ্ছে—চীৎকার করে কাঁদছে তারা। দাসেরা কিছু বলবে না। বলবার ক্ষমতা

নাই। দাস। ক্লীব। এখন মানুষকে উঠে দাঁড়াতে হবে। নরের বুকে নারায়ণের বাস। ঘুমুচ্ছেন তিনি। তিনি জাগুন।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত শুনে।

বসন্ত থাকত ভুবনপুরে। ওই খোকাঠাকুরের বাড়িতে আড্ডা করেছিল। গ্রামের কতকগুলো ছেলে জুটিয়েছিল। শরৎ মুখুজ্জের শিষ্যরা প্রায় সবাই তার কথায় সায় দিত। শরৎ ওস্তাদ নিজে বলে দিয়েছিলেন। বসন্ত মাইনে পেত আদি চাটুজ্জের কাছে, শরৎ ওস্তাদ বাড়িটার জন্য ভাড়া নিত। খোকাঠাকুরের বাড়িটা তখন শরৎ ওস্তাদ দখল করতেন। বলতেন—নবু আমাকে দিয়ে গিয়েছে।

খোকাঠাকুরের পিসী তার এক বছর আগে মারা গেছে। নবুঠাকুর কেঁতুলীর মেলায় গিয়েছিল। সেই মেলা থেকে আর ফেরে নি। সঙ্গে শরৎ ওস্তাদ তার বাবা শ্রীমন্ত ধরণী জেঠা এরাও গিয়ে ছিল। ফিরে এসে বলেছিল—বাউলদের সঙ্গে সে চলে গিয়েছে। যাবার সময় দেনার দায়ে শ্রীমন্তকে পুকুর আর জমি বিক্রি করে গিয়েছে। বাড়িটা শরৎ ওস্তাদকে দিয়ে গিয়েছে। আর ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগিরির পালা ছেড়ে দিয়েছে শরিকদের। পাণ্ডাগিরির দান বিক্রি চলে কেবল পাণ্ডাদের মধ্যে। সে বাউল হয়ে গিয়েছে—তার জাতও গিয়েছে; বিক্রি কবতে দান করতে চাইলেও নাকি তা হত না।

খোকাঠাকুরের জন্যে কাঁদে নি কেউ। ছিলই না কেউ। জ্ঞাতিরা খুশী হয়েছিল, পালা বেড়েছিল তাদের। শরৎ ওস্তাদও না। বলেছিল, তাদের বাড়িতেই বলেছিল—ওর ওই নিয়তি। বুঝলি শ্রীমন্ত। প্রথম যখন আমার কাছে ন্যাড়া বাঁধে, শিষ্য হয় তখন ওর গলা শুনে আর দু একখানা গান শুনে ভেবেছিলাম খাঁটি মাল হবে। কিন্তু তার পরে দিন যত গেল তত দেখলাম বাজে ভুসি মাল। তিন চার বছর ওর সারগমই হল না। ধ্রুপদ ধামার ওর হবে না। কোন কালে হবে না।

চাঁপা মাসী শুধু দুঃখ পেয়েছিল। চোখ দিয়ে তার জল পড়া সে দেখেছে। দুঃখ সেও পেয়েছিল। কিন্তু চাঁপা মাসীর মত- না। খোকাঠাকুরের এমন ধর্ম ধর্ম বাতিক হয়েছিল আর গাঁজা খেয়ে খেয়ে এমন বোকা বোকা চোয়াড়ে চেহারা হয়েছিল যে কেমন খারাপ লাগত।

চাঁপা মাসী সেদিন ওস্তাদকে বলেছিল—তা কইবেন না ওস্তাদ। গান সে

ভাল গাইত। আপনি আর শেখান নি। অই আপনারে আনল, সেবা করল আর আপনি ছাশের বাড়ির বড়লোক সাকরেদ পাইয়া অরে ছাখলেন না, তুচ্ছ করলেন।

শরৎ ওস্তাদ বলেছিল এই—এই—এ মেয়েটা বলে কি? ও শ্রীমন্ত, তোব পবিবার বলে কি? এ্যাঁ? তোদের মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে। ফেল হল ক্যানে? এ্যাঁ? শিখুলে শিখতে পাবার বিছে চাই। না কি? তুলো পাকিয়ে শলতেতে তেল টানে—পিদিম জ্বলে, কাপাস গাছের কাঠি কি ছাল দিয়ে শলতে করলে ধরে, না জ্বলে? মাথা নাই। যা ছিল তা।

বলতে দেয় নি চাঁপা মাসী—সে বলেছিল সিটি কইবেন না ওস্তাদ! মাথা তাব ছিল না, সিটি লয়। সি আমারে বলত—বলত—বৈরাগী বউ, ওস্তাদ আমারে শিখায় না। আমারে মনে মনে তুচ্ছু করে। গরীব বইলা তুচ্ছু কবে। মুখ্যু বলে—বোকা বলে। এখুন বড়লোক শিষ্য জুটছে তো! আপনি তাবে তুই তুই করতেন—কড়া কথা কইতেন—কথায় কথায় বলতেন গাডোল তুই একটা। আর বাবুদেব ছেল্যাদের বলতেন—বাবু আপনি। হাজার ভুল তারা করলেও কত মিঠা কথা বইলা বারবার দেখাইয়া দিতেন।

—এই—এই—এই! এ মেয়ে বলে কি? আবে বাবুদের ছেলে আর নিত্য পাণ্ডাব বেটা নবা গেঁজেল কি সমান নাকি? এ্যাঁ—

—আপনি গুরু, শিষ্য তো সবাই সমান—

—না। এ মেয়েটা ওঠালে আমাকে।

তার বাবা শ্রীমন্ত ছিল না সেখানে তখন। উঠে গিয়েছিল ঘরের মধ্যে। কেন্দুলী মেলা থেকে আতর এনেছিল গাঁজায় মেশাবে বলে, ঘর থেকে তাই আনতে গিয়েছিল—এই মুহূর্তে বাইরে এসে ধমক দিয়ে বলেছিল—মারব তোকে একথাপ্পড়। উঠে যা বলছি, এখান থেকে উঠে যা।

হেসেছিল মাসী অভ্যাসমত। কিন্তু সেদিন খিলখিল করে হাসে নি। একটু কেমন ভিজে ভিজে হেসে বলেছিল—তা মার না ক্যানে। মার খাইবার তরেই তো আমার পিঠখান্ বিধাতা গড়ন কইরাছিল। আর সইতেও পারি। তবে হক কথা কইব। তুমি তারে ঠকাইয়া পুকুর জমি লইয়া লিলে—

আরও জোরে ধমক দিয়েছিল শ্রীমন্ত।—ঠকিয়ে নিয়েছি?

—লও নাই? বুকে হাত দিয়া কও!

এবার চুলের মুঠো ধরেছিল শ্রীমন্ত। টাকা দিই নি তাকে দফায় দফায়? পাঁচ দশ বিশ? হিসেব করে দলিল করে দিয়ে গেছে সে। তোর যে টান খুব দেখি!

ওস্তাদ বলেছিল—এই এই। ছাড়, ছাড় শ্রীমন্ত। মেয়েদের চুল ধরতে নেই ধরতে নেই। ছাড়। বলছে ও বলুক—বলতে দে। তুই এত চটছিস ক্যানে, তোর তো দলিল আছে। সে তো লিখে দিয়েছে।

মালতী সেদিন দাওয়ার একপাশে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল সারাক্ষণ।

শ্রীমন্ত ছেড়ে দিয়েছিল চাঁপার চুলের মুঠো।

চাঁপা কিন্তু তবু চুপ করেনি। সে বলেছিল—দলিল কইরা দিছে।

তোমার হাতে দলিল রইছে—সেটার কথা আমি কই নাই। হিসাবের কথা কইছি। সে তো হিসাব রাখে নাই।

—আবার!

চাঁপা তখনও বলেছিল—আর ওস্তাদ গুরু বেরাহ্মণ। গুরুর কাছে আপন পোলা আর শিষ্যে তফাৎ নাই। আপনকার পোলা আইসা তার ঘরে বইসা তারে কি মারটা মারল। গালে পাঁচ পাঁচটা আংগুলের দাগ দড়ার মত হইয়া উঠল। কিছু কইলেন না আপনি?

—এই। আরে কি বলব? তাতে আমি কি বলব? বসন্ত ইস্কুলে সেকেন ক্লাসে পড়ে। ভাল ছেলে। তার সঙ্গে মুখ্য্যু পাণ্ডার ছেলে তক্ক লাগিয়ে দিলে। সে দিন ভূমিকম্প হয়েছিল রাত্রে—তা সকালে বসন্ত বলেছিল ঋষি ছুতোরকে ভূমিকম্প কি করে হয়। মুখ্যুর ডিম অজ মুখ্যু—গাঁজা সাজছিল—একেবারে বিজ্ঞ পণ্ডিতের মত মাথা নেড়ে বললে—কিচ্ছু জান না তুমি! ভূমিকম্প হয় বাসুকী মাথা নাড়লে। বাসুকী নাগ হাজার ফণার উপর পৃথিবীকে ধরে রাখে তো, তা মধ্যে মধ্যে এ-ফণা থেকে যখন ও-ফণায় নেয় তখন ভূমিকম্প হয়—আর যখন পাপ বেশী হয় তখন মাথা নাড়ে। তখনই ঘর দোর ভাঙে। মানুষ মরে। এই তর্ক। তা গাঁজাল তো। বসন্ত বলেছিল গাঁজাখোরের আর কত বুদ্ধি হবে! তা বেটা বলে কি—তোমার বাবাও তো—মানে আমি—আরে বেটা আমি তোর গুরু, বলে তোমার বাবাও তো গাঁজা খায়। এই বসন্ত বসিয়ে দিয়েছিল চড়। দেবে না!

চাঁপা মাসী বলেছিল—আপনি কথাটা সত্য কইলেন না ওস্তাদ! তারে আপনার পোলা শুধু গাঁজাল কয় নাই, কইছিল গাঁজালের ব্যাটা গাঁজাল তোব বুদ্ধি আর কত! তখুন সে কইছিল—তোমার বাপও তো গাঁজা খায়! তা ঢিল মারলে ত' পাটকেলটি খাইতেই হবে!

—হবে? খাইতেই হবে? বাঙাল কিনা! আরে বসন্তের বাবা তোর গুরু, তোর বাবা তো বসন্তের গুরু নয়! বসন্ত বলতে পারে। কিন্তু ও বলে কি করে?

কথাটা ওইখানেই চাপা পড়েছিল বিপন জেলে আসায় সেদিন। বিপনের সঙ্গে এসেছিল সুরেন সাহা। বিপন এসে বলেছিল—দাসজী, আমি যে এলাম আপনকার কাছে। শুনলাম আপনাকে ঠাকুরমশায় পুকুর লিখে দিয়ে গিয়েছে দেনার দায়ে। তা আমার যে ভাগে মাছ ফেলা আছে।

শ্রীমন্ত বলেছিল—হ্যাঁ। পুকুর আমি কিনেছি বিপন।

—দলিলটা একবাব—

—তা দেখ না। তা দেখ না। আমি সাক্ষী! সই করেছি। তা দেখা রে শ্রীমন্ত—দেখিয়ে দে, দেখিয়ে দে দলিল। ইস্ট্যাম্পেব ওপর। দেখা! কে দেখবে? অ সুবেন। এস। এস দেখ!

তার বাপ দলিল বেব কবে এনে দেখিয়েছিল।

মালতী এবাব এগিয়ে এসে উঁকি মেবে দলিলটা দেখেছিল। দেখেছিল খোকাঠাকুরের সইটা। লেখাটা তাবই মতই বাঁকা বাঁকা গোটা গোটা।

তার বাবা পরের দিনই পুকুরেব মাছ ধরিয়ে বিপনেব ভাগ দিয়ে পুকুর নিজস্ব করেছিল।

(গ)

মালতীর কপাল কুঁচকে উঠল। মনে পড়ল একটু আগে ধরণী জ্যাঠা বলেছে সে তার বাবাকে বলেছিল সব বেচে মানুষ খায় শ্রীমন্ত, ধম্ম বেচে খায় না। বামুনের ছেলের পুকুরটা জমিটা নিয়ে তুই ভাল করলি না!

ওই পুকুর নিয়েই তাদের সর্বনাশ হয়েছে, তাকে খুনের দায়ে পড়তে

হয়েছে এটা সত্যি। কিন্তু অধর্ম কোথায় করেছে তার বাপ! দলিলের সইটা তো এখনও সে চোখে দেখতে পাচ্ছে!

মালতী ভুবনেশ্বরের উঁচু আটনটার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ধরণীর দিকে তাকালে। ধরণী জ্যাঠা চশমা চোখে খাতা নিয়ে বোধ হয় আজকের হিসেব টুকছে। তাকে ভুবনেশ্বরের আটনেব দিকে তাকিয়ে চিন্তামগ্ন দেখে আব কথা বলেনি। আপন কাজ করছে। বেলা পড়ে এসেছে। সূর্যের আলো ভুবনেশ্ববের পশ্চিমে বট অশত্থ বেলগাছের মাথার উপরে উঠেছে। হাটে এর মধ্যেই কখন ধবধবে জামা-কাপড়পরা বাবুদের আমদানি হয়েছে। একদল কিশোরী মেয়ে—সকলেই শহরেব মেয়ের মত ঝকঝকে—তারা এসে ঘুরছে। মিল থেকে এসেছে সাঁওতাল মেয়েরা। এরা আর আগেকাব সাঁওতাল নয়। মেঝেনরা সব জামা পরেছে, রঙীন শাড়ী পরেছে। চোখেব দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে একটুক্ষণ আগেব হাট ক্ষণে ক্ষণে পালটে পালটে অনেক পালটে গেছে। কিন্তু শব্দ সেই এক! সেই একটা বড় বুনো মৌমাছির চাকের চারিপাশে যে গুন-গুন ভন-ভন শব্দ ওঠে সেই শব্দ!

ইস্কুল আপিস সব বন্ধ হয়ে গেছে। চারটে বেজে গেছে হয়তো আধঘণ্টার উপর। ইস্কুলের ছেলেরা, ইস্কুলের মেয়েরা, মাস্টারেরা, আপিসের বাবুরা এসেছে হাটে। চেহারা পালটেছে হাটের।

মুরগীওয়ালারা জোরে হাঁকছে—মুবগী' ডিম হাঁসের ডিম হাঁসের ডিম —মুরগী ভাল মুরগী!'

কারওয়ালাগুলো উৎসাহিত হয়ে উঠেছে ইস্কুলের মেয়েদের দেখে। তারাও সুর করে জোর গলায় গাইছে—চার হাত কার, চার হাত ফিতে—লম্বা লম্বা—শক্ত শক্ত। চুল বাঁধলে খুলবে না। মন বাঁধলে ছিঁড়বে না!

—ওরে শম্ভু, তেল বাতি কর আলোতে। চিমনি ভাল করে মোছ। ধরণী দাস হেঁকে বললে শম্ভুকে। শম্ভু ধরণী দাসের কাপড়ের মোট বয়ে নিয়ে আসে নিয়ে যায়। ধরণী দাস নিজের পিঠেও একটা মোট বেঁধে নেয়। সন্ধ্যের পরও হাট আজকাল চলে কিছুক্ষণ। আলো জ্বালতে হয়। তরকারির ফড়েরা কেউ লম্প জ্বালে, কেউ হ্যারিকেন। বিনোদিনীর দোকানে গুঁইদের দোকানে জ্বলে হেজাক আলো।

মালতী ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করে বসল—আচ্ছা জেঠা, তুমি বললে ওই পুকুরটার কথা!

—ওইটেই তো অনর্থের মূল মা। বল বটে কিনা। ওর জন্মেই তো তোমার দণ্ড। কী করতে কী হয়ে গেল!

—তা গেল। কিন্তু বাবা তো ঠকিয়ে নেয় নি। তুমি অধম্ম বললে। বাবাকে বলেছিলে বলছ। কিন্তু আমি তো দলিল দেখেছি!

ধবণী দাস তার মুখের দিকে চাইলে মাথাটা হেঁট করে চশমার ফাঁক দিয়ে। একটুক্ষণ পর বললে—মা, দলিলের সময়ে আমি ছিলাম, আমিও কেন্দুলী গিয়েছিলাম। তা ছাড়া কত টাকা সে নিয়েছিল তাও জানতাম। টাকা তো সব শ্রীমন্তও দেয় নাই, আমার কাছ থেকে নিয়ে দিয়েছে। সব ওই ওস্তাদের জন্যে। এ তো দেখেছে—ওস্তাদ আসত, সঙ্গে কোনবার দুজন কোনবার তিনজন শিষ্য আসত। তা ছাড়া এখানকার দুজন তিনজন, দিনে না-খেলেও রাতে খেত। ওস্তাদ লুচি খেত। গাঁজা খেত বলে ক্ষীরের মত দুধ খেত। তা ছাড়া বিকেলে মিষ্টি। সে অনেক কাণ্ড। খোকাঠাকুর মানুষটা তো আধপাগল। প্রথম প্রথম খুব উৎসাহ করে করেছিল। শেষ নগদ শ তিন চার যা ছিল পুঁজি ফুরোল। পিসী গাল দিতে লাগল। পিসীকে ভেন্ন করে দিলে। ঘটি বাটি বাঁধা আরম্ভ হল প্রথম। তোমার বাবাই এনে দিত। নিজে অনেক বাসন নিয়েছে। আমাকেও দিয়েছে মা। ওদের বাড়িতে একটা বড় হাণ্ডা ছিল, বড় বড় কড়াই ছিল, সেগুলো গন্ধবেনেরা নিয়েছে। তার পরে ধার—কোন দিন পাঁচ কোন দিন সাত। কোন দিন দশ। এই করে শ তিনেক টাকা হয়েছিল। · আমি বলেছিলাম শ্রীমন্তকে—দিচ্ছিস—নিবি কি করে? আর ওই হতভাগা ছেলেটার দোষ তো কিছু নাই। ওকে বেঁধে করবি কি? শ্রীমন্ত বলেছিল, মা, এই কাপড়ের পাটে বসে বলছি—সন্ধ্যে হয়ে এল—মিথ্যে বলি তো ভগবান দেখবেন; বলেছিল—ও মরবে তো আমি কি করব বল? ও তো মরবেই। আমার বাপু পুকুরটি চাই। তা কেন্দুলীতে যখন ঠাকুর বললে আমি চললাম, বাড়ি আর যাব না। সে একবারে গিরিরঙা কাপড় বাউলদের মত পরে। তখন তোমার বাবা বললে—যাবে তো? আমার টাকা? আমার টাকা কে দেবে? কম টাকা নয়! পাঁচ ছ শো! তা ঠাকুর বললে—টাকা তো আমার নাই। তা আমার জমি আছে নিস। দিলাম

তোকে। শ্রীমন্ত বললে—জমি তো ডাঙ্গা জমি। মাপে কম। পাঁচশো ছশোর বেশী হবে টাকা—শোধ হবে ক্যানে? তোমার পুকুরটা সমেত দিতে হবে। ঠাকুর বললে—তাই দিলাম—এখন দশ বিশ টাকা আর থাকে তো দে। ভিক্ষে শিখতে সময় লাগবে তো! শ্রীমন্ত বললে—দশ টাকা দোব। কিন্তু ইস্ট্যাম্প কিনে আনি, লিখে দিতে হবে। বললে—আন। —দিলে সই করে। ওস্তাদ বললে—তোর বাড়িটা কি করবি? আমাকে দে ক্যানে? বললে—তা নিয়েন, বাস করেন। ওস্তাদ বললে—কত দাম নিবি? বললে—গুরু আপনি—আমাকে গালমন্দ যাই করুন গুরু। দাম আর আপনার কাছে নোব না। ওস্তাদ বললে—তা হলে লিখে দে! তাও লিখে দিলে।

শম্ভু হ্যারিকেন জ্বেলে এনে চালায় ঝোলানো দড়িতে টাঙিয়ে দিলে। ধরণী দাস হাত জোড় করে প্রণাম করে একখানা টিকে ধরাতে বসল—তার উপর এক কাঁকর ধুনো ফেলে দিয়ে ধূপ দেবে।

টিকে ধরাতে ধরাতে বললে—তোমার বাবার দোষ তত নাই মা যত দোষ যত দায় শরৎ ওস্তাদের। খোকাঠাকুর ওকে সেবা যত্ন ভক্তির শেষ রাখে নাই। কিন্তু ওস্তাদ তাকে এমন করত না শেষটায় যে সবার মনেই লজ্জা হত। গরু গাধা, বোকা মাথামোটা ডাকনাম ছিল—

মালতী বললে—তা জানি, চাঁপা মাসীর সঙ্গে ঠাকুরের ভারী ভাব ছিল। চাঁপা মাসীকে বলেছিল ঠাকুর।

—হ্যাঁ মা। ঠাকুরের ধ্রুপদ ধামার বড় তালের গানে ঝোঁক ছিল না। ওস্তাদের ঝোঁক ছিল বড় তালের ওপর। ওকে শেখাবেনই। আর ঠাকুরের মন অন্য দিকে। তা ছাড়া যেমন অনেক ছেলের অঙ্কে মাথা থাকে না তেমনি উদিকে মাথাও ছিল না। তার ওপর গাঁজা খেয়ে খেয়ে কেমন হয়ে গিয়েছিল ঠাকুর। বুঝেছ। ভোম হয়ে থাকত। আসল কথা মনে মনে দুঃখ হয়েছিল। সব চেয়ে দুঃখ ওস্তাদ বাবুদের ছেলেদের গান শেখাতে যেতেন ওদের বাড়ি—ওকে চাকরের মত খাটাতেন, যা তা বলতেন। অথচ দে বাবুদের ওরা হল গুরুবংশ! ভারী লেগেছিল মনে। ওস্তাদের ছেলে বসন্ত সে তো চড় মারত। তার ওপর কেন্দুলীতে গিয়ে এক কাণ্ড হল। আমরা বাসা করলাম। মেলা দেখছি। ঠাকুর হারালো। দেখ দেখ কোথা গেল, দেখ! শেষে পাওয়া গেল এক গাছতলায় এক দল্ল বাউল

বসেছে—একজন বাউল গান করছে—ঠাকুর তন্ময় হয়ে শুনছে। শরৎ ওস্তাদের ছাত্র ঋষি ছুতোর এসে খবর দিলে। ঠাকুর নইলে রান্না চাপছে না। ওকেই রাঁধতে হবে। শেষে ওস্তাদ গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে এসে যা তা গালাগাল! সে যা তা মা। ঠাকুর কিছু বললে না। রান্নাবান্নাটি করে, সবাইকে দিয়ে থুয়ে, হাত পা ধুয়ে বেরিয়ে গেল। সারারাত ফিরল না। পরদিন দশটা এগারটা পর্যন্ত না। শেষ অজয়ের ঘাট থেকে শ্রীমন্ত ধরে আনলে, তখন কাপড় গিরিরঙ করে পরেছে, কাছা দেয় নি। বলে আমি বাউল হয়েছি। আর ঘর যাব না। তোমরা ফিরে যাও। আমি ওই বুড়ো বাউলের সঙ্গে যাব। ওর কাছে গান শিখব সাধন করব। বাস্। তখন শ্রীমন্ত লিখে নিলে।

ঢং ঢং শব্দে ভুবনেশ্বরতলায় আরতি হচ্ছে। কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। হাটের সব দোকানদার ফড়ে একবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করলে।

একজন খদ্দের এসে দাঁড়াল—ভাল মশারি আছে?

—আছে। বের করলে ধরণী দাস।

—এ না। এ তো তাঁতের। ভাল, নেটের মত—

—না তা নেই। সে নেবেন তো, গুঁইদের ঘরে নাই?

—না। বললে গন্ধেশ্বরীতলায় বাজারে যান।

—হ্যাঁ, তাহলে তাই দেখুন। তবে তার চেয়ে এতে বাতাস ঢুকত ভাল। সেই আসল নেট তো পাবেন না!

ভদ্রলোক। অর্থাৎ কাপড় জামা চশমাপরা বাবুলোক। একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভেবে বললে মশারিটা ফেলে এসেছি। অন্যের মশারিতে শুতে পারি নে। দিন তাই একটু বড় দেখে দিন। কোথায় যাব গন্ধেশ্বরীতলা। দিন।

—পছন্দ করে দেখে নেন নিজে।

—আপনি দিন। ওর আবার পছন্দ! দিন। একখানা দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে বললে—যা দাম হয় নিন। বাকীটা ফেরত দিন। না গুনেই টাকাটা পকেটে ফেলে মশারিটা বগলে পুরে চলে গেল।

ধরণী দাস বললে—ভাল খদ্দের বাবুলোক। এজেণ্টো ফেজেণ্টো বটে।

মালতী ও কথার কোন জবাব না দিয়ে বললে—আচ্ছা জেঠা, ঠাকুর

লিখে দিলে যদি তবে বাসুদেব তামাকওলা পুকুর নিয়ে হাঙ্গামা লাগালে কি করবে ? ঠাকুর কি ওকেও বিক্রি করেছিল ?

—না না। সে লোক সে নয়। সে বুদ্ধিও তার ছিল না। পুকুরটা ছিল দে বাবুদের ছ'আনি তরফের। ছ'আনি তরফের বুড়ো কর্তা ঠাকুরের বাবাকে মৌখিক দান করেছিলেন। লিখে কিছু দেন নি। তখন ঠাকুরের বাবা নিত্য ঠাকুরেরও বয়স ষোল সতের বছর। বাবুদের বাড়িতে এক বড় ওস্তাদ এসেছিল। তার সঙ্গে বাজাবার গাইবাব কেউ ছিল না এখানে। নিত্যঠাকুর সাহস করে এগিয়ে গিয়ে গেয়েছিল। গাঁয়ের মান রেখেছিল। বুড়ো দে কর্তা খুশী হয়ে বলেছিলেন—কি চাও বল ! নিত্যঠাকুরের বুড়ো বাপ বলেছিল—কর্তা, আপনার অনেক পুকুব। ওইটে ওকে দেন। কর্তা বলেছিলেন—তাই দিলাম। সে তো এক কাল ছিল মা ! তখন এই ছিল। তারপব এবার জমিদারি উঠবার পর সরকারী সেটেলমেণ্ট এল। তখন দে বাবুরা খতেন দেখতে গিয়ে দেখলে পঁচিশ ছাব্বিশ সালেব সেটেলমেণ্টে পুকুর তাদের হয়ে আছে। তাবা শ্রীমন্তকে টাকা চাইলে—দে কিছু। শ্রীমন্ত গোঁয়ার—দিলে না। তখন ওই তামাকওয়ালা বাসুদেব এসে বললে আমাকে দিন বাবু—হামি লিব। দিয়ে দিলে দে বাবুবা। বাসুদেব ফৌজদারি করলে। মামলা হল। আদালত থেকে ইনজাংসন হল। মাছ ধরা বন্ধ রইল। কিন্তু তোমার বাবা অনেক যত্নে বড় বড় মাছ করেছিল। দশ সের বারো সের। সে সইতে পারলে না। বাত্রে চুবি করে ধবতে গেল জোতেনে।

(ঘ)

—যে মাছটা সে রাতে ধরেছিল সেটা বলে পনের সের ছিল। তুমি তো সঙ্গে ছিলে। নয় ?

মালতী বললে—হ্যাঁ। ক'দিনই তো ধরছিল বাবা ! গত্ত খুঁড়ে পুঁতে দিত রান্না করলে গন্ধ উঠবে বলে। আমি সঙ্গে রোজই থাকতাম। আমিই বয়ে এনেছিলাম সেদিন। মাছটা ঘাইয়ের জোরে ডাঙায় পড়লেই হাতে আমার খেঁটে থাকত তাই দিয়ে মারতাম। মাছটা মরে যেত। বয়ে আনতাম।

মনে পড়ছে মালতীব। তখন সে মস্ত মেয়ে। আদালতে বিচারের সময় তাব পনেব বছব বলেছিল ডাক্তাব। ডাক্তাব পবীক্ষা কবেছিল তার বয়স।

বেশ হাঁপালো মেয়ে ছিল সে। তখন থেকে এখন তিন বছব পব আর একটু বেড়েছে মাথায়। তাব বেশী নয়। দেহ অবশ্য অনেক ভবেছে। কিন্তু তখনও সে প্রায় যুবতী মেযে। মনে পড়ছে ভোরবেলাব সেই গরু আনা কাজটি তাব তখনও ছিল। সে গরুটা ছিল না। অন্য গাই। গাইটাব স্বভাবও সেটাব মত ছিল না। কিন্তু তাব বাবা—শুধু তাব বাবাই বা কেন তারা সবাই গাইটাকে সেই স্বভাব তৈবী কবে দিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা প্রথম প্রথম তাবাই তাকে বাড়ি থেকে বেব কবে খানিকটা দূব তাড়িয়ে দিয়ে আসত। কিন্তু প্রথম কিছুদিন সে বাড়িব পাশে পাশেই ফিবত, হাম্বা হাম্বা কবে ডাকত। তাবপব চুবি কবে খাওয়াব স্বাদ বুঝে সেও গাইটাব মত সাবাবাত্রি নির্বিবাদে এখানে ওখানে খেয়ে পেটটা জযঢাকেব মত ফুলিযে কোন গাছতলায় বসে বোমন্থন কবত। ভোব হলেই মালতী বেব হত—এক হাতে দড়ি এক হাতে পাঁচন লাঠি। গ্রামেব ছেলে ছোকবাবা লোভীব মত তাব দিকে তাকাতো। এখন সে যথেষ্ট সুন্দব হযেছে কিন্তু তখনও সুন্দব ছিল। আর সুন্দব হবাব কতগুলো নিয়ম সে শিখেছিল। শিখিয়েছিল ওস্তাদেব ছেলে বসন্ত। মাথায় তেল সে কম দিত। চুলগুলো রুখু হয়ে ফুলো ফুলো হয়ে থাকলে তেলমাখা খোঁপাবাঁধা চুল থেকে ভালো দেখায় এ তাকে বসন্ত শিখিযেছিল। বসন্তই তাকে ব্লাউস পরতে বলেছিল। গ্রামে ভদ্রলোকেব মেয়েদেব মধ্যে ব্লাউস এলেও শ্রীমন্ত বলত—ক্যানে বে? ও ক্যানে? সামিজ হলেই তো হয়! কিন্তু মালতী একা শ্রীমন্তেব কথাব অধীন নয়। শুধু তাব শিক্ষাতেই সে চলে না। তার শিক্ষা তিনজনেব কাছে। শ্রীমন্তেব কাছে—চাঁপা মাসীর কাছে —বসন্তব কাছে।

সেই ভোটের সময় বসন্ত যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে ঝাণ্ডা উড়িয়ে বেড়ায় আব জাগো নাবায়ণ বলে গান কবে, বক্তৃতা কবে তখন থেকে বসন্তেব প্রতি সে মুগ্ধ। কি বক্তৃতা সে করত! টগবগ করত রক্ত।

বসন্ত তাকে ওই গানগুলো শিখিয়েছিল। বলত—একাল কি সেকাল যে ঘরে জুজুবুড়ির মত বসে থাকবি? না তেলক কেটে চুড়ো বেঁধে খঞ্জনি

বাজিয়ে গান করে ভিখ মেগে বেড়াবি ? তুইও যা যে ওই দে বাবুদের মেয়েরাও তাই সে।

তখনও সে ইস্কুলে পড়ত ! আপার প্রাইমারি ফার্স্ট ক্লাসে। এক এক ক্লাসে দু বছর করে সে থেকে থেকে ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছিল।

সেইবার থেকেই মেয়েদের বড় ইস্কুল হবার কথা হল। বসন্ত শ্রীমন্তকে বলেছিল—শ্রীমন্ত মালতীকে ইস্কুল হলে ভর্ত্তি করে দিতে হবে। তোমার তো এই এক মেয়ে !

শ্রীমন্তও তখন বসন্তের চেলা হয়েছে। দে বাড়ির ওরা আগে সাহেবের অনুগত ছিল, তারা এখন কংগ্রেসে ঢুকি-ঢুকি করছে। চিরকালকার বেকার বাউণ্ডুলে জেলখাটা গৌরীনাথ তখন কংগ্রেসী পাণ্ডা হিসেবে চাকলার মাতব্বর হয়েছে। শ্রীমন্ত কোন কালেই কাউকে মানতে চায় না। তবু দে বাবুদের মানত বড়লোক বলে এবং এককালে ওদের ঘরে কাজ করেছে বলে। কিন্তু গৌরীনাথকে মানবে কেন ? সেই বা কিসে কম ? বসন্তের সঙ্গে তার বেশ বনেছিল। বসন্ত বেশ ভাল কথা বলে ! বাহাদুর ছেলে ! তার উপর শরৎ ওস্তাদ তার গুরু। বসন্তের কথা শুনে শ্রীমন্ত বলেছিল—তা বেশ। দোব ভর্ত্তি করে !

বষ্টুমদের চিরকালের চিহ্নের মধ্যে তার গলায় মিহি কণ্ঠি ছিল। এটা তার বাপেরও ছিল। চাঁপা মাসী তিলকও কাটত। কণ্ঠি পরে তাকে মানাতো ভালো। আয়নায় সে তা পরখ করে দেখেছিলো গলাটা কেমন লম্বা আর ন্যাড়া দেখায় ! কণ্ঠি পরলে ভালো দেখাতো।

সকালে উঠে সে যখন গরু খুঁজতে যেত তখন দে বাড়ির কটা ছোঁড়া, ক্যানেল আপিসের ক'জন ছোকরা বাবু তাকে দেখবার জন্যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকত, তখন ক্যানেল হয়েছে দেশে। কেউ দাঁতন করবার অছিলায়, কেউ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আনমনে সিগারেট টানবার অছিলায়, কেউ বা পায়চারি করবার অছিলায় দাঁড়িয়ে থাকত। ও মুখ নামিয়ে খুব অল্প একটু হাসি হাসতে হাসতে চলে যেত। কখনও চোখ তুলে তাকালেই দেখত ওরা ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

মালতী আপন মনে যেন গরুটাকে বকত পেলে হয় ! বজ্জাত গরু, পাঁচনের বাড়ি পিঠের ছাল তুলব। আবার ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন কত ভদ্রলোক। দোব চোখে খুঁচে ! বজ্জাত গরু কোথাকার !

বলত বটে মুখে কিন্তু মনে মনে শুধু কৌতুকই নয়, একটু খুশী খুশী ভাব অনুভব করত। চাঁপা মাসীর কাছে এ-সব সে অনেক শিখেছিল তখন। চাঁপা মাসীর বয়স তার থেকে খুব বেশী নয়—বছর ষোল সতের বেশী।, তখন চাঁপা মাসীকে মনে হত ভরতি যুবতী। সে নেচে গেয়ে রঙ্গরসে দিন কাটাতো। আগে আগে বরং গঙ্গাস্নানে পালাতো—কখনও নবদ্বীপ যেতো, ফিরে এসে বাবার কাছে মার খেতো। কিন্তু ক্রমে পালানো ছেড়েছিল, ঘরেই ওই সব করে দিন কাটিয়ে দিত। দুজনের মধ্যে বেশ সখী সখী ভাব ছিল। শ্রীমন্ত বাইরে গেলে—বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় ঘরে দুজনে শুয়ে নানান রঙ্গরস করত। গোটা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা ভাল করে সে চাঁপা মাসীর কাছে শিখেছিল।

সে নিজেও এসে বলত—ওই গরুটাকে ফিরিয়ে এনে এক একদিন বলত এইসব ছোকরাদের কথা। বলত—আমি কি বললাম জান? বলে সব বলত।

চাঁপা মাসী বলত—অন্তরে বেথা লাগছে, বেথা! মনে মনে?

—ক্যানে বেথা কিসের?

চাঁপা মাসী হেসে বলত—তা হলে ভয় নাই। নিশ্চিন্তি। বেথা, বেথা লাগলেই বিপ—দ। বুঝলা!

—বিপদ কিসের?

—কিসের? অ-মাঃ। বিপদ লয়? বেথা হইলেই বুঝবা সেটা বেথা নয় প্র্যাম! কৃষ্ণেরে কদম্বতলে দেইখা না শ্রীমতীর কেমন বেথা লাগল! কেমন কিছু ভাল লাগে না, বুকটা বেথা বেথা করে! তখুন বৃন্দে বলছে—"রাধার কি হইল অন্তরে বেথা।" বৃন্দে শুধায়—কি রকম বেথা গো শ্রীমতী? শ্রীমতী রাধা কয়—বৃন্দা যেন কেমন কেমন! কিচ্ছুতে মন লাগে না। ঘরে না কামে না—বুকের ভিতরটা কাঁদি কাঁদি করে। কাঁদতি পাইলা বড় আরাম লাগে সুখ লাগে। বৃন্দে তখন কয়—তবে আর ই আর কিচ্ছু নয়—এ প্র্যাম!

মালতী খিলখিল করে হাসত। ভারী মজা লাগত। কিন্তু কারুর সামনে বললে মালতীর ভাল লাগত না। কার সামনে আর, বাবার সামনে মাসী তাকে কিছু বলত না—যা বলত বাবাকেই। তাকে কারুর সামনে বলার মধ্যে বসন্ত আর দে বাড়ির মেয়ে গোপা। গোপা তার সখীও ছিল।

আর বসন্তের মিটিং টিটিংয়ে যেতো। সে তাকে বই দিতে আসত। নভেল নভেল পড়ত তারা, বই লাইব্রেরী থেকে এনে দিত বসন্ত।

মাসী বলত—কি সব বইগুলা পড় মাসী! ছাই লাগে আমার আঃ লিখন পঠন শিখি নাই—শিখলে কীর্তনের বই গানের বই পড়তাম অঃ কী যে রস তার মধ্যে!

মালতী বলত—তোমার মুণ্ডু!

—হায় হায় গ। না খাইয়াই কও আমার মুণ্ডু!

গোপা মুচকে মুচকে হাসত। বসন্তের সামনে বললে সে বলত—বেশ বেশ। শোন—আমি পড়ি। তুমিও তো না খাইয়াই কইতেছ খারাপ! শোন! বসন্ত তাকে শরৎবাবুর বই পড়ে শুনিয়েছিল।

বই শুনে চাঁপা মাসী কেঁদেছিল। বলেছিল—তাই তো গ বসন্তমানিকই তো ভাল! বড় ভাল লাগল।

বসন্ত তখন তার বাপকে খোকাঠাকুরের দেওয়া ওই বাড়িতেই থাকে। শরৎ ওস্তাদ এখানে একটা স্থায়ী আড্ডা করেছে। জায়গাটা বাড়ছে। শরৎ ওস্তাদ নিজেই বলে—ভুবনেশ্বরের ভুবনপুর, দেবী গন্ধেশ্বরী, কলিতে অন্নপূর্ণার কাল গেছে—দেখ না ভুবনেশ্বর কাশীর চেয়ে বেড়ে যাবে।

ওই খোকাঠাকুরের বাড়িতে একটা গানের ইস্কুল খুলেছিল। সপ্তাহে তিন দিন ইস্কুল হত। মেয়েদের জন্যে বিকেলে দু'ঘণ্টা—তারপর ছেলেদের জন্যে সন্ধ্যে থেকে দু'ঘণ্টা। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা পড়ত বেশী। সবাই এখন মেয়েদের বিয়ের জন্যে লেখাপড়া শেখাচ্ছে গান শেখাচ্ছে। শুধু লেখাপড়া হলেই বিয়ে হয় না, সব পাত্রপক্ষ এসেই মেয়ে গান জানে কি না জিজ্ঞাসা করে। শ্রীমন্ত মালতীকেও ভরতি করে দিয়েছিল। তার মাইনে লাগত না।

ওই বাড়িতে থাকত বসন্ত। তিন দিন বাবার কাছে খেতো তিনদিন রান্না করে খেতো। তখন ভোট হয়ে গেছে। ভোটে হিন্দু মহাসভার আদি চাটুজ্জে হেরেছে। বসন্তের সঙ্গে চাটুজ্জের ঝগড়াও হয়ে গেছে। বসন্ত গাল দিত—চাটুজ্জে তার মাইনে দেয় নি। হিন্দু মহাসভাতে চাটুজ্জে নালিশ করেছে—বসন্ত হাজার টাকার হিসেব দেয় নি। বসন্ত হিন্দু মহাসভা ছেড়ে কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছে। তবে গৌরীনাথ মুখুজ্জে কংগ্রেসের লীডারের সঙ্গে ঝগড়া ছিল তার। সে নিজে দল করেছিল। থানার

দারোগা শিবরাম সিংয়ের সঙ্গে ভাব ছিল। এখানকার ঝগড়াতে ফৌজ-দাবিতে যে তার কাছে আসত তাদের সাহায্য করত। তা ছাড়া মিটিং করত। গান্ধী জন্মদিন—স্বাধীনতা দিবস—গণতন্ত্র দিবস করত। শোভাযাত্রা বের করত—তারপর হাটতলায় মিটিং হত।

বক্তৃতা করত বসন্ত। খুব ভাল লাগত মালতীর। শুধু মালতীর কেন সবারই ভাল লাগত। মালতী আর গোপা মিটিংয়ের প্রথমেই গান গাইত। দুখানা গান খুব ভাল করে নারান ওস্তাদই শিখিয়ে দিয়েছিল। একখানা—হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর হও উন্নত শির হবে জয় আর জনগণ-মন অধিনায়ক জয় হে!

মাথায় লম্বা লম্বা চুল বসন্তের, খাঁড়ার মত নাক, বড় চোখ—দোষের মধ্যে রঙ কালো আর রোগা; লম্বা ঢিলে পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে যখন জমিদারদের বড়লোকদের ব্যবসাদারদের গাল দিত তখন মনে হত চোখ দিয়ে আগুন ছুটত। বলত একদিন জবাবদিহি করতে হবে তার দিন এসেছে। এই সব মানুষদের ওপর এরা হাজার হাজার বছর ধরে যে অত্যাচার করেছে তার জবাব দিতে হবে। পায়ের তলায় এরা মানুষকে দুই পায়ে দলেছে। গোলাম করে রেখেছে। এদের অন্ন কেড়ে খেয়েছে—দুঃশাসনের মত এদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে। এদের মেয়েরা যখন বেনারসী শাড়ি পরেছে—মুরশিদাবাদি সিল্ক পরেছে—বিলিতী ফিনফিনে শাড়ি পরেছে তখন সাধারণ মানুষেরা ছেঁড়া কাপড় পরেছে। বামুন যারা তারা এদের অস্পৃশ্য করে রেখেছে। মানুষ অস্পৃশ্য? কে বললে? এক ভগবানের গড়া মানুষ—সবারই দুই হাত দুই পা, সবাই মায়ের কোলে জন্মায়, এই ভগবানের পৃথিবী—ভগবানের গড়া সূর্যের আলো—ভগবানের বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচে—তারা জাতে ছোট বড় কিসে? মানুষ মানুষ। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। একজাতি। ভেদ নাই। এই গান্ধীজীর বাণী এই ভারতবর্ষের কবির বাণী—এই নতুন ভারতবর্ষের নতুন বিধান।

এ বক্তৃতা বসন্ত অনেকবার করেছে। কিন্তু প্রথম যেবার শোনে মালতী সেবার তার চোখে জল এসেছিল।

মিটিং থেকে প্রায়ই সে তাদের বাড়িতেই আসত। তার বাবা তার তল্পিদার ছিল। জিনিসপত্র নিয়ে আসত শ্রীমন্ত। বসন্ত তাদের বাড়ি চা

খেয়ে যেত। শুধু চা নয়, ওর বাবা ওস্তাদজী না থাকলে বসন্ত ওদের বাড়িতেই খেতো। এই বক্তৃতা যেদিন প্রথম দেয় সেইদিন ওদের বাড়ি এসে বসন্ত বলেছিল—শ্রীমন্ত, রাত্রে তোমার বাড়িতে খাব।

শ্রীমন্ত বলেছিল চাঁপাকে—ঘি আছে তো? না ফুরিয়েছে?

বসন্ত বলেছিল—ঘি কী হবে?

শ্রীমন্ত বলেছিল—ওই লুচি ভাজবে কিসে?

—লুচি কী হবে? লুচি আমি খাই না। বড়লোকে খায়। আমি ভাত খাব। তোমাদের সঙ্গে রান্না হবে।

—তাই হয়!

—হয় কী—হবে। মিটিংএ কী বললাম শুনলে না? জাত আমি মানি না।

শ্রীমন্ত বলেছিল—তা জাত আর কে মানে বল? সবাই এখন সবার হাতেই খায়। তা হলেও ঢাক বাজিয়ে কেউ খায় না।

—আমি ঢাক বাজিয়ে খাব।

রাত্রে খাবার সময় শ্রীমন্ত ছিল না। রাত্রির প্রথম প্রহরে সে একবার পুকুরপাড়ে যেত। নিজে ছিল পাকা মেছুড়ে, সে পুকুরটির পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুনত কোথাও ঝুন ঝুন শব্দ উঠছে কিনা। মানে কেউ চারা কাঠি বেঁধেছে কি না জোতানে মাছ ধরবার জন্যে। তারপর চারিপাশে জলের কিনারায় কিনারায় পা বুলিয়ে দেখত কেউ সেরেস্তা অর্থাৎ তাগ ফেলেছে কি না, মোটা সুতো পায়ে ঠেকে কি না। খুব যত্ন করে মাছ লাগিয়েছে শ্রীমন্ত।

বসন্তকে খেতে দিয়ে চাঁপা মাসী বলেছিল—মালতীকে দিয়া মাছ রান্না করাইছি। সবটুকুন খাও! কেমন লাগে কও।

মাছ মুখে দিয়ে বসন্ত বলেছিল—খুব ভাল।

চাঁপা মাসী হেসে বলেছিল—এইবার তো জাতি দিলা কুল দিলা—

—জাতি কুল আমি মানি না। দেব কি?

—ওই একই কথা গো মশয়। এখন মালতীকে বিয়া কইরা লও না ক্যান? তোমার পিছে পিছে ফিরে!

—বিয়ে—মালতীকে? কী রে মালতী?

মালতী যে মালতী সেও কথা বলতে পারে নি।

বসন্ত হেসে উঠেছিল। হেসে বলেছিল বৈরাগী বউ বেশ আছে। বিয়ে কব বললেই বিয়ে হয়?

—তবে কিসে হয়? পয়সা টাকা?

—উঁহু ভালবাসা! ভালবাসা হয় তো হবে বিয়ে।

রাত্রে চাঁপা মাসী বলেছিল—মাসী! প্র্যাম কর তবে!

সে বলেছিল—কী যে বল মাসী! ওসব বল না! কিন্তু পরদিন সকালে উঠে গরু খুঁজতে যাবার আগে বাসী কাপড ছেড়ে কাচা কাপড় পরে গিয়ে উঠেছিল ভুবনেশ্বরতলায়।

সকালবেলা হাটতলা খাঁ-খাঁ করে। চালাগুলো পড়ে থাকে—পাকা দোকান গুঁইদের অনেক কাল থেকে—তাদের একটা মুখ পুবের বারান্দায় হাটের দিকে, অন্যটা দক্ষিণ দিকে সদব রাস্তাটার দিকে, হাটের দিন পুবের বাবান্দার দবজা খুলে দোকান বসে, অন্য দিন দক্ষিণ দিকের দোর খুলে দোকান বসে। বিনোদিনীর সত্যর সুরেশের মিষ্টির দোকানগুলোও তাই, দুমুখো দোকান। কিন্তু এত সকালে তাদের দোকানও খোলে নি তখন। তারপব হাট ছাড়িয়ে রাস্তাটা চলে গেছে—তার দু'ধারে অনেক দূব পর্যন্ত বাজার। নানান ধরণের বাজার। মিষ্টি, দর্জি, মনিহারী, পান সিগারেট, মুদিখানা; দু'চারখানা ধানের আড়ত—একটা হোটেল আছে—ওষুধের দোকান আছে—ভূষণ পালের একবারে শেষে থাকে উরো হাড়িরা—উরো কাঠ মাছ বিক্রি করে—ক'ঘর আছে তারা বাখারি থেকে জাফরি ঝুড়ি কুলো তৈরী করে। তারপর হাসপাতাল। আগে ছোট দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল —তারপব চার বেডেব হাসপাতাল হয়েছিল। দিয়েছিল বাবুরা। তখন অর্থাৎ যে দিন ভোরবেলা মালতী গরু খুঁজতে বেরিয়ে গিয়েছিল ভুবনেশ্বর-তলায় তখন সদ্য বড় কুড়ি বেডের হাসপাতাল হয়েছে। আগে মুসলমানদের কবরখানা ছিল। তার পশ্চিম দিকে বাবা ভুবনেশ্বরের অশথ বট বেলের জঙ্গল। আগের কালে রাত্রে কেউ এদিকে আসত না। বলতো বাবার বেহ্মদত্যি ভূত পেত্নীদের সঙ্গে কবরের মামদো ভূতদেব দাঙ্গা লাগে।

সেই ভোরে রাস্তাতেও লোক ছিল না। হাটেও না। হাটে শুধু ধুলো আর পাতা। এখানে ওখানে গোটাকয়েক কুকুর। গোটাকয়েক ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল গাছতলায়। গাছতলায় ক'খানা গাড়ি—রাত্রে ধান চাল নিয়ে এসে পৌঁছে আঁট দিয়েছিল। গাড়োয়ানরা চাটাই পেড়ে ঘুমুচ্ছিল।

আর ছিল হাটের স্থায়ী বাসিন্দে, টিকলি, টিকলির মা। চুনারিয়া, চুনারিয়ার বুড়ো খোঁড়া আধকানা বাবা। টিকলি তার থেকে কিছু বড়। চুনারিয়া তার বয়সী। হাটের গাছতলায় বাঁশের কাঠামো করে তালপাতায় ছাইয়ে এখানে আজীবন রয়েছে। টিকলির মা এসেছিল যুবতী বয়সে। লোকে বলে ভালো ঘরের মেয়ে—ওকে এনেছিল গঙ্গারাম বাজিকর। সাপের ওস্তাদ, কামিখ্যে কামরূপের বিছে জানা লোক, সেই ওকে নিয়ে হাটে এমনি ঝুবড়ি বেঁধেছিল। তারপর গঙ্গারাম পালাল এখানকার ওই উরোদের বাড়ির একটা মেয়েকে নিয়ে। টিকলির মা থেকে গেল। ভিখ মাগতো খেতো। তারপর টিকলি হল। টিকলি এখন সাজেগোজে। ধরণী জেঠার দোকানে কেনা ডুরে কাপড় পরে। ও-ও ব্লাউস পরে। সন্ধ্যে হলেই চুল বেঁধে সেজেগুজে বেরিয়ে গ্রামের ভিতরের বাজার দিয়ে গন্ধেশ্বরী-তলা পর্যন্ত ঘুরে আসে। চুনারিয়াও যায়। তার সাজগোজ কম। তারপর ওদের দেখা যায় বাবা ভুবনেশ্বরতলার পশ্চিম উত্তরে বট অশথ বেল গাছের জঙ্গলে। গাছের আড়ালে হারিয়ে যায়। অন্ধকার রাত্রে তো যায়ই, জ্যোৎস্না রাত্রে মধ্যে মধ্যে গাছের ফাঁকে যে জ্যোৎস্না পড়ে তারই মধ্যে হয়তো এখনি দেখা যায় আবার পরক্ষণেই হারায়। শব্দ শোনা যায়। শিস ওঠে! এ শিস দেয় ও শিস দেয়। ফিসফিস কথা হয়। কখনও চীৎকারও ওঠে। চীৎকার করে ছুটে পালায়। কোন কোন দিন সকাল পর্যন্ত গাছতলায় পড়ে থাকে। রোদ চোখে লাগলে ঘুম ভেঙে উঠে আসে নিজের ঝুবড়িতে। এসেই আবার শুয়ে পড়ে।

টিকলির মা গাল দেয়!—মরবি, মরবি! কোনদিন সাপে কেটে নয় কোনদিন কোন হারামজাদার হাতে মরবি। গলা টিপে মেরে দিয়ে যাবে। নয়তো গলাটা দু'ফাঁক করে দেবে।

টিকলি বিড়বিড় করে।

চুনারিয়াকে ওর বাপ পেটে।—খানকী কসবী কাঁহাকা। হারামজাদী।

চুনারিয়া মার খায় আর বলে—আজ আমি চলে যাবো। তু থাক বুড়ো —ভিখ মেঙে সৎপথী হয়ে থাক। ভগোয়ান ধরম তোর সেবা করুক। তোর গাঁজার পয়সা চাই। সন্ধ্যেবেলা দারু ভি চাই। কাঁহাসে মিলবে দেখ্‌ব আমি।

চুনারিয়ার বাবা বলে—কইকো সাদী কর, খাটনী কর– কামাই কর।

তা না। হে ভগোয়ান! রাত্রে রাত্রে ফিরে এলে বুড়ো, হয় বুঝতে পারে না, নয়তো জানতে পেরেও কিছু বলে না। ভোর হলে ফিরে এলে জমাদার বুলাকীর বুড়ী পরিবার ওকে সারাদিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা বলে। বলে—আয় বাবা একঠো বেটী নেহি। থাকলে কেমন হত। হায় হায়। মিঠাই খাইতাম। দারু পিতাম। আঃ—হায়রে!

জমাদার বুলাকীর তিন বেটা তিন ঘর, ওরা বুড়ীকে খেতে দেয় না—বুড়ীও হাটে ঝুবড়ি বেঁধেছে। ছেলেদের বাড়ী ওই উরো হাড়িদের বাড়ির কাছে হাসপাতালের ধারে। ওদের হাটের পালা আছে। যার যেদিন পালা সে এসে হাট সকালবেলাতেই ঝাঁট দেয়। হাটে ওরা তোলা পায়। আর হাটে জড় হয় যে গোবর, খড় পাতা তা ফেলে একটা সারের গর্ততে। সার বিক্রি হয় অনেক টাকার। টাকায় একগাড়ি দর। দুশো আড়াইশো গাড়ি সার হয় বছরে। সেটা পায় দে বাবুরা। তার একটা অংশও ওরা পায়। হাট ঝাঁট দিতে ওরা খুব ভোরেই আসে। হাটের ধুলোয় পয়সা আনি দু'আনি সিকি আধুলি টাকাও পড়ে থাকে। তবে খুচরোই বেশী। রাত্রে হাট ভাঙে। ভোরবেলা যার পালি তাদের দুজন তিনজন আসে। ঝাঁট দিয়ে যা প্রথমেই মেলে তা মেলে, তারপর জড়করা ধুলো ঘেঁটে দেখে। হাটময় ধুলোর উপর ধান-মেলার মত পা বুলিয়েও দেখে।

সেদিন ভগীরথ জমাদারের পালি ছিল। ভগীরথ বসে বিড়ি টানছিল। ওর বউ আর বেটী ঝাঁট দিচ্ছিল—ছোট দুটো ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছিল আর মধ্যে মধ্যে কখন পা বুলিয়ে কখনও হাতে ঘেঁটে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠছিল—আ মিলছে রে বাপ্! চৌ আনি রে!

কখনও কখনও সোনার নাকচাবি কানের দুলও মেলে। খসে পড়ে যায়, ধাক্কাধাক্কিতে যায়। কারুর বা ছেনতাইয়ের সময় ছেনতাইকারীর হাত থেকে ফসকে পড়ে যায়। ভগীরথের সামনে চার পাটি ছেঁড়া জুতো রয়েছে। একেবারে ছেঁড়া। পরে এসেছিল, পায়ে পায়ে চাপাচাপিতে ছিঁড়ে গেছে—ফেলে দিয়ে গেছে। ভগীরথ বেচে দেবে জুতো-সিলাইওয়ালাদের।

ভুবনেশ্বরতলায় দিঘীর ঘাটে থাকে ক'জন কানা খোঁড়া ভিখিরী। ওরা সব একা একা। ওদের ঝুবড়িও নাই। পড়ে থাকে ঘাটের ধারে। বর্ষার সময় গাছতলায় যায়। শীতের সময়েও যায়।

ভগীরথ জিজ্ঞাসা করেছিল মালতীকে—মালতীবিটিয়া, এত সোকালে কাঁহা যাবি গো মা? আঁ?

মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে পারে নি মালতী। বলেছিল—বাবার থানে যাব—পেনাম করব।

ভগীরথের ওই বাচ্চা ছুটো মালতীকে দেখে খেপানে ছড়া গেয়ে উঠেছিল যেটা ওরা বাঙালী মেয়ে দেখলেই গায়।—বাংগালী বেটিয়া জুত্তি শাড়ি পিহিন করকে মেম বনাইলা!

ভগীরথ ধমক দিয়েছিল—এই! বদমাস কাঁহাকা!

মালতী হেসে হাট পার হয়ে দিঘীর ঘাট পাশে রেখে পথ ধরেছিল। ঘাটের পুবদিকে বাবার থান। বাবার থানে প্রণাম করে পথ ধরেছিল উত্তর-মুখে আমগাছের তলা দিয়ে। আমগাছ-তলায় ইট বিছিয়ে সারি সারি চৌকির মত বসবার জায়গা আর রাশি রাশি কাটা চুল। এখানে নাপিতরা বসে। চুল কাটে। মানতেও চুল দেয় আবার হাটের লোক এমনিও কাটে। সে পার হয়ে দিঘীর উত্তরপাড়ে অশথ বট বন। তার ভিতরে ভিতরে গিয়ে একটি কাঁটার জঙ্গলওয়ালা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছিল। এখানকার বটগাছটা প্রকাণ্ড। আর অসংখ্য ঝুরি। এত দূরে ঝুরিতে ঢেলা খুব কম লোকই বাঁধতে আসে। ওখানেই ঢেলা বাঁধবে ঠিক করেছিল। কিন্তু বাঁধতে গিয়েও বাঁধে নি। চোখে পড়েছিল ওই কাঁটা জঙ্গল থেকে একটা কুঁচের লতা উঠেছে পাশের গাছটায়। কুঁচগাছেও অনেক কাঁটা। তা হোক। ওই কুঁচলতার সঙ্গেই একটুকরো দড়ির পাড় বের করে সে একটি ঢেলা বেঁধেছিল।

বেঁধে—মনে মনে বলেছিল বসন্তের সঙ্গেই যেন তার বিয়ে হয়। হোক সে বামুন। ওকেই যেন সে পায়।

আসবার সময় আবার বাবাকে প্রণাম করে গ্রাম পার হয়ে বাইরের মাঠে মাঠে ঘুরে সেই শিমুলতলায় গিয়ে উঠেছিল কিন্তু গরুটা পায় নি। গরুটা ছিল না। সেখান থেকে আরও ক'জায়গা ঘুরেও পায় নি। মনে মনে ভারী রাগ হয়েছিল। ভয় হয়েছিল। বাবার সকালে গাঁজা খাবার সময় বাড়িতে থাকবেই। কি বলবে সে?

ভুবনেশ্বরকে ডেকেছিল—বাবা, ওকে যেন কেউ খোঁয়াড়ে দিয়ে থাকে। পোড়ারমুখী যেন বাড়ি গিয়ে না থাকে।

বাবা ভুবনেশ্বর কথা শুনেছিলেন—গাইটা খোঁয়াড়ে গিয়েছিল।

শিমুলতলায় বসে থেকে পোড়ারমুখী তাকে মালতী নিতে এল না দেখে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বাড়ি ফিরছিল—তখন গাইটা দুধ দিচ্ছিল না—নতুন বিয়ানের সময় আসছিল, বাছুরের টান ছিল না, পথে ঢুকেছিল গন্ধবণিকদের খামারে—তারা ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে খোঁয়াড়ে পাঠিয়েছিল।

(৬)

তাতেই বাবা ভুবনেশ্বরের উপর ঢেলা বাঁধার উপর বিশ্বাস হয়েছিল তার অনেক। সে বিশ্বাস তার আরও দৃঢ় হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই। সেদিন মহাউল্লাসে বসন্ত তাদের বাড়ি এসে ঢুকেছিল—শ্রীমন্ত ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

শ্রীমন্ত বাড়ি ছিল না। হাটে গিয়েছিল। হাটবার সেটা তাও মনে হয় নি বসন্তের। চাঁপা মাসী বলেছিল—কি ইনকিলাব হইল গো? সে তো হাটে গেছে!

—মালতী কই?

—সে ঘরে ঘুমায় বুঝি।

—তুলে দাও। তুলে দাও। মালতী! মালতী!

ঘরে সত্যিই শুয়েছিল মালতী। ডাক শুনে উঠে এসেছিল। বসন্ত বলেছিল—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। কংগ্রেসের জয়। জমিদারি উচ্ছেদ বিল পাস! কালই প্রসেসন বার করতে হবে।

মালতী জেলখানায় গিয়ে অনেক শিখেছে। কিন্তু সেদিনে তার মনে হয়েছিল এ জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে বসন্তের বক্তৃতাতে। সে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। চাঁপা মাসী যে চাঁপা মাসী সেও সেদিন রঙ্গরস না করে বসন্তের তারিফই করেছিল, শুধু বলেছিল—হ্যাঁ মানিক তুমি একটা বাঘের মতুন মানুষ বট! করলা শেষ!

পরদিন মিছিল হয়েছিল। মিছিল নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল কংগ্রেস পাণ্ডা গৌরীনাথের সঙ্গে বসন্তের। দে বাবুরা ভুবনপুরের জমিদার। ছত্রিশ কোটি যদুবংশের মত অনেক ভাগ হলেও দে বাবুরা খুব প্রতাপ দেখাবার চেষ্টা করত। বিশেষ করে ছোট ভাগীরা। মুখ্যু, গাঁজাল মাতাল শরিকরা

খুব চেঁচাতো। তাদের খুব গ্রাহ্য না করলেও মোটা শরিক এবং যারা ব্যবসা করে অবস্থাপন্ন তাদের গ্রাহ্য করতে হত। তারা নানা ছুতোয় মামলা মকদ্দমা করে লোককে জব্দ রেখেছিল। সব জায়গাতেই তারা প্রধান ছিল। ইউনিয়ন বোর্ড থেকে সব ভোটে তারা দাঁড়াত। বসন্তের সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া অনেক হয়েছে। বক্তৃতা যতই করুক বসন্ত, ভোটে তারা বসন্তকে হারিয়ে দিত। দু'এক বছর আগে ইউনিয়ন বোর্ডে বসন্তকে এমন হারিয়েছিল যে মালতীরও খুব লজ্জা হয়েছিল। শুধু চৌদ্দটা ভোট পেয়েছিল বসন্ত আর দে বাড়ির শিবচন্দ্র দে পেয়েছিল আশি ভোট। বসন্ত প্রসেসনটা নিয়ে দে বাড়ির সামনে খুব ধ্বনি দিয়েছিল। ইনকিলাব জিন্দাবাদ থেকে জমিদার ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক। ইংরেজের কুত্তা বরবাদ। ভারতমাতা কী জয়! আরও অনেক।

সেদিন দে বাবুদের বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল—কেউ বের হয় নি তারা। আবার প্রসেসনেও খুব লোক হয় নি। বসন্ত প্রসেসন করবে শুনে গৌরীনাথ কংগ্রেস লীডার বারণ করে পাঠিয়েছিল—প্রসেসন না করাই উচিত। করো না।

বসন্ত শোনে নি। কিন্তু লোকও বেশী হয় নি। দে বাবুদের ভয়েই হোক আর গৌরীনাথ বারণ করাতেই হোক, কুড়ি পঁচিশজনের বেশী লোক ছিল না। প্রসেসনের আগে মালতী আর গোপা দুজনে ফ্ল্যাগ নিয়ে চলে—তার মধ্যে গোপা আসে নি।

দে পাড়ায় যখন শ্লোগান দিচ্ছিল তখন গৌরীনাথ এসে বলেছিল—এসব কী হচ্ছে! এদের বাড়ির দোরে এসব কী? ছি—ছি—ছি!

বসন্ত এক কথায় বলেছিল—আপনার হুকুম আমি মানতে বাধ্য নই।

মালতীর বাবাও ছিল প্রসেসনে। বসন্তের পিছনেই ছিল। সে বলেছিল—খুব দরদ যে তোমার হে বাপু! আমাদের কংগ্রেস বড়লোকের কংগ্রেস নয়। তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। দোব এখান থেকে ঘাড় ধরে ভাগিয়ে!

বসন্তই থামিয়েছিল। কিন্তু প্রসেসন সে ভাঙে নাই। তবে বেশী দূর বা বেশীক্ষণও চলে নাই। তাড়াতাড়ি হাটতলায় এসে মিটিং না-করেই শেষ করেছিল।

সেদিন হাটে তখন একদল বাজিকর এসে বাজি দেখাচ্ছিল। একজন

বেটাছেলে কপালের উপর একটা বাঁশ খাড়া করে রেখেছিল—বাঁশের মাথায় একটা ন দশ বছরের রোগা মেয়ে খেলা দেখাচ্ছিল।

প্রসেসনের সবাই ওই খেলার চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে খেলা দেখেছিল। সে ছিল বসন্তের পাশে দাঁড়িয়ে। বাঁশের ডগা থেকে মেয়েটাকে উঁচুতে ছুঁড়ে তুলে দিয়েছিল লোকটা। মেয়েটা উপরে উঠে ডিগবাজি খেয়ে নীচে পড়ছিল, লোকেরা চমকে উঠেছিল পড়বে—মেয়েটা পড়বে মাটিতে আছাড় খেয়ে, মরবে এই আশঙ্কায়। সে বসন্তের গা ঘেঁষে এসে তার হাত চেপে ধরেছিল। বসন্তও তাব হাত চেপে ধরেছিল এবং হেসে বলেছিল—দেখ্ না। বসন্তের কথা সত্যি। লোকটা দুই হাত মেলে মেয়েটাকে লুফে নিয়ে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সেদিন খেলার শেষেও সে তার হাত ধরেই বাড়ি ফিরেছিল। সদর রাস্তা দিয়ে ফেরে নি। ফিরেছিল গ্রামের বাইরে বাইরে মাঠের পথ ধরে। বসন্তই বলেছিল—চল্ একটু ঘুরে যাই। সেও বলেছিল চল।

চুপচাপ চলছিল মাঠের পথে হাত ধরাধরি করে। গরুর গাড়ির মেঠো পথ। আকাশে চাঁদ ছিল জ্যোৎস্না ছিল। ভারী ভাল লাগছিল। বসন্ত যে বসন্ত সেও ওইসব কথা না বলে মাঠের দিকে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিল—বাঃ সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে তো!

সেও তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। চাঁদ ছিল মাঝ আকাশে আর একেবারে একদিকে ছিল ধকধকে নীল একটি তারা। তার মনে পড়ে গিয়েছিল খোকাঠাকুরের মুখে শোনা সেই গানটি—নীল উজল তারাটি—।

হঠাৎ বসন্ত বলেছিল—হ্যাঁরে মালতী!

—এ্যাঁ!

—বৈরাগী বউ তোর চাঁপা মাসী একদিন বলছিল তোকে বিয়ে করতে।

মালতীর বুক ঢিপঢিপ করে উঠেছিল। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

বসন্ত বলেছিল—তুই আমাকে ভালবাসিস?

মালতীর হাত ঘেমে উঠেছিল, বলতে কিছু পারে নি। অথচ গ্রামের অন্য কেউ হলে মালতী বলত—না মুখে কিছু বলত না—একটি চড় কষিয়ে দিত আগে তারপর বলত—এই নে জবাব। আজ কিন্তু হ্যাঁও মুখে ফুটল না।

বসন্ত বলেছিল—বাসিস? বল না?

সে এবার মৃদুস্বরে বলেছিল—সেদিন ভুবনেশ্বরতলায়—

—কী ?

—না। সে বলতে আমি পারব না।

—বলতে পারবি না ? কেন ?

—না।

—কী ? দৈববাণী হয়েছে ? না স্বপ্নটপ্ন হয়েছে ?

—তুমি বড় ইয়ে বসন্তদা। কিচ্ছু মান না তুমি।

—কিচ্ছু না, রাজা জমিদার ভগবান কিচ্ছু না। কিন্তু বল কি হয়েছে ভুবনেশ্বরতলায় ?

চুপ করে রইল মালতী। কিন্তু তার হাত ঘামছে। বলতে চাচ্ছে অথচ বলতে পারছে না। বসন্ত বললে—বেশ বলিস নে। কিন্তু ভালবাসিস কিনা বল ? সেদিন থেকে আমার মন মধ্যে মধ্যে তোর কথা নিয়ে খুব চঞ্চল হয়। মনে হয়—

—কী ?

—ভারী ভাল লাগে তোকে !

এবার কোনক্রমে মালতী বলেছিল—বসন্তদা !

—বল ? আমাকে ভাল লাগে তোর ? ভালবাসিস ?

মালতী প্রাণপণে বলতে চেয়েও বলতে পারে নি—বাসি। সেদিন ভুবনেশ্বরতলায় ঢেলা বেঁধে এসেছি। গলা শুকিয়ে আটকে গিয়েছিল। কোনক্রমে বলল—সে তোমাকে কাগজে লিখে দেব।

বসন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে দুই হাতে তার কাঁধ দুটো ধরে বলেছিল—তাহলে তুই ভালবাসিস ! এবং সঙ্গে সঙ্গে সবলে তাকে বুকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল।

থরথর করে কেঁপে উঠে মালতী বলেছিল—বসন্তদা ! বসন্তদা !

কোন বাধা মানে নি বসন্ত। সে তার মাথার চুলের উপর কপালে চুমু খেয়েছিল।

—না—না—না। বলেছিল মালতী—কিন্তু সে 'না' দুর্বল 'না'—সে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ দুর্বল। চাঁদের আলোয় সেই খোলা মাঠের মধ্যে বসন্তের বুকে মুখ রেখে সে সেদিন আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিল।

হঠাৎ একটা সাইকেলের ঘণ্টা বেজেছিল পিছনে। চমকে ছেড়ে

দিয়েছিল বসন্ত। সে হাঁপাচ্ছিল। তবু সভয়ে ফিরে দেখেছিল একটা সাইকেল আসছে কিন্তু খুব কাছে নয় একটু দূরে। সামনে একটা কী পড়েছে। সাদা মত দেখাচ্ছিল। একটি গরু। লোকটাকে নামতে হয়েছিল। গরুটা পথ ছাড়ে নি। তার উপর মেঠো পথ। গরুটাকে পাশ কাটিয়ে লোকটা সাইকেলে চড়েছিল। বসন্ত বলেছিল—দাঁড়িয়ে থাকিস নে, চল।

চলতে চলতে মৃদুস্বরে সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—দেখেছে, নয় ?

—না বোধ হয় ? তারপরই সে বেশ জোর গলায় বলতে শুরু করেছিল—জমিদারি একটা পাপ। একটা জঘন্য প্রথা। উঠে গেল—এই হল স্বাধীনতার আসল কাজ! আজ আর মানুষকে কতকগুলো পচা লোককে রাজা বলে প্রণাম করতে হবে না। বাবু মশায় বলতে হবে না। এরপর বড় বড় জোতদারগুলো যাবে।

সাইসিকেলওয়ালা পার হয়ে গিয়েছিল ওদের।

মালতী জিজ্ঞেস করেছিল—কে ?

—সরকারী লোক এখন তো হরদম আসছে!

—আমাদের দেখেনি না ?

—না। আর দেখলেই বা। আমি তো জাত ধর্ম এসব মানি না। বামুন বোষ্টুম কি হিন্দু মুসলমান এসবও মানি না। তোকে আমি বিয়ে করব। বিয়েও মানি না। তবু নিয়ম আছে বলে বিয়ে করব। তাও রেজেস্ট্রি করে।

—রেজেস্ট্রি করে ?

—হ্যাঁ। নইলে তো বিয়ে সিদ্ধ হবে না।

রেজেস্ট্রি বিয়ে মালতী শুনেছে। ভাল করে না জানলেও জানে। তবু মন কেমন খুঁতখুঁত করছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা কিছু করতে পারে নি।

এরপর ওরা গ্রামের মুখে এসে পড়েছিল।

বসন্ত বলেছিল—বাবার জন্যে পারছি না—জানিস! বাবা তো গোঁড়া বামুন। নাহলে—

তারপর হঠাৎ বলেছিল—আমার সঙ্গে চলে যেতে পারবি ?

বুক তার ধড়ফড় করে উঠেছিল—চলে যেতে ?

—হ্যাঁ। লুকিয়ে রাত্রে উঠে—

—কোথায় যাবে ?

—কলকাতা। কিংবা অন্য কোথাও !

সে চুপ করেছিল। কথাটার উত্তর দিতে পারে নি। মনের ভিতর থেকে মধ্যে মধ্যে মন বলে উঠেছিল—যাব। হ্যাঁ যাব। কিন্তু মুখে বলতে পারে নি। যতবার বলতে চেয়েছিল ততবার আটকে গিয়েছিল।

বাড়িতে এসে দেখেছিল সে এক বিশ্রী কাণ্ড। বাবা রুদ্রমূর্তিতে আস্ফালন করছে। যা মুখে আসছে তাই বলে গালাগালি করছে।

চাঁপা মাসী বলেছিল—দে বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে বাবার। হাটতলা থেকে বাবা আগেই চলে এসেছিল আবগারির দোকানে যাবার জন্যে। গাঁজা ছিল না। সূর্যাস্তের পর আবগারির দোকান বন্ধ হয়। আবগারির দোকানে দে বাবুদের একজন গোমস্তা, সে আপিং খায়, আপিং কিনতে এসেছিল। সেখানে এই শোভাযাত্রা আর ওদের আস্ফালনের জন্যে গোমস্তা বলেছিল ভেণ্ডারকে। বলেছিল—জান হে সাহা যদি এমন আইন হয় ভগবানের রাজ্যে যে ব্যাঙগুলো সব হাতির সমান হবে। তা হলে কী হয় বল তো ?

হেসে ভেণ্ডার বলেছিল—আপনিই বলুন।

—ব্যাঙগুলো গ্যাঙর গ্যাঙর করে চেঁচায় আর পেট ফোলায়। ফোলাতে ফোলাতে ফটাস্। বুঝেছ !

শ্রীমন্ত রাগ সামলাতে পারে নি—বলেছিল—চোপ্ রে বেটা চোপ্—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—চোপ্। হাতি নয় বেটা—ছুঁচো ছুঁচো।

এই থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকটা এগিয়েছে। শ্রীমন্ত গোমস্তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। গোমস্তা নাকি গেছে দে বাবুদের কাছে। বাবুদের চাপরাশী এসেছিল। শ্রীমন্ত তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে—বলেছে—ভাগ্ ভাগ্—আমি কারুর প্রজা নই গোলাম নই—আমি কারুর ডাকে যাই না।

বসন্ত শ্রীমন্তের হাত ধরে বলেছিল—এস আমার সঙ্গে। দেখি।

বসন্তের সে ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে মালতীর মনটা গৌরবে ভরে উঠেছিল। সেও তাদের সঙ্গে গিয়েছিল। তারপর যা হয়েছিল সে মালতী কল্পনা করে নি।

দে বাবুর সঙ্গে সমান জোরে তর্ক করেছিল বসন্ত।

দে বাবু বসন্তের মুখের সঙ্গে পেরে ওঠে নি। চোখ দিয়ে তার আগুন

বের হচ্ছিল। সে বলছিল—অত্যাচারীর জাত আপনারা—ব্রিটিশদের গোলাম—মানুষের রক্ত শুষে বড়লোকই করেছেন তার কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে আজ। আজ আপনার রক্তচক্ষুকে কেউ ভয় করে না। আরও আসছে দিন। আরও আসছে। এই বাড়ি ঘর ইট কাঠ সব যাবে—

দে বাবু চাপরাশীকে বলেছিলেন—দে—বের করে দে ঘর থেকে দে।

চাপরাশী বসন্তকে ঠেলা দিয়েছিল। তারপর হাতাহাতি হয়েছিল—এরই মধ্যে বসন্ত একটা পড়ে থাকা রুল কুড়িয়ে নিয়ে মেরেছিল চাপরাশীর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়েছিল।

মালতীর ইচ্ছে হয়েছিল চীৎকার করে উঠতে—এ কি করলে বসন্তদা? কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হয় নি। বসন্ত এসে তার হাত ধরে টেনে বলেছিল—চল!—শ্রীমন্তকে ডেকেছিল—শ্রীমন্ত।

চলে তারা এসেছিল সেদিন। এবং ফিরে এসেই বসন্ত বলেছিল—আমি চললাম শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত বলেছিল—কোথায়?

—এখন সাঁইতে যাচ্ছি। তারপর দরকার হলে কোথাও গিয়ে থাকব। তুমিও বরং ক'দিন সরে থাক গ্রাম থেকে।

শ্রীমন্তও চলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল—তোদের ভয় নেই। তবে তোরা ওদের ডাকে যাস নে। আমি কাছেই থাকব। তেমন হলে ঠিক ফিরব।

ওদের উপর কোন কিছু জুলুম হয় নি। তবে মামলা হয়েছিল। পুলিশ বাবুদের মুখ তাকিয়ে ঘর চড়াও হয়ে দাঙ্গা ডাকাতি এই রকম মামলা করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আদালতে তা টেঁকে নি। তবে বেকসুর খালাসও পায় নি শ্রীমন্ত বসন্ত। ওদের তিন মাস আর ছ' মাস জেল হয়ে গিয়েছিল। শ্রীমন্তের তিন মাস বসন্তের ছ' মাস। মালতীকেও আদালতে টেনেছিল। কিন্তু সে বেকসুর খালাস পেয়েছিল।

পুলিস বসন্তকে কম্যুনিস্ট বলেছিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল উকিলকে—জমিদার ধনীদের সঙ্গে ঝগড়া করলেই সে কম্যুনিস্ট হয় নাকি? তা হলে তো কংগ্রেস জমিদারি উচ্ছেদ সমর্থন করে—তারাও

কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছে। এ ছোকরা তো সেদিন কংগ্রেস ফ্ল্যাগ নিয়েই শোভাযাত্রা করেছিল। তাতে অবশ্য রক্ষাও পায় নি বসন্ত।

জেলে যাবার সময় বলেছিল—কংগ্রেস ছাড়লাম আজ। মালতী—খবরদার আর ওদের ডাকে যাবে না।

তা যায়নি মালতী। গৌরীবাবু ছু' একবার ডাকতে পাঠিয়েছিল—সে বলেছিল না।

শ্রীমন্তের দোকান মালতীই চালাতে লেগেছিল। বাপের দোকানে বাপেব পাশে বসে বেচাকেনা সে দেখছিল—বাড়ীতে শ্রীমন্ত না থাকলে খদ্দেব এলে সে-ই জিনিস বেচত। বাপের জেল হলে সে-ই হাটে দোকান নিয়ে এসে বসত ধরণী জেঠার দোকানের আধখানাতে।

ধরণী জেঠাও বলত—বেশ করেছ মা ওসবে যাও নি। ওসব ওই গৌরী-বাবুদেবই ভাল। ইউনাইন বোডের পেসিডেন—ভোট মিটিং ওরা করে ওদেরই ভাল। শ্রীমন্তকে কতবার বলেছি—তুই ওসব করিস না। আর ওস্তাদের ছেলের কথা বাদ দাও। মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ মাটিতে পড়ে পড়ে যুদ্ধ করে—এ মা তার চেয়েও সরেস। ওস্তাদের বেটা লাটসাহেব। এই বকম ভুঁইফোড় সেকালে ছিল না মা। এই একালে হয়েছে। ছু' পাতা ইংরেজী আর ওই বন্দেমাতরম—বুয়েচ—এতেই ওদেব ডিম ফুটে সাপের ডেঁকা হয়ে জন্ম। ইসব মা বলতে গেলে গান্ধীই করে গেল!

মালতী মনে মনে হাসত। হাসির কাবণ অনেক। ইউনাইন বোড, পেসিডেন তারপর এই ভয়—এতে ওর হাসি পেত। আবার বলত—তোমাদের সময়টা এখন খারাপ মা।

চাঁপা মাসীও বলত—মাসী সময়টা খারাপ পইড়েছে। সাবধানে চলবা।

তবে চাঁপা ধরণী জেঠার মত নয়। বসন্ত সম্পর্কে বলতে ইবার পোলাটা লীডার হইয়া গেল। জ্যাল খাটল। ইবার উ ঠিক ভোট করবে। দেখিয়ো তুমি। তবে হাঁ। সাহস আছে—বুকের পাটা আছে! তা আছে! ইবার আর নাগাল পাবা না। দেইখো!

মনে মনে সে বলত—দেখো তুমি!

হঠাৎ এরই মধ্যে ঘটে গেল আর একটা কাণ্ড। খোকাঠাকুরের কাছে কেনা পুকুরটা গন্ধেশ্বরীতলার তামাকওয়ালা বাসুদেব দোবে একদিন দখল করে বসল জোর করে।

চাঁপা মালতীকে নিয়ে গিয়েছিল ছুটে।

মালতী চীৎকার করে বলেছিল—এ কি দোবে মশায় আমাদের পুকুরে জোর করে মাছ ধরাও ক্যানে? এ কি মগের মুলুক না জোর যার মুলুক তারএর দেশ!

বাসুদেব বলেছিল—এ পোখোর আমি কিনলাম দে বাবুর কাছে!

—পুকুর দে বাবুর নয়। পুকুর আমাদের। খোকাঠাকুরের কাছে কিনেছি আমরা!

—পুকুর খোকাঠাকুরের বাপকে দে বাবু ভাগ করতে খেতে দিয়েছিল—বিক্রি করে নাই। দান ভি করে নাই। মুখে বলিয়েছিল।

তোমার পোখোর নাই—ওটাতে মাছ ফেলাও, খাও। তবে দান কি বিক্রী ই করতে কোন ক্ষমতা উকে দেয় নাই। কুনো দলিল থাকে তো দেখাও। কোর্টে যাও।

ধরণী জেঠার কাছে গিয়েছিল মালতী। ধরণী জেঠা বলেছিল—তাইতো মা এ তো খুব ঘোর প্যাঁচের কাণ্ড। দলিল তো কিছু করে দেয় নি দে বাবু। সে আমলের লোক—তাদের মুখের কথার দাম ছিল। তা বলতে তো পারছি না। চল বরং ওই ভূতি সরকারের কাছে চল। ও আইনকানুন বোঝে। এ চাকলার জমি জেরাত স্বত্ব এসব ওর সব জানা। ও বলতে পারবে।

ভূতি সরকার বলেছিল—প্যাঁচের ব্যাপার বটে। জটিল ব্যাপার। গত সেটেলমেন্টে পরচায় পুকুর দে বাবুদের নামে। নাখরাজ। তারপর বাবু মুখে দান করলে। কোন দলিল করে দেয় নাই। নাখরাজের সেস দিতে হয়। তাও ঠাকুররা কখনও দেয় নাই। ওই দে বাবুরাই দিয়ে এসেছে। আর পাঁচটা নাখরাজের সঙ্গে যেমন দিত তেমনি দিয়েছে। প্রমাণ ছিল দখল; তা বাসুদেব বেদখল করে দিলে। শ্রীমন্ত জেলে। এখন দখল করে নিলে, বেদখল করা সহজ নয়! মুশকিল বটে বাপু। আসল ব্যাপার—শ্রীমন্ত বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া করে এল। ওই বসন্ত ছোকরার সঙ্গে নাচল। বাবুদের রাগ হয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল ফাঁক। দলিল নাই,

সেস বাবুরা দেয়, পরচা বাবুদের নামে ; শ্রীমন্ত জেলে—ওরা বাসুদেবকে ডেকে দিয়ে দিলে দুশো টাকাতে। বাসুদেব দোবের ব্যবসা ওই, ফৌজদারি মামলা কেনে। মুশকিল বটে বাপু। তা থানায় একটা ডায়েরী করে রাখ। ফৌজদারি করে তো আটকাতে তোমরা পারবে না। মেয়ে-ছেলে হাজার হলেও।

কথাটা শুনে মালতী বলেছিল—আমি যাব।

তার মনে পড়েছিল বসন্তের দৃষ্টান্ত। সে একদিন এখানকার ইস্কুলে ছেলেদের ইস্কুলে যেতে বারণ করেছিল। শোভাযাত্রা বের করবে। তার জন্যে সে কতকগুলো ছেলের ইস্কুল ঢোকা বন্ধ করতে রাস্তার উপর শুয়ে পড়েছিল। সে তাই করবে। শুয়ে পড়বে পুকুরঘাটে, যখন জাল তুলবে তখন পথ বন্ধ করে শুয়ে পড়বে।

তাই সে করেছিল। কিন্তু ফল কিছু হয় নি। বাসুদেব তাকে লোকজন সাক্ষী রেখে পাঁজাকোলা করে তুলে উপরে এনে শুইয়ে দিয়েছিল। মালতী রাগে কেঁদে ফেলে বাসুদেবকে গালাগাল করে নিষ্ফল হয়ে ফিরে এসেছিল।

তিন মাস পর ফিরল শ্রীমন্ত। এ শ্রীমন্ত আরও উগ্র শ্রীমন্ত। সে ফৌজদারি করবার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু বাসুদেব থানায় খবর দিয়ে আদালত থেকে শ্রীমন্তের উপর নোটিশ করালে। যেন সে পুকুর দখল করতে হাঙ্গামা করতে না যায়।

শ্রীমন্তও গেল থানায়। সেও পালটা মামলা করে নোটিশ করালে বাসুদেবের উপর। এরই মধ্যে ঘটে গেল চরম দুর্ঘটনা।

ওঃ। শরীরটা শিউরে ওঠে সে কথা মনে পড়লে। অন্ধকার রাত্রি ছিল—

হাটের আলোর ওধারেও তেমনি অন্ধকার থমথম করছে। হাটটা ভাঙ্গছিল তখন। ধরণী দাস জিনিসপত্র বাঁধছে। বাঁধছে ধরণীর মুটেটা। ধরণীর জেঠা তহবিল মিল করছে। আলু পেঁয়াজওয়ালারা বিক্রি না হওয়া আলু পেঁয়াজ বস্তায় পুরছে। বেগুনওয়ালারা এখনও হাঁকছে—সস্তা বেগুন —সস্তা বেগুন।

কতকগুলো ছোট ছেলে পড়ে থাকা আলু পেঁয়াজ লঙ্কা পুঁইয়ের পাতা শাক কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

খিলখিল করে কে হাসছে। চুনারিয়া? টিকলি?

না। তারা নয়। অন্য কেউ। হাটে অনেক চুনারিয়া টিকলি আসে। কি বলছে? কথাগুলো ভেসে এল—ও মাঃ! আমার জন্যে ভাবছ? কার সঙ্গে যাব? আমার মরা সোয়ামী ভূত হয়েছে হে। আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

বুঝতে পারলে মালতী কোন যুবতী বিধবা বলছে কথাটা। সাহস তার খুব।

ধরণী বললে—মা এলে—তা ঝুড়িটাও খুললে না। বসেই থাকলে। এবার তো হাট ভাঙছে মা। বাড়ি যাব। তুমি বাড়ি যাও।

—হ্যাঁ জেঠা যাব। আজ আর খুললাম না। খুলতে ইচ্ছেও হল না। বসে বসে দেখলাম আর ভাবলাম। কাল থেকে নানান কথা মনে পড়ছে।

—পড়বেই মা। পড়ারই কথা। কিন্তু তুমি কি দোকান করবে মনে করেছ?

মালতী বলল—করতে তো হবে কিছু! খেতে তো হবে। মাসী ভিক্ষে করে। আমি তো তা পারব না।

—হাঁ চাঁপাবউ ভিক্ষে করে। আমি বলেছিলাম মা। চাঁপাবউ কাজকর্ম করে তো খেতে পার। মুড়ি ভেজে দিতে পার, জল তুলে দিতে পার লোকের। অনেক বাড়ি হয়েছে। লোকেরা সকলে ঝি রাখতে পারে না, ঠিকেতে জল তুলিয়ে নেয়। পাঁচ সাত বাড়ি ঠিকের কাজ করলে পঁয়ত্রিশ টাকা চল্লিশ টাকা হবে। তা বললে—তাও করব। কিন্তু বোষ্টুমের মেয়ে গৌর বলে ভিক্ষা করে ধম্মটা রাখি। দিনে তো গৌর নাম হরির নাম হয় না—ভাসুর! দেখ তোমার ভাই বোষ্টুম হয়েও নাম করত না। খেটে খাওয়ার গরবে বিষয়ের তাপে সব ভুলেছিল। কী লোভ আর কী হিংসে বল; কথা হল কেউ মাছ ধরবে না—কেউ পুকুর দখল করবে না আদালতে বিচার না-হওয়া পর্যন্ত। তা সে ধৈর্য হল না। জোতানে চুরি করে মাছ ধরতে গেল।

(চ)

বড় বড় মাছ অনেক যত্নে তৈরী করেছিল শ্রীমন্ত। দশ সের বারো সেব, দু'একটা পনের ষোল সেরও ছিল। সেগুলো রুই বা মিরগেল। পাঁচ সাত সের মাছ ছিল অনেক। মধ্যে মধ্যে লোকের ক্রিয়াকর্মে বিক্রি করত শ্রীমন্ত। আশী নব্বুই একশো টাকা মন।

সেই মাছগুলো সবই প্রায় ধরিয়ে নিয়েছিল বাসুদেব দোবে। গাঁয়ে বিলি করে দিয়েছিল প্রথম দিন।

বাসুদেব দোবে হিন্দুস্থানী বামুন, নিজে মাছ খায় না কিন্তু ছেলেপিলেবা খায়। মাছের জন্য বাসুদেব পুকুর কেনে নি। পুকুর কিনেছিল পুকুরের জন্য সম্পত্তির জন্য। সস্তায় সম্পত্তি সে কিনেছে। তাই সে কেনে। বিবাদা সম্পত্তি সস্তায় কেনাই তার কাজ। মামলা মকদ্দমাও সে বোঝে। জানে।

শ্রীমন্তের আক্ষেপেব সীমা ছিল না। জেদেরও অন্ত ছিল না। সে মামলার জন্যে ওস্তাদকে ধরেছিল। ওস্তাদের সঙ্গে শহবে যেত মামলা করতে। মামলাব গতি শামুকেব চেয়েও আস্তে। সেই গতিতেই মামলা চলছিল। শ্রীমন্তের ধৈর্য থাকতে থাকতে ভেঙ্গে গেল। আশ্বিন মাস। ভরা পুকুর। চড়া রোদের সময় মাছগুলো খাবি খায়। যখন বর্ষণেব ঢল নামে তখন পাড়েব ধারে ধারে এসে দামদল নেড়ে বেড়ায়। বড় বড় মাছ।

একদিন গভীর রাত্রে গিয়ে সে চারাকাঠি পুঁতে এল। মাছগুলোকে জোতানে ধরে খেয়ে শেষ করবে সে। কোন দিন সে এক সময়ে বের হত না। কোন দিন দুপুর রাতে, কোন দিন শেষ রাতে, কোন দিন লোকজন শোবামাত্র সে গিয়ে চার ফেলে আসত। চারাকাঠির মাথাটা এমন সুন্দর কৌশলে পুঁতেছিল যে সে ছাড়া আর কেউ ধরতে পারত না। মালতীকে সঙ্গে নিয়ে যেত। মালতী পাহারা দিত—সে চারা ফেলত জলে। নিঃশব্দে নেমে চারায় থলি বেঁধে দিয়ে আসত। সাত দিন পর প্রথম মাছ ধরেছিল জোতানে। মালতীর হাতে দিয়ে ছিল একটা খেঁটে। মাছটা মাটিতে আছড়ে পড়বামাত্র সে খেঁটে দিয়ে মাথায় মেরে মেরে ফেলত। তারপর মাছটা নিয়ে বাড়ি এসে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলত। মাছ রান্না করলেই জানাজানির ভয় ছিল।

চারটে মাছ মারবার পর পাঁচ দিনের দিন।

সেদিন পড়েছিল একটা রুই মাছ। বারো সের রুই। বাপ মেয়ে মাছটা বাড়ি এনে ফেলে হাঁপাচ্ছিল। চাঁপা দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীমন্ত সেদিন মাছটা পুঁততে গিয়ে পোঁতে নি। বলেছিল—রুইমাছ কেটে ফেল। মুড়োটা আর পেটিটা রাখ। বাদবাকীটা পুঁতে দেব। কাট!

মালতী মাছ কুটত ছেলেবেলা থেকে। চাঁপা বলত—ওরে বাবা—ও রক্ত দেখবারে আমি পারি না বাপু!

মালতী হাসত।

মালতী মাছ কুটছিল। বঁটিটা ছিল শ্রীমন্তের বরাত দিয়ে তৈরী করানো ধারালো বঁটি। মুণ্ডটা কেটে ফেলেছে। পেটের ভিতর থেকে নাড়ীভুঁড়ি-গুলো বের করছে—শ্রীমন্ত উপু হয়ে বসে সতৃষ্ণ নয়নে দেখছিল আর আক্রোশভরেই বলছিল—শালা!

বারবার বলছিল। একবার দুবার বলে তৃপ্তি হচ্ছিল না তার! ঠিক এই সময় চাঁপা বারান্দা থেকে একটা ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠেছিল—আঁ—।

কি হল তা বুঝবার আগেই পাঁচিলের উপর থেকে সশব্দে লাফিয়ে পড়েছিল বাসুদেব দোবে।

—শালা—চোট্টা—হারামি কাঁহাকা!

শ্রীমন্ত বলশালী লোক। কিন্তু বাসুদেব আরও বলশালী; তার উপর অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে শ্রীমন্তকে নীচে ফেলে তার গলাটা টিপে ধরেছিল। শালা চোট্টা!

শ্রীমন্ত আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পায় নি—শুধু একটা শব্দ তার গলা থেকে একটা বীভৎস গোঙানির মত বেরিয়ে এসেছিল।

সে হতভম্ব হয়ে বঁটির উপরেই বসেছিল। চাঁপা ছুটে গিয়ে বাসুদেবকে ধরে টেনেছিল পিছন থেকে—ও গ মইরা গেল—মইরা গেল ও গ।

বাসুদেব একটা হাতের ঝাঁকানি দিয়েছিল তাকে। এমন সজোরে সে ঝাঁকানি যে চাঁপা পড়ে গিয়েছিল আছাড় খেয়ে। তবুও সে চীৎকার করেছিল—মালতী!

মালতীর মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। রাগে তার কোন জ্ঞান ছিল না। সে বঁটিটা তুলে নিয়ে ছুটে এসে একটা কোপ বসিয়ে দিয়েছিল বাসুদেবের ঘাড়ে। বাঁ কাঁধে গলার নীচে বঁটিটা প্রায় আধখানা বসে গিয়েছিল।

বাসুদেব একটা চীৎকার করেছিল। জন্তুর মত। আ—। তার সঙ্গে চাঁপা সভয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল ও গ—কি করলা মালা গ!

ওদিকে সদর ভেঙে ঢুকেছিল বাসুদেবের লোকেরা।

মালতীর চোখের সামনে আর কিছু ছিল না। ছিল রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে যেন গাঢ় কাল রঙের অনেকটা কিছু। কিন্তু গরম। উঃ কী গরম!

শ্রীমন্ত মরে নি! মরেছিল বাসুদেব। হাসপাতালে দুজনকেই নিয়ে গিয়েছিল। শ্রীমন্তও অজ্ঞান ছিল। বাসুদেবও কিছুক্ষণের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার আগে সে বলেছিল—ওই মেয়েটা—ওই মালতী বঁটি দিয়ে কুপিয়ে দিলে আমাকে।

হাসপাতালে মরবার আগেও তার একবার জ্ঞান হয়েছিল—তখনও সে বলে গিয়েছিল একথা পুলিসের কাছে—একজন হাকিমের কাছে।

মালতীও অস্বীকার করে নি। বিহ্বলের মত হয়ে গিয়েছিল—তার মধ্যেই সে বলেছিল—হ্যাঁ। বাবা গোঙাচ্ছিল, চাঁপা মাসী ছাড়াতে গেল—তাকে ঝটকা মেরে ফেলে দিলে—আমি মাছ কুটছিলাম বঁটি নিয়ে—আমি বঁটিটা নিয়ে গিয়ে কোপ মারলাম।

* * *

সারা রাত্রি হাজতে সে উপুড় হয়ে পড়েছিল। ঘুম আসছিল কিন্তু আতঙ্কে ভেঙে যাচ্ছিল। আধ ঘুমের ঘোরে সে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠছিল। একটা আতঙ্কিত কান্না—উ—!

ওঃ—সে কী রাত্রি!

সকালে উঠে তার দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। থানার দারোগার মায়া হয়েছিল। তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে! তাকে খাইয়েছিল স্নান করিয়েছিল। তারপর তাকে সদরে চালান দিয়েছিল।

সে মিথ্যা কথাও বলে নি। ছোট আদালতেও না—দায়রা আদালতেও না। চাঁপা মাসী ওস্তাদকে সঙ্গে করে সদরে এসে তার সঙ্গে দেখা করেছিল। তখনও শ্রীমন্ত হাসপাতালে। সেও জখম কম হয় নি। গলাটা তার বসে গিয়েছিল। দায়রা আদালতে তার বিচারের সময় শ্রীমন্ত এসেছিল। সেই

শক্ত জবরদস্ত চেহারা তার বাবার—সে যেন ভেঙে চুরে কী হয়ে গিয়েছিল। শুধু হাড় শুধু হাড়। চোয়ালটা উঁচু হয়েছে। কন্নুর হাড়গুলো উঁচু হয়েছে। চোখ দুটো বসে গেছে। গাল তুবড়ে গেছে। ভয় করত। আর হাঁপাতো। গলাটা ধরা ধরা হয়ে গিয়েছিল।

শুধু কাঁদতো। আদালতের মধ্যেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আর চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে আসতো অনর্গল।

সে নিজে প্রথমটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। জেলখানার উঁচু পাঁচিলওয়ালা বিরাট ঘেরার মধ্যে আর একটা ছোট ঘেরা জায়গা। সেটা মেয়েদের জেল। মেয়ে কয়েদী পাহারা দেয়। একখানা বড় লম্বা ঘরে মেয়ে কয়েদীরা থাকে। তখন আটজন ছিল। তিনজন মুসলমানের মেয়ে। পাঁচজন হিন্দু। একটি অল্পবয়সী বামুনের বিধবা ছিল। বিধবা হওয়ার পর তার ছেলে হয়েছিল। সেই ছেলেকে সে গলা টিপে মেরেছিল। তিনজন মেরেছে স্বামীকে। বাকী তিনজন চোর। একজন ছিল আধবয়সী। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুব কথা। সুন্দর কথা। গান গাইতো ভাল। সে বলত—আমি কিছু করি নি। কিন্তু অন্যেরা বলত—মেয়েদের ভুলিয়ে সে বাড়ি থেকে বের করে এনে বিক্রি করত। আবার বেশ্যাবৃত্তিও করাতো। তার জন্যে জেল হয়েছে তার।

সব কথা তার ভাল মনে পড়ে না ওই সময়কার। সে যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। একটা দুরন্ত ভয় ছিল—খুন করলে ফাঁসি হয়। সে খুন করেছে।

জোবেদা ছিল আধবয়সী মেয়ে। বুড়ো মোক্তারের স্ত্রী। আশনাই ছিল তার মোক্তারের মহুরীর সঙ্গে। তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিষ দিয়ে মেরেছিল স্বামীকে। ছেলে হয় নি বলে বুড়ো মোক্তার আবার বিয়ে করতে যাচ্ছিল। জেল হয়েছে দশ বছর। সে মহুরীর পাঁচ বছর।

জোবেদা তাকে বলেছিল—ভেবো না মেয়ে। ফাঁসি তোমার হবে না। আমি আইন জানি। তোমার বয়স কম। তা ছাড়া তোমার বাবাকে খুন করছিল—তুমি তাকে বাঁচাতে বঁটির কোপ মেরেছিলে রাগের মাথায়। খুন করব বলে কোপটা মার নি।

ওই আধবয়সী সুশীলা বলেছিল—ভাবিস নে ছুঁড়ী তুই বেকসুর খালাস পাবি। কচি মুখ—ঢলঢলও আছে। আদালতে ফ্যালফ্যাল করে তাকাবি

খুব ভাল মানুষ সেজে থাকবি। বুঝলি—ওই মুখ দেখেই সব ভুলবে। উকিল ফুকিল সব। যেমন এখন তাকিয়ে আছিস আমাদের দিকে এই তাকানি তাকালেই হবে।

সত্যই সে বিহ্বলের মতই তাকিয়ে থাকত। ওই উঁচু দেওয়াল—এত লম্বা একখানা ঘর—উঁচু ছাদ; এক আকাশের আলো আর বাতাস ছাড়া বাইরের কোন কিছু আসত না। শব্দও না। মধ্যে মধ্যে কখনও সখনও হঠাৎ হয়তো একটা গোলমাল ভেসে আসত। জোবেদারা কৌতূহলী হয়ে উঠত—কী হল?

মেয়ে মেটকে জিজ্ঞাসা করত—কী হয়েছে আজ বাইরে? জান? কখনও খবর মিলত কখনও মিলত না। ওদেরও কৌতূহল ফুরিয়ে যেত। প্রথম প্রথম ওর এই ধ্বনি শুনেও কোন কৌতূহল কোন প্রশ্ন মনে জাগত না। শুধু আলো আর রৌদ্রের মধ্যে যেন খানিকটা মনে হত এই সংসারের মধ্যেই আছে সে। এই দেওয়ালের বাইরে সেই পৃথিবী আছে যেখানে ভুবনপুরের হাট বসে। রাস্তা দিয়ে লরী যায়। গাড়ি যায়। যেখানে চাঁপা মাসী আছে। বাবা আছে।

রাত্রে মনে হত বসন্তের কথা। রাত্রে জেলখানাটাই সব পৃথিবী হয়ে উঠত। মনে হত এর বাইরে আর কিছু নাই। তখন মনে হত বসন্ত তো এখানেই আছে। প্রথম দু'দিন তার মনে হয় নি। তৃতীয় দিনে হঠাৎ মনে পড়েছিল বসন্তকে। বসন্ত জেলে আছে। আর এই জেলেই আছে। রাত্রে শুয়ে ভাবত প্রশ্ন করত—কোথায় আছে বসন্ত? কি করে খবর তাকে পাঠাবে!

জোবেদাদের তখন নাচগানের আসর বসত।

ওই প্রৌঢ়া গান করত—জোবেদা বসে শুনত। নাচত হামিদা আর কমলা বলে দুজন। বামুনের বিধবাটি পিছন ফিরে শুয়ে থাকত। ও মেয়েটা ছিল কেমন। ও নাকি লেখাপড়াজানা মেয়ে।

সুশীলা অশ্লীল গান গাইত। ওরাও অশ্লীল ভঙ্গী করে নাচত।

মালতী ভাবত বসন্ত কোথায় আছে? কী করে দেখা হবে?

ক্রমে সে সহজ হয়ে এল। সব সয়ে গেল। জানালার ধারে বসে থাকত আর ওদের কথা শুনত। বেশ লাগত। রাত্রে নাচগান তাও দেখত শুনত।

এরই মধ্যে বিচার আরম্ভ হল। ক'দিন একজন উকিল এসেছিল। তাকে বলেছিল—অনেক কথা বলেছিল। কিছু মনে থাকে নি। একটা কথা মনে আছে—বলেছিল—তুমি একটি কথা বলবে। আমি নির্দোষ!

প্রথম যেদিন জেলে থেকে বেরিয়ে জালঘেরা গাড়িতে শহরের ভিতর দিয়ে আদালতে এসেছিল সে সেদিন সারা পথটা ওই জালে মুখ রেখে চোখ চেয়ে দেখতে দেখতে এসেছিল।

ওঃ কত লোক। ওই রাস্তায় কত লোক কেমন চলেছে। কত আলো কত কলরব। ভুবনপুরের হাট মনে পড়েছিল।

আদালতে বাবাকে দেখেছিল। চিনতে পারে নি তাকে সে প্রথম দৃষ্টিতে। ওই রোগা চোখবসা—এ যেন সেই দুর্দান্ত সবল বাবার প্রেত। কঙ্কাল! সে কেঁদেছিল। তার বাবাও কেঁদেছিল।

আদালতে দাঁড়িয়ে আবার সে বিহ্বল হয়ে গেল। জজ সাহেব জুরী উকিল চাপরাশী কনেস্টবল অনেক লোক দেখে বুক তার ঢিপঢিপ করতে লেগেছিল, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল জোবেদা তাকে মিছে কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছে, প্রৌঢ়া বিবাজ তাকে ঠাট্টা করেছে। এরা সকলেই কিভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে! সকলের দৃষ্টিতে দেখেছিল সে তিরস্কার। কেমন হয়ে গিয়েছিল সে!

একজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি দোষী না নির্দোষ?

সে বিহ্বলের মতই বলেছিল—এ্যাঁ?

—তোমাদের গ্রামের বাসুদেব দোবেকে তুমি বঁটির কোপ মেরে খুন করেছ? পুলিস বলছে—

আর কিছু বলতে দেয় নি সে, সে কথার মাঝখান থেকেই বলতে আরম্ভ করেছিল, হ্যাঁ আমি মাছ কুটছিলাম বঁটিতে। বাসুদেব পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফিয়ে বাবার উপর পড়ে বুকে বসে গলা টিপে ধরেছিল। চাঁপা মাসী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—মরে গেল। বাসুদেব তাকে হাতের ঝটকা দিয়ে ফেলে দিলে—আমি উঠে বঁটিটা নিয়ে পিছন থেকে ওর ঘাড়ে কোপ মারলাম!

তার উকিল কি বলতে গিয়েছিল কিন্তু তাকে বলতে দেয় নি। জজসাহেব বারণ করেছিল। আবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি তাকে মেরেছিলে সে তোমার বাবাকে মারছিল বলে? না তার ওপর তোমার রাগও ছিল?

সে বলেছিল—রাগও ছিল। আমাদের পুকুর জোর করে কেড়ে নিয়েছে সে। জোর করে মাছ ধরাচ্ছিল—আমি ঘাটে সত্যাগ্রহ করে শুয়েছিলাম—আমাকে কাদা মাখিয়ে জোর করে তুলে নিয়ে পথের উপর ফেলে দিয়েছিল।

এখন সে বুঝেছে সেদিন ওসব কথা বলতে হত না। বলতে নেই।

চাঁপা মাসী মিথ্যে কথা বলেছিল একটু। বলেছিল বাসুদেব তাকে ঝটকা মেরে ফেলে দিলে তার জ্ঞান হারিয়েছিল। যখন জ্ঞান ফিরে পেলে তখন দেখেছিল অনেক লোক বাড়িতে। বাসুদেব দোবে রক্তে ভাসছে—পড়ে আছে, তার কাঁধে কোপের দাগ।

তিন বছব জেল হয়েছিল তার।

তিন বছর জেল তাকে খাটতে হয় নি—তু' মাসেব উপব কমে গেছে। খালাস পেয়ে কাল সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরেছে।

জেলখানায় সে অনেক বড হয়ে গেছে। বয়সে বেড়েছে। রূপ তার নাকি আশ্চর্য রূপ হয়েছে। মাজা শ্যামবর্ণ রঙ তার ফর্সা গৌরবর্ণ দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় চাঁপা মাসী বলেছে—কী কইব মাসী! দেইখ্যা মনে লয় যেন কোন রাজকন্যে দাঁড়াইল আইসা আ মরি—মরি—মরি!

বাবাব কথা মনে করতে করতেই সে স্টেশন থেকে নেমে একটা রিক্শা করে এসেছিল বাড়ি। স্টেশনে রিক্শা দেখে একটু অবাক হয়েছিল। এখানে রিক্শা? তাবপর পিচ দেওয়া পথটা। তারপব এক জায়গায় অনেক লরী। রিক্শা ড্রাইভার বলেছিল এটা লরীর আড্ডা। স্টেশন থেকে মাল নিয়ে যায় ভুবনপুর। মিলের চাল নিয়ে এসে পৌঁছে দেয় স্টেশনে। তারপর দেখেছিল লম্বা লম্বা খুঁটির মাথায় তার। শুনেছিল ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে। বাবা শ্রীমন্ত মারা গেছে তু'বছর। জেলেই খবর পেয়েছিল তখন সে বহরমপুর জেলে। প্রথম শোকটা খুব লেগেছিল। ক'দিন অনেক কেঁদেছিল। তারপর জেলের মতই সয়ে গিয়েছিল। ওকে বলেছিল মেয়ে কয়েদী সুষমা। বেশ্যা ছিল সে। মস্ত বড় ডাকাতের প্রেয়সী ছিল। খুন করেছিল সেই ডাকাতকেই। সে ভালবেসেছিল অন্য মেয়েকে। সুষমার বাড়িতে তার সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল ডাকাতির মাল। বারো বছর জেল হয়েছে। বয়সে সে অনেক বড়। তবু ভালবাসত মালতীকে। সে মালতীকে বলেছিল—কাঁদিস নে মালতী। এখানে

কাঁদতে নেই। জেলখানা না গুমখানা। গুম হয়ে থাকবি। কাঁদবি নে। কী হবে কেঁদে!

তবুও সে কেঁদেছিল। থামতে পারে নি। সুষমা বলেছিল—কাঁদতে তো তুই পারছিস? কান্না তোর আছে? আমাদের তো নেই। চোখের জল বোধ হয় শুকিয়ে গেছে।

তাই গিয়েছিল ক'দিন পর। এব মাসখানেক পর চাঁপা যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, বসন্ত সঙ্গে নিয়ে এসেছিল চাঁপাকে—সেদিন চাঁপা কেঁদেছিল মালতী কাঁদে নি। তার চোখ ছিল বসন্তের উপর।

বসন্তের সঙ্গেই কথা হয়েছিল তার চোখে চোখে। বারবার বিষন্নতাকে মুছে দিয়ে ঠোঁটেব কোণে হাসি ফুটে উঠেছিল।

আজ স্টেশনে নামবার আগে বাবাব কথা তাব মনে পড়েছিল।

সেই মনে পড়াটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরেছিল। ইচ্ছে করে চেষ্টা কবে অন্য মানুষ অন্য চিন্তাকে দূবে ঠেলে রেখেছিল। বারবার বসন্ত যেন বাবাকে ঠেলে মনে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু সে তা দেয় নি। এখানকার নানান পরিবর্তন দেখে বিস্ময়—সেও বাবাকে তাব আড়াল করে এসে দাঁড়াতে চাইছিল। চোখের সামনেকার প্রত্যক্ষ বাস্তব লরী ইলেকট্রিক পোস্ট পিচের রাস্তা গার্লস স্কুলের বাড়ি মিলেব চিমনি দত্তদের নতুন মটরকার এগুলোকে তো সরানো যায় না। এরই মধ্যে দিয়ে বাড়ির সামনে এসেও আশ্চর্যভাবে বাবা সব কিছুকে আড়াল কবে দাঁড়িয়েছিল। চোখ দুটোব দৃষ্টি হয় থেকেও ছিল না নয়তো বিচিত্রভাবে ভিতরেব দিকে ফিবেছিল। এ বিচিত্র অভিজ্ঞতা মালতী জেলখানা থেকে নিয়ে এসেছে। হয়তো জেলখানাতে এ সকলেবই হয়। নানান জনের নানান হৈচৈএর মধ্যে অকস্মাৎ চোখের দৃষ্টি বিচিত্রভাবে যা চোখের উপর নেই তাই দেখত। দেখত সে বসন্তকে।

বাড়ির দরজাতেই চাঁপা মাসী সামনেই দাঁড়িয়েছিল। বসন্তকে প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু সে ছিল না। তবু তার জন্যে কিছু মনে হয় নি। অবকাশই হয় নি। বাবা—তার বাবাকেই মনে পড়ছিল। বুকের ভিতরটায় একটা আবেগ যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

চাঁপা মাসীর পরিবর্তন চোখে পড়েও পড়ে নি। কপালে তিলক নাকে রসকলি। চুড়ো করে চুল বাঁধা, গলায় মোটা তুলসীর মালা। চাঁপার

চিঠি থেকে জানে চাঁপা' ভিক্ষে করে 'ধর্মের অঙ্গ হিসেবে। সে ভগবান ভজে।

মালতীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল। মুখে সে সোচ্চারে বাবা বলে কাঁদতে পারে নি। চাঁপা তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবাক হয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে তার হাতে ধরে বলে উঠেছিল কী কইব মাসী! দেইখ্যা মনে লয় যেন কোন রাজকন্যা দাঁড়াইল আইসা। মরি— মরি—মরি!

তার কথার সুরে আশ্চর্য অকৃত্রিম মিষ্টতা ছিল। যেন মধুর মত। মুহূর্তে বাবা মন-থেকে অদৃশ্য হয়েছিল। প্রসন্ন হাসির মত একটি ভাললাগার সুব জেগেছিল মনে। লজ্জাও হয়েছিল। একটু হেসে বলেছিল—বল কী মাসী!

—কী কইব রে কন্যে। মাসী সম্বন্ধ ভুলতে চাইছে মন। মনে সাধ লিছে তোমারে আমাব বাধা কইরা আমি হই সখী বৃন্দা!

মালতী এবার আবও হেসে ফেলেছিল—বলেছিল—মরণ!

॥ তিন ॥

বাকী দিনটায় কোন কথা বিশেষ হয় নি। প্রতিবেশীদের দু' চার জন দেখতে এসেছিল তাকে। তারা তাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। বিস্ময় মালতীর রূপ দেখে আর তার সাজসজ্জার মার্জনা দেখে।

খুন করে যারা সাজা পায় তারা জেলখানা থেকে এমন সেজে গুজে চোখ মুখ নিয়ে ফেরে কী ক'রে।

একজন জিজ্ঞাসা করেই বসল—এই সব কাপড় জামা তোকে দিয়েছে জেলখানায়?

মালতী বলেছিল—আজকাল জেলখানায় যে ভাল খাটনির জন্যে মজুরী দেয়। টাকাটা জমা থাকে। আসবার সময় দেয়। তা থেকেই কিনেছি আমি।

—কী খাটনি তোকে খাটতে দিত? ঘানি ঘোরাতে হত?

হেসে উঠেছিল মালতী।—ঘানি? কেন ঘানি ঘোরাতে দেবে কেন?

মালতী আর ক্যানে বলে না—কেন বলে। তারপর বলেছিল মেয়েদের ঘানি ঘোরাতে হয় না। অন্য কাজ দেয়। কাজ শেখায়।

তাঁতের কাজ, শেলাইয়ের কাজ, শতরঞ্চি বোনাও কেউ কেউ শেখে। পুতুল তৈরীর কাজ আছে। যারা ওসব পারে না করে না তাদের চাল ডাল বাছতে দেয়। বই পড়তে দেয়।

—ও মা! তা হলে তো ভাল। খাওয়াদাওয়ার ভাবনা নাই—দিব্যি সুন্দর রূপ হয়েছে তোর। এ রূপ তোর ঘরে থাকলে হত না।

—যাও না, গিয়ে থেকে এস না, তোমারও রূপ খুলবে।

সে কিন্তু গায়ে মাখল না কথাটা, হেসে বললে—তোর রূপ ছিল খুলেছে। রূপ না থাকলে খুলবে কী করে বল? আমি গিয়ে কী কবব?

মালতী বলেছিল—তোমার মত তো খুলবে! কত্তাব চোখ জুড়োবে।

বয়স হয়ে গিয়েছে লো। আর তোর মত কী বুকের পাটা আছে লো! যে খুন কবে জেলে যাব!

আর একজন মাঝখানে পড়ে বাধা দিয়ে বলেছিল—কী সব কথা বল পাল খুড়ী—ওগুলান কী কথা নাকি? খুন কী ইচ্ছে কবে করে নাকি—না করতে পারে মেয়েছেলেতে? হয়ে যায়! ওসব কথা ছাড়।

ছাড়বে কেন বউদিদি! খুন মেয়েতেও করে করতে পারে। আমাদের সঙ্গে প্রায় একশো-সোয়শো মেয়ে ছিল—তার মধ্যে খুন কবে দশ বছর বারো বছর যাবজ্জীবন জেল খাটছে এমন মেয়ে অনেক ছিল গো।

—বলিস কী?

—হ্যাঁ গো। আর মজাব কথা জান—বেশীর ভাগ খুন করেছে স্বামীকে না-হয় ভালবাসার লোককে! বিষ দিয়ে বেশী—একটা মেয়ে স্বামীর মাথাটা একটা মোটা পাথর দিয়ে ছেঁচে দিয়েছিল।

—হেই মা গো! কী করে দিলে?

—শুধিয়েছিলাম। তা সে হেসে বললে কি করব? দেওরের সঙ্গে আশনাই ছিল যে। সে আশনাই এমন হল যে স্বামী কাঁটা হয়ে উঠল। স্বামী চাকরি করত দু'কোশ দূরে বাবুদের বাড়িতে। সন্দেহ করে রাতে এসে ডাক দিত। দু' একদিন পেরায় ধরে ফেলেছিল। অসহ্য হল। সেদিন ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিল। দুজনায় শুয়ে আছি। সে ঘুমোল আমার

ঘুম এল না। ঘরের দরজায় খিল ছিল না—একটা আধমুনে পাথর ঠেসান দিয়ে বন্ধ থাকত। আমি উঠলাম—ঘুমিয়েছে—এইবার যাব দেওরের কাছে। নড়তেই বলে—কি? দুবার তিনবার। তারপর তখন নাক ডাকছে তার। উঠে বেরিয়ে যাব, দোর খুলতে গিয়ে পাথরটাকে আলগোছে সরিয়ে দোব খুলব—পাথরটা তুলেছি। তুলেই মনে হল—ঘুমিয়েছে নাক ডাকছে—এই সময় দিই না পাথরটা দিয়ে মাথাটা ছেঁচে! দিলাম তাই। তা এক ঘায়েই ঘায়েল—। গোঙাল দু'বার। আমিও আর দু'ঘা দিলাম। তা জান—ওই হারামজাদা দেওরই দিলে সাক্ষী। ছাড়া পেলে তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে!

—ও বাবাঃ! কী সর্ব না—শ!

—কোন্ জাত মালতী?

—জাত্র ছোট বটে তাব। কিন্তু ভাল জাত যাদিগে বল—বামুন কায়েতও আছে। মুসলমানদের মিয়া ঘরও আছে। লেখাপড়াজানাও আছে।

—লেখাপড়াজানা? বামুন কায়েত?

—হ্যাঁ। নির্মলা দিদি বামুনের বিধবা মেয়ে যুবতী মেয়ে—আমাব সঙ্গে খুব ভাব ছিল। তার সন্তান হয়ে গেল বিধবা অবস্থায়। ছেলেটাকে মেরেছিল গলা টিপে। তারপব বেশ ভাল ঘরের গিন্নী ছিল—সধবা লেখাপড়াজানা সুরেশ্বরী দেবী—নিজের ছেলে হয় নি। সতীনপো ছিল—তাকে বিষ দিয়ে মেরেছিল। জোবেদা বিবি মোক্তাব আর মিয়া লোকেব পরিবার। ছেলে হয় নি। স্বামী নিকে করবে ঠিক করেছিল—স্বামীকে বিষ দিয়েছিল। জোবেদা বিবি আচ্ছা মেয়ে। আইন জানে। আমাদের সব দরখাস্ত লিখে দিত। আর—।

সরস স্মৃতি স্মরণের কৌতুকে হেসে উঠে বললে—যা গল্প বলত না রাত্রে। —ওঃ!

—খুব ভাল গল্প জানে?

—শুধু গল্প—নাচ—। নাচত। আর এক আধবুড়ী বেশ্যা ছিল—সে গাইত।

—নাচগান? নাচগান হয় নাকি?

—আদ্ধেক রাত। আমরা জন দশেক এক ঘরে থাকতাম—সে

একেবারে রোজ রাত্রে চলত। ওয়ার্ডার ধমক দিত। জেলারকে বলত। জেলার এসে মাঝে মাঝে বলত—এসব না। এসব না। এসব চলবে না। তা জোবেদা বিবি যা বলেছিল না! হেসে উঠল মালতী। বললে—জোবেদা বিবি মুখের উপর বললে—সাহেব, আমরাও তো মানুষ গো। তার উপর যুবতী মেয়ে। আমাদের যৌবনজ্বালা আছে। গান গেয়ে গল্প করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। তাতেও আপনারা আপত্তি করবেন? জেলার মুখ রাঙা করে চলে গেল। জোবেদা বিবির রেমিশন কাটলে। তাতে জোবেদা বিবির বয়েই গেল!

ওরা অবাক হয়ে গেল শুনে। এবং মালতীকে দেখে।

মালতীর যেন একটা নতুন চেহারা বেরিয়ে এসেছে কখন এই কথাবার্তার অবসরে!

প্রথম জনা প্রবীণা পাল গিন্নীর বিস্ময় চাপা পড়ে গেল, রস-প্রাবল্যের মধ্যে জিজ্ঞাসা করলে—এত সব কয়েদী তো থাকে—সব ডাকাত চোর খুনে—এদের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো পারে? দেখা হয় না লো? মাগোঃ কী করে থাকে এদের মধ্যে লো!—এ্যাঁ—তেড়ে আসে না?

নবীনা বললে—খুড়ী তুমি বাপু কিছু জান না। মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে থাকে নাকি। জেল আলাদা আলাদা। জেলের ভেতরেই মেয়েদের জন্যে আলাদা জেল থাকে।

—বহরমপুরে একটা জেল আছে সেটা শুধু মেয়েদের জন্যে। আরে আরে। এই ছোঁড়ারা এই—।

কয়েকটা ছোঁড়া উঁকি মারছিল। তারা খুনে মালতীকে দেখতে এসেছে সভয়ে উঁকি মেরে দেখছে। মালতী তাদেরই বললে—এই ছোঁড়ার—এই।

তারা পালাল ভয়ে।

মালতী খিলখিল করে হেসে বলল হ্যাঁ আমি খুনে। বঁটিটা এখনও আছে—নাক কেটে দেব। পালা! মধ্যে মধ্যে এখনও খুন চাপে আমার!

বলতে বলতে সে ক্ষোভে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। কী যেন একটা তীক্ষ্ণ কাঁটার মত তাকে বিদ্ধ করেছে ছেলেগুলোর ভয়ার্ত দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে—এই কৌতূহলী মেয়েদের কথার ভিতর দিয়ে। বিদ্ধ হয়তো করেছে

অনেকক্ষণ কিন্তু যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে তাকে ধৈর্যহারা করেছে এই মুহূর্তে। সে উঠে পড়ল। বললে—পাল দিদি আর পারছি না আমি। বাড়ি যাও তোমরা।

ওরা চলে গেলে সে চাঁপাকে বলেছিল—মাসী একগ্লাস জল দাও। তেষ্টা পেয়েছে।

চাঁপার বিস্ময়ের সীমা ছিল না অকস্মাৎ এক নতুন মালতীকে দেখে! কিন্তু সে কোন কথা বলে নি। নীরবে দেখছিল শুনছিল।

খাবার জল দিয়ে চাঁপা তাকে বলেছিল—মাসী একটা কথা বলব?

—কি বল? তোমারও ভয় হচ্ছে না কি?

—না মাসী। আমারে তুমি জান। ভয় আমি পাই না। তাবপবেতে মাসী এই ছুঃখের দিনে গৌরচাঁদে ভইজা ভয়ডব আমার কিছু নাই।

—তোমার গৌর তোমার থাক। গৌরভজা ছাড়া যা বলবে বল!

—বিয়া করবা? মালাচন্দন?

—বসন্তদা' কোথা মাসী?

বসন্ত? আমাব কপাল কন্থে। সি অখন মস্ত বড় লোক গ। লীডাব হইছে। গোটা জিলা ঘুরে বেড়ায়। কলিকাতা যায়। মিটিং করে বক্তৃতা করে। গেবামে দ্যাশে অখন তার খাতির কত!

—এখানে থাকে না?

—থাকে। ছু' দিন চাব দিন। সেই খোকাঠাকুবেব বাড়িটা বিক্রি কইর‍্যাছে মেয়ে ইস্কুলকে। সেখানে তাদের বোর্ডিং হইছে। ওই হাটেব উধারে জায়গা কিন্যা একটা বাড়ি বানাইছে। সেখানে থাকে। সে অখন ইখানকার খবর লিখে খবরের কাগজে।

—কবে আসবে জান?

—তা কি কর‍্যা কই। তবে আসবে—হয়তো কাল আসবে। ঠিক তো কিছু নাই।

—আমাদের বাড়ি আসে না?

—আস্তে। ছু'মাসে এক দিন তিন মাসে এক দিন।

—আমার কথা জিজ্ঞাসা করে না?

—তা করে। সি করে।

—করে ? তবে সেই একবার দেখা করে আর একবারও গেল না কেন ? আমি চিঠি লিখেছিলাম—তারও উত্তর পাই নাই ।

—সে কইছে আমারে । বলে—মালা চিঠি দিছে । দিব আমি জবাব দিব । আর দেখা করতে আমি গেছি, সি কাজ কাজ কইরা পাগল । যায় কখন । তাবে যদি অখন দেখ মাসী তুমি বলব না কি এই বসন্ত সেই জনা । আমি তো মাসী অবে প্রণাম কবি । কি সব কথা বলে ! কিন্তু তার কথা অত কইরা জিজ্ঞাসা করছ—

—সে আমাকে কথা দিয়েছিল মাসী—বলেছিল আমাকে বিয়ে করবে তাব বাবা মাবা গেলে ! আমি ভুবনেশ্বরতলায় ঢেলা বেঁধেছিলাম ।

—মালতী !

চাঁপাব কণ্ঠস্বরে বিস্ময় উৎকণ্ঠা যেন উপচে পড়ল ।

—কেন মাসী ?

—ইটা কী কও ? সে বামুন আমবা বষ্টুম—

—সে তো জাত মানে না মাসী ! তা ছাড়া আমাকে কথা দিয়েছিল ।

—মালা !

—মাসী !

একটু চুপ করে থেকে চাঁপা বলেছিল—সি তুমি ভুল্যা যাও !

হেসে মালতী বললে—ভোলা শক্ত মাসী । এই কাণ্ড ঘটবার আগে সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধবে— । সে অকুণ্ঠিতভাবে সেদিনের কথাগুলি বলে গেল । কোন সংকোচ তাব হল না । একবাবেব জন্যেও কথা মুখে আটকাল না ।

কথাগুলি বলে বলে তাব মুখস্থ হয়ে আছে । কতবার বলেছে সে জেলখানায় কত জনেব কাছে তার হিসেব নেই । নতুন মেয়ে কয়েদী এসেছে —তার কাছে তাব কথা শুনেছে নিজের কথা বলেছে । খুনের ঘটনাটাও বলেছে । কিন্তু তার মধ্যে এই কথাগুলিই সব থেকে ছিল তার নিজের প্রিয় কথা—যে শুনত তার কাছেও মনে হত এই কথাকটিই প্রাণে ধরার কথা । মনে ধরাব কথা ।

কত রাত্রি সে মনে কবেছে বসন্তকে । কোন দিন কেঁদেছে । কোন দিন জেল থেকে বেবিয়ে বিয়ের কল্পকথা তৈরী করেছে মনে মনে ।

গাইগরুটা ডেকে উঠল। চাঁপা বললে—অ মা! সুরভি আইচে। সন্ধ্যা লাগছে লাগে।

উঠল চাঁপা। মালতী বললে—সেই গাইটা?

—না মাসী। স্যা দেহ রাখছে। ইটা তার সেই বড় বেটীটা।

—চল দেখে আসি। বিইয়েছে?

—হাঁ। বকনা হইচে। ভাল বকনা।

—কত দুধ দেয়?

—তা ছাড় স্যার দেয় কন্যে। আজ তোমারে ক্ষীর কইরা দিব।

সে একটা বোগনো বের করে নিয়ে বের হল।

—দু'বেলা দুধ দোওয়াও না কি?

—হ। দুধ গাইটা বেশী দেয়। টেন্যা দুহাইলে দু' স্যার খুব দেয়। তা আমি দুহাই না মাসী। খাক অর কন্যে খাক। তাই সকালে এক স্যার মাপ দেখ্যা বোগনা ভরতি হইলেই ছেড়া দি। তা পরেতে বাচ্চাটা খায়। আমি চল্যা যাই জল তোলার কাজে। চার পাঁচ বাড়ি কাম সের‍্যা ফিরে বাচ্চাটা বেঁধে মাটারে ছেড়ে দিই। বলি যাও মাঠে ঘাস খাইয়া আস। পরের বাড়ি যাইও না লক্ষ্মী। তা অমন বজ্জাত ছিল অর মা, বেটী অমন লয়। কারুর বাড়ি ঢুকে না। পেরথম পেরথম দিগদড়ি দিয়া বেঁধ্যা দিতাম। দেখতাম টাইনা খুটা তুলেও মাঠে পুকুরধারেই চর‍্যা বেড়ায়; কারু বাড়ি মাড়ায় না। তখন থেকে ছেড়্যা দি। সুরভি আমাব পুকুরধারে চরে ঘাস খায়—প্যাটটা অমন কইরা ফিরে আসে ঠিক সময়টিতে। ডাকে। আমি গিয়া দুহাইয়া লই। সোকালের এক স্যার দুধ রোজদাবদের ঘরে দি। ই বেলারটা গোরাচাঁদের ভোগ দি। প্রসাদ পাই। আজ তোমার কল্যাণে গোরাচাঁদে ক্ষীর খাওয়াইব। কইব অরে তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া কইরো না যেন। দুস্ক দিয়ো না।

মালতী হেসে বলল—দুঃখ আমি পাব না মাসী। ওই সাধ্যি তোমার গোরাচাঁদের হবে না। সুখ আমি 'আদায় করে নেব।

—ঠাকুর দেবতারে অই কথা কয় না।

—কয় মাসী! জেলে বসে ওই কথা আমরা রোজ কইতাম। জোবেদা বিবির তিরিশ বছরের জেল হয়েছিল—সাঁইত্রিশ আটত্রিশে খালাস পাবে।

ছেলে হয় নি। যুবতী লাগে। বলে এবার গিয়ে সুখ ঠিক খুঁজে নেব। শেষ না হয় বাঈজী হব।

শিউরে উঠে চাঁপা বললে—ও কথা কয় না মাসী। ছিঃ!

রাত্রিকালে দুজনে শুয়ে জেলখানার জীবনের কথা বলেছিল। তা থেকে এসেছিল ভবিষ্যতের কথায়। চাঁপা বলেছিল—তুমি ভাইবো না মালা মাসী। আমি পাটকাম করি—ভিক্ষা করি। ঘরটা আছে। গাইটা আছে। তোমারে খাওয়াইতে আমি পারব! তারপরে তোমার জেহেল তো যে কারণে হইছে—কি কারণে তুমি কোপটা মারছ সেও সকলে জানে। রূপবতী কন্যা বিয়া তোমার হবে!

মালতী বলেছিল—সে তুমি ভেবো না মাসী। সে আসুক।

—কে? বসন্ত?

—হ্যাঁ!

—মাসী!

—কি?

—কি আর কইব? মনে তো লয় না আমার!

—তা না নিক।

—তা হলে দেখ!

সকালে উঠে বাপের মনিহারী দোকানের পড়ে থাকা জিনিসগুলো দেখতে দেখতে বলেছিল—মাসী, আমি দোকান করব। বাবা যেমন করত।

—দোকান করবা? পারবা?

—পারব মাসী। বাবার থেকে ভাল পারব।

—বাবার থেক্যে ভাল পারবা? বিস্ময় এবং কৌতুক দুই-ই প্রকাশ পেয়েছিল চাঁপার মধ্যে।

—হ্যাঁ। দেখো তুমি। খদ্দেরের ভিড় লেগে যাবে। আমার দরে দর করলেও শেষ যা বলব তাতেই নেবে। বাবা এক পয়সা লাভ করত আমি চার পয়সা লাভ করব। করব না?

—কি কর‍্যা বলব বল?

—আমি মোহিনী মন্তর শিখে এসেছি।

—সত্যি?

—তুমি বড় বোকা মাসী। আগে তোমার বুদ্ধি ছিল। গৌর ভজে

বুদ্ধি তোমার শেষ হয়ে গেছে। আমার মত সুন্দরী যুবতী দোকানদারের দোকানে ভিড় করবে না লোকে ?

চাঁপা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এ কন্যে কয় কী ?

মালতী আবার বললে—হেসে কথা কইলে যে দর বলব তাই দিয়ে জিনিস নেবে।

—মালা !

—কি ?

—তোমার বাক্যি শুইনা ভয় করে মাসী ! এ তুমি কী হইছ গো ?

মালতীর ভুরু কুঁচকে ওঠে, বলে—তার মানে ? কী হয়েছি ?

—তুমি নিজে বুঝতি নার ?

—কী বলছ কী ?

—তুমি বুঝতি পারছ না—কী কইরা বুঝাই ?

মালতী বলেছিল—তোমার সঙ্গে বকতে আমি পারি নে বাপু ! যাই হোক তুমি আমার জন্যে ভেবো না। ভাবতে হবে না। আমি তোমার থেকে অনেক ভাল বুঝি। তোমার পাপ পুণ্যি ধম্ম ও আমার জন্যে নয়। আমার মত জেলখানায় থাকলে বুঝে আসতে। তোমার ঝিগিরি আর ভিক্ষের পয়সায় আমার পেট ভরবে দু'মুঠো খেয়ে। তাতে আমার মন ভরবে না। যাও বকিয়ো না—নিজের কাজে যাও।

বিকেল হতে-না-হতে সে ঝুড়িতে পুরানো পড়ে থাকা মাল নিয়ে হাটে এসেছিল। ধরণী দাসের দোকানের জায়গাটা ধরণী দাস অন্য কাউকে দিয়েছে কি না সে জানে না—দিয়ে থাকলে জোর করে বসবার মতলব নিয়েই এসেছিল। ধরণী দাস তাকে সস্নেহে আহ্বান করতেই কেমন যেন নরম হয়েছিল মনটা। তারপর হাটের দিকে তাকিয়ে পুরনো কথা মনে করে এ মালতী যেন পুরনো মালতী হয়ে গিয়েছিল। বসে বসে ভাবতে ভাবতে হাটটা শেষ হয়ে গেল।

রাত্রি অনেকটা হয়ে এসেছে।

ক'টা ? সাড়ে সাতটা আটটা তো হবেই।

ধরণী দাসকে বললে—আজ চলি জেঠা ! আসছে হাট থেকে আমি বাবার মত এসে বসব কিন্তু। বাবা যা দিত তাই দেব।

ধরণী বললে—মা, তোমার বাবা প্রথমে আমাকে দুশো টাকা দিয়ে

দোকানটার তিন ভাগের এক ভাগের অংশীদার হয়েছিল। তারপরে তোমার মামলার সময় বিক্রি করেছিল—আমি একশো টাকা ধরাট দিয়ে তিনশো দিয়েছিলাম। তা—। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—দেখ আমার ইচ্ছে মেঝেটাকে বাঁধিয়ে পাকা থামটাম গেঁথে ভাল রকম দোকান করি। এর মধ্যে।

—কিছুদিন তো দেন! তারপর না হয় আমি আলাদা চালা করে নেব!

—কত দিন?

—এই দু'তিন মাস!

—দু' তিন মাস?

—দু' তিন মাস ভিন্ন কি করে হবে জ্যাঠামণি? আবদারের সুরে মালতী বলে উঠল।

ভারী ভাল লাগল দাসের। মেয়েটা জেল খেটে তো বড় ভাল হয়েছে। কথাগুলি যেমন মিষ্টি তেমনি সাজানো! ক্ষীণ একটি হাসি তার মুখে দেখা দিল। সে বললে বেশ বেশ মা। তাই বেশ। তাই হবে। তবে বুঝছো তো মা আমিও তো ছা-পোষা মানুষ! তা এমন করে বলছ। তা বেশ।

মালতী মনে মনে বললে—মরণ তোমার! দাঁড়াও না। বসি তো একবার!

দাস আবার বললে—চললে তা হলে?

—যাই। রাত তো অনেক হল।

—হ্যাঁ! তা সদর রাস্তা হয়ে যেয়ো। আলো হয়েছে। ভুবনপুর আর সে ভুবনপুর নাই মা। এই দু বছরে একবারে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে নানান ধরনের লোক! সুন্দরী যুবতী মেয়ে!

মালতীর মুখের ডগায় এল—ওরে বুড়ো! রসিক তো খুব তুমি!

মনে পড়ল জেলখানায় ছিল গোপিনী বলে একটা মেয়ে! তার কাকা তাকে ভোগ করেছিল গোপিনীর খারাপ স্বভাবের সুযোগ নিয়ে। গোপিনী খুব হাসত। হেসেই বলত—ওহে সব দেখেছি। কাকা বাবার সহোদর—চুল পেকেছে—বিধবা মেয়ে আমি—আমি মজলাম বাড়ির চাকরের সঙ্গে কাকা তারপর—।

কথাগুলো গোপিনী বলে যেত খুব রসিকতা করে। তারপর বলল—শোধ তার নিলাম একদিন সব চুরি করে চাকরটাকে নিয়ে ভাসলাম। কপাল আমার! হারামজাদা শহরে এসে মদ ধরলে—তারপর চোর হল। চুরি করে একদিন গয়না আনলে। সেখানা পরতে সাধ হল—রেখে দিলাম। একদিন ধরা পড়ল। তারপর সকালে বাড়ি তল্লাশী। বেরিয়ে গেল গয়নাখানা। শুধু গয়নাটা নয় কাপড় পেলে কিছু। হয়ে গেল জেল। তারপর ঘুরে ঘুরে এই তিনবার আসা হল।

ওরে বুড়ো! মুখে সে বললে—তাই যাব জেঠা!

পথে নেমে মনে হল শিবকে প্রণাম করবে না? পরক্ষণেই মনে হল শিব না ছাই। চলতে লাগল সে গন্ধেশ্বরী বাজার হয়ে।

পথে ইলেকট্রিক লাইট। অনেক দোকানও হয়েছে। ও দোকানটা কার? দ্বিজপদ চন্দের। হেজাক জ্বলছে। ওঃ দোতলা বাড়ি হয়েছে। এপাশে মুসলমান বোর্ডিং। তার পাশে কাটা কাপড়ের দোকানে মেসিন চলছে। তারপর ভকতের কাপড়ের দোকান। তারপর খানিকটা একটু অন্ধকার। রাস্তার আলো ছাড়া দোকানে এখানে লণ্ঠনের আলো। তারপর থানা। এপাশে হোটেল। এখানেও হেজাক জ্বলছে। পথের ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে। বাইসিক্ল চলছে। ঘণ্টা বাজছে। বাবুদের মুখে সিগারেট জ্বলছে। ও বাবা এ যে চায়ের দোকান হয়েছে। হেজাক জ্বলছে। এপাশে ইলেকট্রিক লাইট। এইটেই ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের আপিস। তারপর ময়রার দোকান। এপাশে ওষুধের দোকান। তারপরই আলোঝলমল গন্ধেশ্বরী বাজার। এখানে গোলদারী দোকান বেশী। ওঃ এটা কার দোকান? এত মনিহারী—এত আলো! ও মা কাপড়ও রয়েছে!

—এই—এই! এই শূয়ার! এই শূয়ারের বাচ্চা! এই!

ফোঁস করে মালতী ঘুরে দাঁড়াল। এই এমন করে মেয়েছেলের গা ঘেঁষে যাস। এই!—সে খানিকটা অনুসরণ করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না। ওর কথায় চারিদিকের মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে—হটে যাবার পথ নেই। একজন প্রশ্ন করলে—কী হল? কী ব্যাপার?

—ওই ওই চলে গেল। ওই শূয়ারের বাচ্চা, ওই পাঁঠাটা আমার গা ঘেঁষে এমন করে গেল! হারামজাদা—

—কে রে? কে রে? ধর ধর ধর!

রব উঠল চারিদিকে কিন্তু ধরা গেল না। সে চলে গেছে। কোন গলিপথে ঢুকে গেছে। একজন জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কোথায় যাবে বাছা?

—গাঁয়ের ভেতর। এই গাঁয়ের আমি। আমাকে চিনতে পারছেন না কুণ্ডু মশাই! আমি মালতী—শ্রীমন্ত দাসের মেয়ে!

বৃদ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—তাই তো! শুনছিলাম বটে তুই ফিরেছিস। তোর চেহারাটা নাকি খুব সুন্দর হয়েছে। তা এত সুন্দর তা ভাবি নি রে! তা গিয়েছিলি কোথায় এই রাত্রে?

—কোথায় যাব! হাটে গিছলাম। দোকানের জিনিসগুলো পড়ে ছিল নিয়ে গেলাম।

—দোকান? দোকান করবি নাকি?

—তাই ঠিক করেছি। করতে তো কিছু হবে!

—তা বেশ। হ্যাঁ। যা হয়ে গেল তাতে তো আর সবার মত ঘর সংসার এসব হওয়া কঠিন। মানে বিয়ে টিয়ে তো—। হ্যাঁ তার থেকে দোকান ভাল। তা জিনিস-পত্র দরকার হলে নিস। আমি তো এখন খুব বড় দোকান করেছি! তোর বাবা আমার কাছে নিত। তুইও নিস। এক নিবি এক দিবি।

হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে গান বেজে উঠল। লাউডস্পীকারে গান শুরু হল কোথাও।

মনের রাধার কোন ঠিকানা কোন ভুবনের কোন ভবনে?
বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে!

কুণ্ডু বলে উঠল—সিনেমা ভাঙল রে। ক্যাশ মিল কর। ঘড়িতে ক'টা বাজছে?

—আটটা।

—ঠিক আছে। নে।

মালতী জিজ্ঞাসা করলে—সিনেমা বুঝি এই দিকে হয়েছে?

—হ্যাঁ! ওই সেই গন্ধেশ্বরী বিসর্জনের বাজি পোড়ানোর ডাঙ্গাটায়।

মালতী ওখান থেকেই মোড় ফিরল। এবার তাদের পাড়ার রাস্তা। অবশ্য পাড়ায় পাড়ায় কম যেতে হবে না। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার পথ। তবু এ পথেও আলো আছে।

গানটা বেজেই চলেছে।

কোন নগরে কোন গেরামে কোন বিপিনে কোন বিজনে।

বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে?

বেশ গাইছে। গলাও যেমন মিষ্টি গানটিও তেমনি ভাল। বেশ গান—"মনের রাধার কোন ঠিকানা কোন ভুবনের কোন ভবনে।"

বাড়ি এসে ঢুকল সে, ডাকল—মাসী!

চাঁপা উত্তর দিল—আস! আমি ঠাকুর শয়ান দিতিছি। বস।

সে ঝুড়িটা নামিয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসল। গানটা বাজছে—

ঘুরে দেশে দেশান্তরে

এলাম শেষে তেপান্তরে

রাধার দিশে পেলাম না রে, শুধাইলাম জনে জনে।

বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে?

চাঁপা বেরিয়ে এল। বললে—এমন করে বসলা মাসী?

সে একটু ম্লান হেসে বললে—গান শুনছি!

—বেশ গানটি না মাসী?

—হ্যাঁ ভাল গান। গলাটিও মিষ্টি!

—চা খাবা মাসী? চা করব?

—কর। বলে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

বেশ গানটি, সুরটি গানটি গলাখানি কেমন যেন মনটিকে ভিজে ভিজে করে দিয়েছে।

হায় কি তারে পাবো নাকো

ভুবন খুঁজে এই জীবনে—

মনের চকোর কেঁদে মল

চাঁদ উঠেছে কোন গগনে!—

প্রাণের কথার লেখনগুলি

লিখে লিখে রাখি তুলি,

ডাকঘরে হায় নিলে নাকো ফিরে দিলে ডাক পিয়নে।

বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে?

মনটা কেমন হয়ে গেছে। মনে পড়ছে বসন্তকে। বসন্ত এল না! চাঁপা চা নিয়ে এল। গেলাস ভরতি করে নামিয়ে দিয়ে বললে—খাও!

—দাও।

—মনটা খারাপ ক্যানে মাসী?

—জানি না।

॥ চার ॥

আট দিন পর : পরের শুক্রবারে ভুবনপুরের হাটে মালতী বেশ ভাল করে দোকান সাজিয়ে বসল। বলতে গেলে তার কপাল খুলে গেল।

সোমবার হাটেই সে প্রথম বসেছে। কিন্তু তু' দিনে বেশ গুছিয়ে কিছু করতে পারে নি। শনিবার দিন কুণ্ডুর দোকান থেকে আশি টাকার মাল কিনেছিল তাই দিয়েই করেছিল সোমবারের হাটে দোকান।

কুণ্ডু মশাই পঞ্চাশ টাকার বেশী ধার দিতে চায় নি প্রথমটা। কিন্তু মালতী বলে কয়ে বুঝিয়ে আশি টাকা ধারই নিয়েছে। বেগ তাকে খুব বেশী পেতে হয় নি। কুণ্ডু নিজে থেকেই শেষ পর্যন্ত অনেক বেশী ধার দিতে চেয়েছে। প্রথম ধরেছিল পঞ্চাশ। তার বেশী নয়।

সে বলেছিল—পঞ্চাশ টাকায় কী মাল হবে বলুন! ক'টা জিনিস হবে? লাভই বা কী করব?

কুণ্ডু কেঠো লোক, সে বলেছিল—তা আর আমি কী করব বল!

—আপনারা বলবেন না তো আমি কী করি?

—বিয়েটিয়ে করে ঘর সংসার করগে। দোকান করা কি মেয়ের কাজ?

রাগে নি মালতী। বলেছিল—আজকাল মেয়েতে সব করে। হাকিমিও করে। বলে হেসেছিল।

—তুই তাই করগে।

—লেখাপড়া তো সামান্য জানি। জানলে করতাম। আর বিয়ে আমাকে কে করবে?

কুণ্ডু বলেছিল—তা বটে। কিন্তু তুই টাকা না দিলে আমি কী করব? কিসে নোব? তোর বাবা তো মামলাতেই সব ফুটিয়ে গিয়েছে। বাড়িখানা ছাড়া তো কিছু নাই!

—আমি তো আছি। আমি তো পালাচ্ছি না।

—পালালেই বা ধরে রাখবে কে? যে ইনকিলাব মিনকিলাব করিস? তার ওপর যা চোখ মুখ হয়েছে। ঘরে তাগিদ করতে গেলে বঁটি নিয়ে তেড়ে আসবি। তার ওপর সেই বসন্ত লীডার আছে। বাবাঃ!

মালতী বলেছিল—তবে যাই কুণ্ডু মশায়!

—যাবি?

—যাব না তো কী করব? পঞ্চাশ টাকার মালে কী হবে? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে কী হবে?

—দাঁড়া দাঁড়া!

—দাঁড়াব?

—না, বসবি। এক কাজ করিস তো ধার দোব আমি।

—কি বলুন?

—হাটে যদি মনিহারীর সঙ্গে একটা তেলেভাজা চা সিগরেট পানের দোকান খুলতে পারিস তবে অনেক টাকার মাল দোব আমি।

অবাক হয়েছিল মালতী। বুড়ো বলে কী? কী ব্যাপার? উঁ—বুড়ো চেয়ে তাকে দেখছে—যেন গিলছে! সেই সুশীলা বলত—'দিষ্টি দিয়ে গেলা'। সব—সব—সব রে সব বেটাছেলে। চোখ দেখলেই বুঝতে পারবি।

বুড়ো কুণ্ডু বলেছিল—শোন, ওই শ্রীমতী আগে আমার দোকানে মাল নিত। বুঝেছিস—। আমার সঙ্গে সই সাঁতালি সম্পক্ক পাতিয়েছিল। তা এখন দোকান জমেছে, পাকা ঘর করেছে। গুমোর হয়েছে। মাল আনে এখন ওই সাঁইতে থেকে। সেখানে নিন্দে করে এসেছে—আমি গলা কাটি। এখানে পাঁচজনাকে বলে। মেয়ের দোকান—লোকে ভিড় করে যায়। তা তুই মেয়ে—সুন্দরী মেয়ে যুবতী মেয়ে—তুই যদি দোকান করিস—ওই খাবারের দোকান তো দালান দিবি দেখবি। তোর সৎমা রয়েছে। সে পারবে খাবার তৈরী করতে। একটা ছুটো ছোঁড়া রেখে দিবি। পারবি?

একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইল সে কুণ্ডুর দিকে। বুড়োর মনের রাগটা গলাকাটা অপবাদের জন্যে—না শ্রীমতী সই সম্পর্কটা ভেঙেছে বলে ঠিক বুঝতে পারলে না। কুণ্ডুব এককালে এদিকে নামডাক ছিল রসিক মানুষ বলে। মদ খেতো, মেলা করত। মনিহারীর দোকান নিয়ে যেত মেলায়—তার কল্যাণে অঞ্চল জুড়ে মাসী ছিল পিসী ছিল দিদি ছিল মা ছিল—আবার সই সাঁতালিও ছিল। ছিল অনেক।

কুণ্ডু বলেছিল কি, জবাব দে। পারবি না? এমন চটকের চেহারা তোর!

মালতী ফিক্ করে হেসে বলেছিল—সই পাতাতেও হবে না কি?

কুণ্ডু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুই ছুঁড়ি পারবি। তা দেখ তোর বাবা আমাকে কাকা বলত। সম্পর্কে তুই নাতনী। পাতালে দোষ ছিল না। তবে সে যাক। সে সব দিন গিয়েছে। বয়স সোত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। এ বছরটা কত তা বলতে নেই। আসছে বছর তেয়াত্তর হবে। ও থাক।

—ভয় করছে?

—বড় ফাজিল তুই ছুঁড়ি। না রে কুণ্ডুর ও ভয় নাই। কুণ্ডু কঞ্জুস ব্যবসাদার। বুঝলি। সে জলে নেমেছে, পাঁক কখনও মাখে নাই। তুই সে সব বুঝবি না। বোষ্টুমের মেয়ে হয়ে সই সাঁতালির রসের মর্ম তুই জানিস নে। তোরই বা দোষ কি—সে সব শুকিয়ে গেল। মজে গেল যে!

—শেখান না আমাকে?

—তা বেশ। আগে তোর দোকান হোক। হাটে গিয়ে হাটের ধুলো তুলে তোর কপালে দিয়ে ফাগধুলের মত হাটধুল পাতিয়ে আসব। তা হলে ওই আজ নিয়ে যা—আশি টাকার মালই নিয়ে যা। বিক্রি করে টাকা দিবি—আর ফেবত মাল যা বিক্রি হবে না মনে হবে ফেরত দিবি।

সোমবার সে শুধু মনিহারী নিয়েই বসেছিল। লোকের ভিড় তার দোকানে হয়েছিল। অনেক ভিড়। মালতী বেশ ভাল করে সেজেও ছিল। সাজসজ্জা সে জেলখানাতে শিখে এসেছিল। বহরমপুরে মেয়েদের জেলখানায় শতখানেক মেয়ে-কয়েদী থাকত। ভদ্র শিক্ষিত মেয়ে কম হলেও আট দশ জন ছিল। ক'জন বেশ্যাও ছিল। তার মধ্যে ছিল নীহারদি। লেখাপড়া-জানা মেয়ে। কোন ব্যবসা আপিসে চাকরি করত। টাইপ করত। ওই আপিসের একজন খদ্দের তাকে অনেক টাকা দিয়ে কি সব কাগজ চুরি করিয়েছিল। তার জন্যে নীহারদিকে আপিসের মালিকের ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে হয়েছিল। মালিকের ছেলে বিয়ে করে নি। তার ঘরে গিয়ে তাকে

মদ খাইয়ে তার ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে নিয়েছিল—তার সঙ্গে টাকা আর হীরের দামী আংটি ছিল, তাও নিয়েছিল—লোভ সামলাতে পারে নি। ওই হীরের আংটি থেকেই ধরা পড়েছিল সে। জেল হয়েছিল আড়াই বছর। সে জেলখানাতে এমনভাবে সাজত যে সকলেই তাকে অনুকরণ করত। নীহারদি কালো লম্বা মেয়ে। তার সাজের সব থেকে বাহার ছিল চুলের কায়দায়। চুলে সে তেল দিত না। রুখু চুলগুলি ফুলে ফেঁপে মুখখানাকে ঘিরে পড়ে থাকত। হাতের চাপে চাপে তাকে ঢেউখেলানো করে নিত। নীহারদিদি টিদিরা জন কয়েক উঁচু ক্লাসের ছিল। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস কয়েদী। প্রথম প্রথম মিশত না থার্ড ক্লাসদের সঙ্গে। তারপর কিছুদিন না-যেতেই তারাও এসে ওদের সঙ্গে মিশত। হাসত গাইত। নীহারদি তো নেচেছে পর্যন্ত। নীহারদির কাছে সে পড়ত। নীহারদি তাকে কিছু পড়িয়েছিল। আর তার নাম দিয়ে সব প্রেমের নভেল আনাত। সে পড়ত তারা শুনত। শেষ দিকটায় নীহারদিদিই ছিল তার গুরু। তার কাছে সে অনেক শিখেছে।

সেই নীহারদি'র কাছে শেখা চুলের বাহার—রুখু চুল এলো করে পিঠে ফেলে সে দোকানে বসেছিল। ভিড় এসে জমেছিল। তার বেশীর ভাগ ছোকরা বাবুর দল। কিন্তু এক সিগরেট ছাড়া কিনবার জিনিস তারা পায় নি কিছু। দু' একজন ছেলেদের নাম করে দুটো মারবেল দুটো পেন্সিল কিনেছিল। ইস্কুলের ছোকরারাও ভিড় করেছিল। ইস্কুলের মেয়েরাও এসেছিল। তারা বরং কুম-কুম কাঁটা ফিতে চুলের ক্লিপ কিছু কিনেছিল। একজন ছোকরা বাবু তো তাকে স্পষ্ট করেই বলেছিল—দোকানে কিনব কি গো?

অনেক পিছন থেকে কে বলে উঠেছিল—দোকানদারনীকেই কিনুন না।

—কে রে—উল্লুক ইতর! বক্তা বলে উঠেছিল।

মালতী রাগে নি। সে হেসে বলেছিল—হাটের কথা ধরতে নেই বাবু—ও ছেড়ে দিন!

আবার কে বলে উঠেছিল—ভুবনপুরের হাট বাবা। যাবা? ভুবনপুরের হাট যাবা?

বুকের বেথা নিয়ে যাবা।
দুখের বদলে সুখ পাবা।

মালতী হেসে বলে উঠেছিল—জয় বাবা ভুবনপুরের জয়!

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হেসে উঠেছিল। কিন্তু ভদ্র লোকটির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন—বড় অভদ্র সব এখানে!

মালতী বলেছিল—আপনি রাগ করছেন কেন বাবু! এখানকার হাটের এটা পুরনো ছড়া।

মন কিনলে মন বিকায়
তেতোর বদলে মিষ্টি পায়।

—অনেক বড় ছড়া। তা কিনুন না বাবু, কিছু যা হোক কিনুন। কিছু লাভ করি। ঘরে গিয়ে হিসেব করব, আপনাকে মনে করব।

ধরণী দাস অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রগল্‌ভতা শুনছিল আব দেখছিল। সেদিন যে মেয়েটিকে দেখেছিল এ তো সে নয়। এ আর একজন। এর সংকোচ নেই লজ্জা নেই একেবারে—কি বলবে?—একবারে, কথা সে খুঁজে পেলে না। পেলে খুঁজে।—এ মেয়ে সাংঘাতিক! এ মেয়ে সব পারে!

ভদ্রলোক কিনেছিলেন সব মারবেলগুলো, আর কিনেছিলেন প্ল্যাস্টিকেব সস্তা খোঁপার ফুল। সাঁওতাল মেয়েদের দেবেন। আর মারবেলগুলো বাস্তার ছেলেদের।

সে দিন সবসুদ্ধ টাকা দশেক বিক্রি হয়েছিল। কয়েক আনা কম।

ধরণী দাস হাট ভাঙবার সময় বলেছিল—তুমি পাববে মা।

মালতী হেসে বলেছিল—দেখি জেঠা। তবে মনিহারী চলবে না। এ পাড়াগাঁয়ে ফিরি না কবলে লাভ হবে না। অন্য কিছু করব। আপনার দোকানে বসা হবে না।

—কী করবে?

—দেখি!

হাটের বোঝাটা গুটিয়ে সে উঠেছে এমন সময় ডুগডুগি বেজে উঠেছিল—লাল একটা ঝাণ্ডা উড়িয়ে তিন চারজন ছোকরা এসে মুখে চোঙা লাগিয়ে বলে গেল—মিটিং হবে। কাল এই হাটে জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতার প্রতিবাদে সভা হবে। জবরদস্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলবার উপায় নির্ধারণ করা হবে। কম্যুনিস্ট নেতা বিমল বোস বক্তৃতা করবেন। দলে দলে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করছি।

মালতী একবার যেন চমকে উঠেছিল। মিটিং হবে। সে আসবে না। সে তো কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছে। সে ?

পরক্ষণেই সে বলেছিল—আমি একটু আসছি কাকা। বলেই সে ভাঙা হাটের ভিড়েব মধ্যে মিশে গিয়েছিল। হাট পার হয়ে ভুবনেশ্বরতলার ডাইনে পাশ কাটিয়ে গিয়ে ঢুকেছিল সেই জঙ্গলের মধ্যে। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে গাছটার কাছে। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারে নি। হাত বুলিয়ে দেখতে চেয়েছিল কাঁটা আছে কি না পাতার মধ্যে ডালেব গায়ে। কাঁটা থাকলে সেটা কুঁচলতা হবে। অল্পবয়সী একটা অশথগাছে কুঁচের লতা উঠেছিল—তাতেই সে কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে ঢেলা বেঁধেছিল। কাঁটা হাতে ঠেকেছিল কিন্তু ঢেলাটা আছে কি না বুঝতে পারে নি। একটা টর্চ নিয়ে এলে হত।

ফিরে এসে হাট থেকে বেরিয়ে গন্ধেশ্বরীতলা হয়ে কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে দেখা করে সে বলে এসেছিল—তা হলে আমি ওই দোকানই করি দাছ ?

—দাছ বলছিস ? ছলা করে না সত্যি ?

—এই দেখুন—ছলা করে কেন বলব ?

—বিশ্বাস নেই। জানিস বুড়ো বয়স হলে ছুঁড়িরা ছলাকলা করে ঠকাতে চায়। রাত্রিবেলা—চোখের নজর খাটো। ঠিক তো ধরতে পারছি না মুখ দেখে।

মালতী নিজের মুখখানার উপর ইলেকট্রিক আলোটা পুরো ফেলে বলেছিল—দেখুন।

—উঃ! তুই সহজ পাত্র নস। রাতের আলোয় কালোকে গোরো লাগে তার ওপর বুড়োর চোখে যুবতী মেয়ে! দাছ হব কি না আজ বলব না। কাল বলব। না কাল নয় দশদিন পরে বলব। তবে কাল আসিস। তোর রূপে মজি নাই, তোর মায়ায় গলি নাই। আমার রাগ ওই শ্রীমতীর ওপর, বুঝলি না। বিধবা হল মেয়েটা—চটক ছিল মুখ ছিল আর ছুখ ছিল না। আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। বয়স আমাব ছিল তখন—আর ওই ভালবাসতাম রস মস্করা। লোকে মন্দ বলত ওকে। স্বামীর সামান্য দোকান ছিল। আমার কাছে এসে বলেছিল—বেয়াই আর তো চলে না। ওকে আমি বলতাম বেয়ান; ও বলত বেয়াই। আমি বলেছিলাম—দোকান কর ভাল করে, আমি মূলধন দিচ্ছি ধারে মাল। সেই

কিনা বলে আমাকে বুড়ো! আমি গলাকাটা মহাজন! আমি খুঁজছিলাম যুবতী মেয়ে—মুখোল চোখোল—দোকানে বসলে বোলতার ঝাঁক জমবে—তা না মেনেও তার অধিক খদ্দের জমবে। তোর দুই আছে। তোর বিয়েটিয়ে হবে না। কেউ করবে না। শেষ অটালে অপথে যাবি—তার চেয়ে দোকান কর। কাল আসিস।

এই কথাগুলি ভাল লেগেছিল মালতীর। বুড়ো হুঁশিয়ার বটে—স্পষ্টাস্পষ্টি কথাও কয়। সে বলেছিল—বেশ তাই হল। কাল আসব।

—কি কি লাগবে ফর্দ করে আনিস।

—তা কি আমি জানি দাদু। সে আপনি করে দেবেন।

—এই মরেছে। তোকে বসতে বললে যে গলা জড়িয়ে ধরে বসতে চাস।

—বসলেও ডান দিকে বসব দাদু—বাঁয়ে বসব না।

—বলিহারি, বলিহারি! খুব বলেছিস। তা আসিস—তাই হবে।

পরের দিন সকালে কুণ্ডু কড়াই গামলা পেতলের থালা ঢাকনা হাতা চাকা বেলন বঁটি থেকে সব কিনে দিয়েছিল। মায় একটা ছোট বেঞ্চি একখানা বড় বেঞ্চি, তার সঙ্গে ছোট একখানা টেবিল একখানা লোহার চেয়ার দুটো টুল পর্যন্ত। বড় বেঞ্চিতে রেখে ছোট বেঞ্চিতে বসে লোকে খাবে, মালতী চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কাঠের বাক্স রেখে পয়সা নেবে, টুলে বসে উনোনে খাবার তৈরী করবে। তা ছাড়া দুখানা কাঠের বড় পরাত খান দুই ছোট পরাতও কিনে দিলে। নিজে হাটতলায় গিয়ে ছুতোর ডাকিয়ে বাঁশ কাঠ দিয়ে ফ্রেম তৈরী করিয়ে, বাড়ির থেকে টিন দিয়ে ঘিরে ছাইয়ে দু'দিনের মধ্যে ঘর তৈরী করে দিলে। মেঝের উপর খুব যত্ন করে ইট বিছিয়ে জোড়গুলো সিমেন্টের পয়েন্টিং করে মেরে দিয়ে বললে—নে এইবার কম্‌পিলিট।

প্রথম দিন শ্রীমতী প্রথমটা খানিকটা হতভম্ব গোছের হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে খোদ কুণ্ডুকে দেখে। তারপর ব্যাপারটা আঁচ করে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল—এসব কি হবে?

সেটা মঙ্গলবার দশটা নাগাদ। কুণ্ডু বলেছিল—বাঘের বাড়ি হবে।

—বাঘের বাড়ি? অবাক হয়েছিল শ্রীমতী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বাঘ না বাঘিনী। মালতীর দোকান হবে। মালতী আমার জায়গাটা ভাড়া নিয়েছে। দোকান করবে।

—মনিহারী ?

—চপ কাটলেট সিঙাড়া কচুরি চা—পান সিগারেট। তার সঙ্গে থাকবে দু চারটে মনিহারী। বিস্কুট। পাঁউরুটি।

—হুঁ। তা—। চুপ করে গিয়েছিল শ্রীমতী। তারপর নিজের দোকানে গিয়ে এক অজ্ঞাতজনকে বাক্যবাণে জর্জরিত করবার জন্য চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ শুরু করেছিল।—সেই বলে যে এল্লত যায় না ধুলে। এই বুড়ো বয়স। এই এক বছর বুড়োর পরিবার মরেছে। বাড়িতে আধবুড়ো বেটা গিন্নীবান্নী বউ নাতিপুতি—তার না কি আঠারোবছুরী বষ্টুমী সাজে ? ছি-ছি-ছি ! লজ্জার ঘাটে আর মুখ ধোও নাই। যমের বাড়ি গিয়ে জবাব দেবে কি ?

কুণ্ডু বুড়ো রাগে নি। খিকখিক করে হাসতে শুরু করেছিল।—খি-খি-খি। খি-খি-খি।

কিছুক্ষণ পর চলে যাবার সময় মালতীকে বলে গিয়েছিল—কাজ করিয়ে নে পছন্দ করে। হ্যাঁ! আর খবরদার মেজাজ খারাপ করিস নে। খবরদার।

কুণ্ডুর একখানা রিকশা আছে। সেই রিকশাখানায় চেপে চলে গিয়েছিল। মালতী এবার গিয়েছিল ওই বটগাছ-তলার দিকে যেখানে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কাঁচাবয়সী অশথ-গাছটায় কুঁচলতা উঠেছে। লতাটা ভরে ফাটা শুকনো ফলের মধ্যে দানার মত লাল কুঁচ থরে থরে ধরে রয়েছে। অনেক পাশ ফ্যাকড়া বেরিয়েছে। তার মধ্যে হালের বাঁধা দু দশটা ঢেলা ঝুলছে কিন্তু পুরনো ঢেলা কই ? পিছন দিক দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে। এবার নজরে পড়ল হ্যাঁ রয়েছে ; ঝুলছে পুরানো ঢেলাগুলো ! তারটা ? কই তারটা ? লম্বা মত এক ঘুটিং। বেশ মাঝে খাঁজ আছে। বেছে বেছে পছন্দ করে কুড়িয়ে এনেছিল সে। যেন খসে পড়ে না যায় ! কই ? দড়িটাও শক্ত দড়ি ছিল। তার শক্ত কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে বেঁধেছিল।

ঢেলা খসে পড়ে গেলে বুঝতে হয় সে কামনা পূর্ণ হল না। বাবার ইচ্ছে নয় পূরণ করার। আর না খসলে বুঝতে হয় পূর্ণ হয়নি কিন্তু পূর্ণ হবে। পূর্ণ হলে নিজে হাতে ঢেলা খুলে দিয়ে যেতে হয়।

ঢেলাটা ঝুলছে।

খুশী মন নিয়ে ফিরে এসেছিল সে। পথে সেদিন ভুবনেশ্বরকে প্রণাম

করেছিল—বাবা ভুবনেশ্বর মনের বাঞ্ছা পূরণ করো! তার মনের মধ্যে ভুবনেশ্বরতলার সেই পুরানো গান গুঞ্জন করে উঠেছিল।

শ্রীমতী তখনও বাক্যবাণ বর্ষণ করে যাচ্ছে। এবার তার উপর। বেশ বলে শ্রীমতী। খাসা বলে। ওর তীরগুলো বেঁকে গিয়ে মানুষকে লক্ষ্য বেঁধে। মানুষ পুব দিকে থাকলে ও দক্ষিণ মুখে দাঁড়িয়ে পশ্চিম কোণ মুখে তীরটা ছাড়ে। তীরটা বেঁকে পাক খেয়ে পশ্চিম থেকে উত্তর, উত্তর থেকে পাক খেয়ে পুব মুখে এসে মানুষকে বেঁধে। বুকে বেঁধে। লালঝাণ্ডাওলারা মিটিং করবে ওবেলা—তারা শ্রীমতীর চেয়ে ভাল বলতে পারবে না।

বেশ বলেছে—নব যুবতী, নব যৌবন। তাই ভাঙিয়ে খাবি তো মরতে ভুবনপুরের হাটে তেলেভাজা নিয়ে বসলি ক্যানে? যা না বাবু শহরে যা বাজারে যা! এমন রসিক বুড়ো এখানে একটা—তাও মিন্‌সে গলাকাটা কিপ্‌টে। সেখানে গণ্ডায় গণ্ডায় পাবি!

*　　　*　　　*

শুক্রবার হাটের দিন সকালবেলা দোকান খুলেছিল। আমের শাখা টাঙিয়েছিল। ছুটো কলসী দিয়েছিল জলভরা। তার উপরে ছুটো শুকনো নারকেলও পাঠিয়ে দিয়েছিল কুণ্ডু মশায়। ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাদের একজনকে ডেকে তাকেই প্রথম চা খাইয়েছিল। চায়ের প্রথম খদ্দের হয়েছিল কুণ্ডু নিজে।

চাঁপা মাসীর এতে খুব মত ছিল না। সে বলেছিল—মালা এ তুমি কি করছ আমি বুঝি না। ভাল লাগে না আমার। কুণ্ডু মশায়কে নিয়া ছু দশজনে যা কইত্যাছে তা ভাল না মাসী!

—কি বলছে? কৌতুকভরে সে প্রশ্ন করেছিল। সে তা অনুমান করতে পারে। কুণ্ডু বুড়ো এইভাবে তাকে দাদনের ধারের প্যাঁচে ফেলে শেষ পর্যন্ত তাকেই কিনে বসবে।

চাঁপা বলেছিল—তা তুমি বুঝ না? শুন নাই শ্রীমতীর মুখ?

—শুনেছি। তা দেখি না খেলে।

—না না। ই ভাল না। অর সঙ্গে খেলা যায় না!

—যায়। আমি পারব! আমি খুনে মেয়ে মাসী!

—মালা! হাতজোড় করি তোমারে!

—বেশ, তোমাকে যেতে হবে না মাসী। তুমি যা করছ তাই কর তোমাকে টানব না আমি। কিন্তু আমি এ সুযোগ ছাড়ব না। আমি করব কি বলতে পার? হ্যাঁ। আছে। ওই শ্রীমতী বলেছিল বাজারে গিয়ে রূপ যৌবন ভাঙিয়ে খেতে। বল, তাই যাব?

—খেটে খুটে খেতে পার মাসী। এই তো কাল দে'রা কইছিল—তোমার সখী গোপার বাবা। কইছিল—কিছু শিক্ষা করলে পারত। হাসপাতালের কাজ, সিলাইয়ের কাজ। সরকার থেক্যা সিলাইয়ের কল কিনবার টাকা মিলত। এ দোকান করা—।

—উঁহু মাসী। এ আমার নেশা লেগেছে। তুমি না পার—

—আমার পারা না-পারার কথা না মাসী!

—তবে আমার কি? বষ্টুমের মেয়ের ভিখ মেগে না খেলে অধর্ম হবে?

—তাও না মাসী!

—তবে কী?

—ঠিক বুঝাবারে পারছি না। তুমি এই সব কববা—ঘর-সংসার করবা না?

—ঘর-সংসার? মানে বিয়ে? তা জানি না মাসী।

—তার আশায় তুমি থাইক না।

—না হয় থাকব না।

—না হলি?

—মাসী, গাঁয়ের মেয়েদের ইস্কুল হয়েছে। দেখেছ দিদিমণিদের? তারা ক'জনে বিয়ে করেছে?

—সে আমি ভাবি মালতী? হদিস পাই না।

—আমার হদিসও খুঁজো না মাসী।

—অরা বিদ্যা নিয়া থাকে—

কথা কেড়ে নিয়ে মালতী বললে—আমি এই নিয়ে টাকা নিয়ে থাকব। তুমি বকো না। এখন বল—কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকানের কাজ করবে? না লোক দেখব আমি?

—তোমার কাজই করব মাসী। তোমারে কন্যের মতন, ছোট বোনের মতন পেলেছি। ভালবাইসা ফেলেছি মায়ের মতন। তোমার কামই করব!

বিকালবেলা হাটের সময়। দুপুরবেলা থেকে তারা দোকানে এসে খাবার তৈরী করতে শুরু করেছিল। কুণ্ডু প্রথম দিনের জন্যে একজন ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল যে সিঙাড়া কচুরির কাজ জানে, তেলেভাজা ভেজিটেবল চপও করতে পারে।

শ্রীমতীও তার দোকান বেশ করে সাজিয়েছে। কতকগুলো রঙিন কাগজের মালা এনে টাঙিয়ে দিয়েছে। আর একটা করেছে—ওই আধকানা খোঁড়ার মেয়ে চুনারিয়াকে ফর্সা কাপড়-চোপড় পরিয়ে তাব দোকানে বাহাল করেছে।

চুনারিয়ার বাবার একটা মোটা কালো দড়ির মত পৈতে চিরকাল আছে। বলে—হামি ব্রাহমণ! তার মেটে রঙ—চুনারিয়াব তামাটে রঙ তার কথার সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। সে বামুন না বেদে না কি এ কথা কোন কালে কেউ প্রশ্ন করে নি। আজ সেটাকে কাজে লাগিয়েছে শ্রীমতী। চুনারিয়া রাত্রিকালে সেজেগুজে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, ভুবনেশ্বরতলার অশথ বট বেলের জঙ্গলে—এও সবাই জানে। কিন্তু ভুবনপুরের হাটে ও কথা কেউ তুলবেই না। চুনারিয়া দোকানে চা দেবে বাসন ধোবে। লোককে জিজ্ঞাসা করে বেড়াবে—আর কি লিবেন বাবু? সঙ্গে সঙ্গে মুচকে হাসবে। কিন্তু শ্রীমতীর ভুল। চুনারিয়া ভুবনপুরের হাটে ধুলোর সামগ্রী। ও মানুষের চোখে পড়েও পড়ে না। মালতীর মোহ তার থেকে অনেক বেশী।

টিক্‌লি তার কাছে এসেছিল। বলেছিল—আমাকে রাখ তুমি?

মালতী হেসে বলেছে—কী কববি? তোর হাতে তো কেউ খাবে না!

টিক্‌লি বলেছিল—খাবে না। তবে লোক ডাকব। এই দোকানে এসো। আর এঁটো বাসন ধোব। লোক আসবে। বলে হেসেছিল।

মালতী তাকে নিয়েছে। বলেছে—থাক।

ভুবনপুরের হাট। এ হাটে সব বিকোয়—সব চলে।

চেয়ারে বসে হাটের দিকে তাকিয়ে ছিল মালতী। মনে তার সত্যই একটা নেশা। হয়তো কাজের নেশা। তার সঙ্গে ভবিষ্যতের নেশাও বটে। বেশ লাগছে তার। সকালবেলাতেই চা সিঙাড়া সিগারেট বিস্কুট বেশ বিক্রি হয়েছে। লোক সকালবেলা থেকেই আছে। খদ্দের নয় হাটুরে। গাড়ি করে যারা মাল নিয়ে আসে। ট্রেনে যারা স্টেশনে নেমে মুটে করে, ভাড়াটে গাড়ি করে মাল নিয়ে আসে তারা এসেছে। খদ্দেরও কিছু কিছু

এসেছে। তাদের হাট করা ছাড়াও কাজ আছে। কারুর কাজ আছে থানায়, কারুর কাজ আছে রেজেষ্ট্রি আপিসে, কারুর আছে বি-ডি-ও আপিসে; কারুর আছে ইস্কুলে, কারুর মেয়ে ইস্কুলে। মেয়েরা পড়ে বোর্ডিংয়ে থাকে—তাদের সঙ্গে দেখা করবে। কেউ গ্রাম থেকে চাল যোগায় বোর্ডিংয়ে। সকালে যারা এসেছে, যারা হাটতলার সামনে দিয়ে গেছে তারাই থমকে দাঁড়িয়েছে টিনের তৈরী নতুন দোকান এবং দোকানের দোকানদারনীকে দেখে! একেবারে শহুরে মেয়ে! তারা সকলে এসে চা খেয়ে গেছে। সিগারেট খেয়ে গেছে। কুণ্ডু মশায় হিসেবী লোক। সিগারেট দিয়েছে বিশ বাক্স। আর বেশীর ভাগ দামী সিগারেট। বলে দিয়েছে—সস্তা রাখবি নে মালতী। তোর দোকান সস্তার নয়। টিক্‌লিকে রাখছিস রাখছিস—ওকে সাজাবি নে। ও ঝি—ঝিয়ের মত থাক। হুঁ!

সকালবেলা চল্লিশ কাপ চা বিক্রি হয়েছে। সিগারেট পুরো এক টিন পঞ্চাশটা সিগারেট। বাক্সও চার বাক্স। বাক্সের সঙ্গে টিনও কটা দিয়েছে কুণ্ডু। টিন হলে ইজ্জত বাড়ে, আর খোলা খুচরো সিগারেট বেশী বিক্রি হয়। হিসেবটা বুঝিয়ে দিয়েছিল কুণ্ডু।

আলুওয়ালারা গাড়ি থেকে বস্তা নামিয়ে ঢেলে চুড় দিয়ে সাজাচ্ছে। তামাকওয়ালারা এসে গেছে। কাটোয়ার ফলওয়ালারা টবের বাক্সের ওপর ফল সাজাচ্ছে। ফিতে কার ক্লিপ ফিরিওয়ালা এসেছে। তারা গাছতলায় বসে বিড়ি খাচ্ছে। তাকাচ্ছে তার দোকানের দিকে। টিক্‌লি তাদের মধ্যে মধ্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শ্রীমতীর ওখান থেকে চুনারিয়াও ডাকছে। হাসছে। এই একদল আট দশজন হাটুরে বোঝা মাথায় এসে ঢুকল। পাশের গাঁয়ের নামকরা চাষীর দল। ভুবনপুরের হাটে ওদের বেগুন মূলোর জন্যেই বেগুন মূলো বিখ্যাত।

চাঁপা মাসী বললে—মাসী অই আকুলের মাঠের বেগুন আইল। বেগুনীর লাইগা বেগুন কিন্যা লও। লম্বা গোল বেগুন। লম্বা ফালি গোল চাকতি দুই ভাল হবে।

মাসীর নেশা ধরেছে। প্রথম এসে চুপচাপ কাজ করছিল। মধ্যে মধ্যে থমকে কাজ বন্ধ করে কিছু ভাবছিল। এখন সে ঘোর কেটে গেছে। কথা বলছে টিক্‌লিকে। বরাত করছে। কাজ করছে।

সে বললে—যাও না। বেছে পছন্দ করে নিয়ে এস।

ওই এল চ্যাটাইওয়ালারা। ওই ওরা মুসলমান মেয়ে খেজুর চ্যাটাই আনছে। ওই মোড়া ঝুড়ি ঢুকছে।

মাসী টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মালতী বললে—শোন।

—কী ?

—ঝাল দেখে লঙ্কা এনো। আর—

—কও।

—দুখানা রঙকরা খেজুর চ্যাটাই আর মোড়া—তা সে হাটের শেষে কিনলেই হবে।

ওই আসছে মনিহারীওলা একজন। পুরানো লোক—তার বাপের আমলের। ও-ও মাছ ধরবার সরঞ্জাম বেচত। এখনও বেচে। ওই ধরণী জেঠা। ওই জামা কাপড়ওয়ালারা ঢুকছে। ওই ঢুকছে বইওলা দুজন। ওই রঙীন পট ছবিওলা। ওর কাছে খানকয়েক ভাল মেয়ের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার কিনতে হবে। টাঙিয়ে দেবে টিনের দেওয়ালের গায়ে গায়ে। ওই ঢুকছে আর একদল হাটুরে। ওই দুখানা গাড়ি লাগছে। কুমড়ো লাউ বোঝাই গাড়ি—এরা সব ময়ূরাক্ষীর ধারের। ওই বাঁধাকপির গাড়ি। এবার হুড়হুড় করে ঢুকছে হাটুরেরা। ঢুকবার মুখেই থমকে দাঁড়াচ্ছে—হাটের মাটিতে আঙুল ঠেকিয়ে এই ধুলোমাখা আঙুল কপালে ঠেকিয়ে হাটে ঢুকছে। ছুটে ঢুকছে। ভাল জায়গা দখল করবে। এরা সব মুসলমান। ভাল ভাল চাষী। আর ব্যবসাতেও খুব সৎ। ওদের মাল অবিক্রি যায় না। প্রবাদ থাকলেও আজ আর ভুবনপুরের হাটের সে নিয়ম নেই যে অবিক্রি মাল হাটের মালিকেরা কিনে নেবে।

ওই একদল সাইকেল চড়া খদ্দের এল। সব সাইকেল ধরে হাটে ঢুকছে। রাখবে ওই কাঠের দোকানের সামনের বটতলায়। শেকল জড়িয়ে তালা দিয়ে রেখে হাটে ঢুকছে। ওই ওরা এই দিকে তাকাচ্ছে। তাকে দেখছে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটল তার। একটু সরস কৌতুক মনের জমিতে ঘাসের পাতার মত গজিয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। এলোচুলের রাশিটাকে একবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে সামনেটায় হাত বুলিয়ে ঠিক করে নিলে। কাঁধের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে আবার বসল।

পিছন থেকে টিকুলি বললে—ওই একদল আসছে।

—দেখ চায়ের জল ঠিক ফুটছে কি না।

কয়লার উনুনে মস্ত একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেকচিতে জল ফুটছে চায়ের। টিকৃলি বললে—টগবগ করে ফুটছে জল।

মালতী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে—কড়াই চড়াবেন ঠাকুর মশায়, না যা ভাজা আছে তাই দেবেন ?

ঠাকুর বললে—ওই ঠিক আছে। কড়াই তো এই নামিয়েছি।

এক সঙ্গে আটজন এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। মালতী বললে—আসুন !

তারা এসে বসে পড়ল বেঞ্চের উপর ! বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি হচ্ছে, একজনের জায়গা হচ্ছে না।

মালতী নিজের চেয়ারখানা এগিয়ে দিলে। —বসুন

যে দাঁড়িয়েছিল সে বললে—নতুন দোকান করলেন ?

—হ্যাঁ। আপনাদের ভরসাতেই করলাম।

ছোকরা বিগলিত হয়ে বললে—নিশ্চয়। আমরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই তে বলছিলাম। পুরানো দোকানটা ওই শ্রীমতীর—ওটা নোঙরা। এখানে আর দোকান ছিল না বলেই খেতাম। সুন্দর দোকান করেছেন। বেশ পরিষ্কার।

হাসি পাচ্ছে মালতীর। সে হাসি চেপেই বললে—কী দেব ?

—চা দিন তো আগে।

—না, একটা করে সিগারেট দিন আগে। বাঃ ক্যাপস্টান রেখেছেন গোল্ডফ্লেক রেখেছেন। দিন একটা করে ক্যাপস্টান দিন।

—আর খাবার ? চপ আছে। দেব ?

—চপ ? বাঃ ! ওদের বেগুনী তেলেভাজা সার। দিন দিন !

টিকৃলি ফিকফিক করে হাসছে। একজন বললে—আরে এ কী করছে এখানে ?

—ও এঁটো বাসন ধোয়।

—খাবার ছোঁয় না তো ?

—না না। গরীব মেয়ে—

—গরীব ?

—ক্যানে গো ? আমি বড়লোক নাকি ? উঃ টিকলি বলে উঠল। তারপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল—উঃ আমি ছোটলোক। টিকৃলি ছোট জাত—

—এই চুপ ! যা এখন বাইরে বোস। যা !

টিকৃলি বাইরে গিয়ে বসল।

হঠাৎ হাটের কলরব ছাপিয়ে গ্রামোফোন বেজে উঠল।

> ভুবন হাটে সওদা এনে আমার হারালো মূলধন!
> তেল লবণেব পোঁটলা বাঁধলাম হারালাম রতন।
> সখি বে—খুঁজে পাই না আমাব মন।

কোথায় বাজছে? প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে খুঁজতে লাগল মালতী, কোথায় বাজছে গ্রামোফোন? শ্রীমতীব দোকানে? টিকৃলি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে—তাই। ওখানেই বাজছে।

ও। শ্রীমতী গ্রামোফোন বাজিয়ে খদ্দের টানছে। হাসলে সে।

যতই বাজাও শ্রীমতী, তোমার মূলধন হারিয়েছে সজনী! সে কথা বলে কাতরালেও লোকেব মায়া হবে না।

> হাটে এসে ঘাটে বসলাম ঝাঁপ দিলাম জলে—
> এক ডুবেতে মানিক পেলাম (তাতে) রূপ যৈবন ঝলে।
> ফের ডুবে হারাল মানিক গেল রূপ যৈবন—
> আমার হাবাল মূলধন।
> ভুবন হাটে সওদা এনে আমার হারাল মূলধন!
> শূন্য হাটে কেঁদে কেঁদে গেল রে নয়ন!

একজন বলে উঠল—সেই! মনের রাধার! নবীন বাউল!

—মনের রাধা?

—নিশ্চয়ই।

—ওর তো 'মনের রাধা' একখানার কথাই জানি!

—এটাও। বাজি রাখ। বেশী না—একবাক্স সিগারেট!

ওদিকে সামনে খদ্দের এসে দাঁড়িয়েছে। ছোকরারা বেশ! ওঠবার নাম নেই! কথাগুলো বলছে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। মালতী হাসলে। বেশ লাগে! খারাপ লাগে না। কিন্তু বেশ লাগলে তো চলবে না। সে টিকৃলিকে বললে—বসে কী করছিস? গান শুনলে চলবে? বাসনগুলো ধুয়ে ফেল। নতুন খদ্দের এসেছে। শুনছিস!

টিকৃলি এসে দাঁড়াল বেঞ্চির সামনে। মালতী নতুন খদ্দেরদের বললে—এই যে এঁদেরও হয়ে গেছে। একটু দাঁড়ান। ওঁরা উঠুন।

বাধ্য হয়ে তারা উঠল। নতুন খদ্দের এসে বসল। টিক্‌লি খাবার বেঞ্চের উপর ন্যাতা বুলিয়ে দিল। ওরা একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। বুঝলে মালতী। সে বললে—দাঁড়ান আমি একবার মুছে দি। এগিয়ে গেল সে। একজন বলে উঠল থাক থাক এই হবে।

—হবে? দেখুন! না হয় তো আমি আর একবার মুছে দি।

একজন বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ শহরে যারা চা দেয় দোকানে তাদের জাত কে দেখে? আর জাত গিয়েছে বাবা। সাহেবরা জাত মারা আরম্ভ করেছিল—দেশ স্বাধীন হয়ে খতম হল। নাও বস।

—কি দেব? খাবার কিন্তু টিক্‌লি ছোঁয় না। ওসব ঠাকুর তৈরী করছে। আমরা দিচ্ছি!

চাঁপা বেগুন ফালি করছিল, সে বললে—আমরা খুব শুদ্ধ করে সব করি। আর বষ্টম ব্রাহ্মণের দাস। আমাদের হাতে খাইতে দোষ কি। তা ছাড়া ই তো তাও লয়।

প্লেটে চপ সাজাতে লাগল মালতী। কড়ায় বেগুনী ভাজা হচ্ছে। ওরা বেগুনীর বরাত করলে।

ওদিকে হাটে গোলমাল উঠল। দুটো লোকের মাথার চুল ধরে টানছে চাল-ধানের কারবারী বামুনদের ছেলে জগন্নাথবাবু। টেনে হাটের বাইরে নিয়ে যাবে। লোকজন সেই দিকে তাকিয়ে আছে। কতক লোক হাট-করা ছেড়ে ওই দিকেই চলছে।

কি হল? মালতী তাকিয়ে রইল। খদ্দেররাও ওই দিকে তাকিয়ে খেতে লাগল। টিক্‌লি ছুটে বেরিয়ে গেল।

মালতী হেঁকে বললে। শিগ্‌গির ফিরবি টিক্‌লি!

দোকানের ভিতর থেকে একজন খদ্দের হাটের একজনকে জিজ্ঞাসা করলে —এই সুরন্দ, কি হল হে?

সুরন্দ দোকানের সামনে দিয়েই যাচ্ছিল, সে দাঁত মেলে হেসে বললে —পিক্‌পকেট। পকেটকাটা! হাতে হাতে ধরেছে জগন্নাথবাবু।

—মার—মার শালাদের। এল কোথা থেকে? এখানকার?

—না, হিন্দুস্থানী। বেটারা হাটে হাটে ঘোরে। আজ সকালে ট্রেনে এসেছে বোধ হয়। ফিতে কারওয়ালা একজন বলছিল—পরশু সাঁইতেতে দেখেছে। সাঁইতের হাটে সেদিন একজনের আশী টাকা গিয়েছে। ওই বেটারাই নিয়েছিল।

মালতী চুপ করে বসে রইল। তার জেলখানার কথা মনে পড়ছে আধবয়সী ভুবন আর ছুকরী সন্ধ্যা পকেটকাটার দায়ে জেলে এসেছিল গল্প কবত তাবা। জেলখানায় কেউ লুকোয় না কিছু।

খুব জটলা হয়েছে লোক দুটো আর জগন্নাথবাবুকে ঘিরে। হঠাৎ কানের এপাশ থেকে ডুগডুগি বেজে উঠল। খুব জোরে বাজাচ্ছে। বাজিকরদের ডুগডুগিব মত। ঘাড ফিরিয়ে দেখলে মালতী। বাজিকরই বটে। একটা ভালুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমগাছতলায।

—ওরে বাবা! জান মালতী দিদি! ওদের তিন রকম পোশাক পরা।

টিক্‌লি ফিরে এসেছে। খদ্দেব একজন জিজ্ঞেস কবলে—তিন বকম কি?

টিক্‌লি বললে—ওই তো ওপবে পাজামা—তাব ভিতবে হাফ পেণ্টল—তার নিচে কাপড় পবে আছে!

—কি পেলে?

—মেলাই জিনিস পেয়েছে। পুলিসে দেবে!

—আবার পুলিসে ক্যানে বে বাবা—ভুবনেশ্বরের দরবাবে। এখানে তো নগদানগদি শোধ হল বাবা। দুখেব বদলে সুখ, মনেব বদলে মন। চুরির বদলে মাব। সে তো পেয়ে গেল। আবার পুলিসে ক্যানে।

—তা যাই বল তুমি। ভুবনেশ্বরের হাটেব সে মাহাত্মি এখনও আছে। সেদিন সুখো ঘোষাল কাঁদছিল মেয়ের বিয়ে ভেঙে গেল বলে। কেমন তো! কাল সুখো ঘোষালেব সঙ্গে দেখা। খুব ব্যস্ত হয়ে চলছে। আমি মাঠে ধান কাটা দেখছি। জিজ্ঞাসা কবলাম—ঘোষাল, কোথা হে এমন হনহন করে? বেশ ফুর্তি ফুর্তি লাগছে! তা ঘোষাল একগাল হেসে বললে—তা ফুর্তি বটে ঘোষ। মেয়ের বিয়ে পাকা হয়ে গেল—একবারে বাবাব থানের সিঁদুর নিয়ে লগ্নপত্র করে লিখে দিয়েছে। হাতজোড় করে পেনাম করে বললে—বাবার মাহাত্মি মিথ্যে লয় ঘোষ। সেদিন হাটে গেলাম—বাবার ওখানে খুব কাতর পেনাম করে বললাম—বাবা, তোমার এখানে কন্যে দায়ে পড়ে এসেছি তুমি উদ্ধার কর। তারপরেতে গন্ধেশ্বরীতলায় বাজারে দে'দের দোকানে চাটুজ্জের সঙ্গে দেখা। দে মশায় জানত ব্যাপাবটা। সে মাঝখানে থেকে পড়ে কথা বলে দিলে পাকা করে। চাটুজ্জের ছেলে ওর এক মাস্টারনীকে দেখে মনে মনে ক্ষেপেছিল—তাকেই বিয়ে করবে। চাটুজ্জে আমার কাছে পেকাশ করে নাই কিন্তু বলে ফেললে দে'কে। দে ওর ছেলেকে

ডেকে বুঝিয়ে ধমক দিয়ে রাজী করে বললে—চাটুজ্জে পাকা করে ফেল আজই। লগ্নপত্র করে সই করিয়ে দিয়ে বললে—চলে যাও বাবার থানে। সিঁদুর লাগিয়ে লিয়ো। তা দে'র কাছেই যাব। এক বাকুড়ি জমি আছে আমার দে'র জমির পাশেই—সেটা বিক্রি করতে হবে বিয়ের জন্যে—তা ওঁকেই দোব আমি। তাই চলেছি ভাই।

তা হলে জমি মাহাত্ম্য—বাবা মাহাত্ম্য ক্যানে বলছ?

—বলব নাই বা ক্যানে হে? বাবা মাহাত্ম্য না থাকলে তোমার সেই বাঁধা ঢেলা খসে পড়ে যায়? বাবা তা পূরণ করবেন ক্যানে? পরের ঘরের বিধবা কন্যে—

—এই দেখ, খবরদার! মুখ সামলে কথা বলো! তুমি দেখেছিলে আমার ঢেলা-বাঁধা?

—তুমি নিজে বলেছ আমাকে! বল নাই?

—না। চীৎকার করে উঠল লোকটি।

—হ্যাঁ। বলেছ। এ লোকটিও সমান জোরে চীৎকার করে উঠল। এ লোকটি উঠে পড়ল। মালতীর কাছে এসে বললে—একটা চপ এক কাপ চা। কত? সে ফেলে দিলে একটা সিকি।

মালতী মনে মনে হাসছিল। খুচরো পয়সা হাতে নিয়ে বললে—সিগারেট দোব?

—না। পয়সা নিয়ে চলে গেল। কিছুদূর গিয়ে সে ফিরে এসে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বললে—তুমি? তুমি এ দোকানে যে চা চপ খেতে টেনে এনে ঢোকালে সে কথাটা বলব?

এ লোকটি বললে—বল না! তুমি কেন, আমিই বলছি। বললাম দোকানটি ভাল—দোকানদারনীটি আরও ভাল। চল সুন্দর মেয়ের হাতের চা খেয়ে আসি। কি গো আমি খারাপ কথা বলেছি? এটা খারাপ কথা হল? তুমি কিছু মনে করলে?

মালতীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তবু সে বললে—না না। এ খারাপ কথা হবে কেন? আমি কিছু মনে করব কেন?

চাঁপা বললে—দুঃখী কন্যে বাবু—আপনারাই ভাই বন্ধু বাপ জ্যাঠা। আপনাদের ভাল লাগে সিটা তো অর ভাগ্যি!

—ঠিক কথা। আমি ঢেলা বাঁধতে যাচ্ছি না—

ভালুকওলা এসে সামনে দাঁড়াল দোকানের। চা মিলবে?

আশপাশেব লোকেরা বিশেষ করে একদল মেয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল—মা রে!

—ডর নেহি মা। কুছু বলবে না।

—তা হোক। সরাও তুমি! আর চা কাপে মিলবে না—তোমার কিছু আছে? আমাদের আজ ভাঁড় নেই।

—এই সর হে। ওহে বনকে ভালুকওয়ালা। ভালুক সরাও বাবা!

চাঁপা বলে উঠল—সরকার মশয়। ভূতি সরকার মনে লাগে?

হ্যাঁ ভূতি সরকারই বটে। পায়ের নিচের দিকের কাপড় হাঁটুর কাছে তুলে গুঁজে, ফতুয়া গায়ে দিয়ে কালো নধর চেহারা ভূতি সরকার এসে ঢুকল।—চিনতে পারিস তো মালতী? আরে! তোকেই চিনতে কষ্ট হচ্ছে! বা বা বা—এ তুই খাসা হয়েছিস রে! রাস্তায় দেখলে মনে হত শহুরে মেয়ে বুঝি! বা বা! আমি তো ছিলাম না এখানে, ছিলাম বর্ধমানে। তোর সখী গোপাব সম্পত্তি নিয়ে গোল বেধেছে, গোপার বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সে অনেক হাঙ্গামা। তা আজ নেমেই শুনি তুই এসেছিস—শুধু আসা নয় হাটে রেস্টুরেণ্ট করেছিস। আর গাঁ তোলপাড় করে দিয়েছিস। গোপাও যে এল আমার সঙ্গে। সে বিধবা হয়েছে শুনেছিস তো?

তা মালতী জানে। বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই বিধবা হয়েছে। চাঁপা বলেছে। সে জানে। খুব দুঃখ সে পায় নি। সে খুশী হয়েছে—বিধবা হলেও গোপা আজ বউ—তার ঘর আছে বাড়ি আছে। চাঁপা বলেছে বেশ ভাল ঘরের বউ গোপা!

গোপার ভাসুর ভোটে জিতেছে—আইন সভার সভ্য হয়েছে। তাকে জিতিয়ে দিয়েছে বসন্তদা। এই ভোটে জিতে বসন্তদা'র নাম হয়েছে। লীডার হয়েছে।

ভাসুরের সঙ্গে গোপার স্বামীর খুব বিবাদ ছিল। সে সব সে শুনেছে।

মালতী সরকারকে আহ্বান জানিয়ে বললে—আসুন বসুন।

চাঁপা বললে—সরকার মশয়ের গুণের কথা চিরকাল মনে থাকবে।

তোমার সাথে তিনবার দেখা কবছি জেলে, উনিই লিখে দিয়েছেন দরখাস্ত। তিনবারই।

সরকার বললে—তা কি বেশী করেছি কিছু। বসল সরকার।

মালতী বললে—চা খাবেন তো?

—খাব না? তা নইলে ঢুকলাম ক্যানে দোকানে? দে চা দে। চপ দে! আর ও কি ভাজছে—বেগুনী? দে ও-ও দে চারটে।

চপ ভেঙে মুখে দিয়ে বললে—বেশ হয়েছে খাসা হয়েছে। আর বেশ করেছিস এ রেস্টুরেন্ট করেছিস। তুই দোকানে বসলে খুব বিক্রি হবে।

তা মালতী জানে।

—বুদ্ধি তো কুণ্ডুর। খলিফা লোক। ওর সঙ্গে দলিল টলিল কিছু করেছিস নাকি? দেখাস! ওই দেখ একদল ইস্কুলের ছেলে আসছে। ঠিক এখানে আসছে দেখিস। আমি উঠি। বেগুনী বরং ঠোঙায় দে বাড়ি নিয়ে যাই।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করলে—গোপার কি হল সরকার মশয়?

—কি হবে? থানা পুলিস করে গোপাকে নিয়ে এলাম। মামলা দায়ের হল।

—গোপা এসেছে? মালতী প্রশ্ন করলে।

—হ্যাঁ। সে কি সোজা ব্যাপার? ওর ভাসুর আবার এম-এল-এ। কড়ালোক বড়লোক। তা আমিও ভূতি সরকার। মামীমার খেল জানি। তবে বসন্ত আমাদের বসন্ত, খুব করেছে। খুব। ভারী তেজী ছোকরা। সে খুব করেছে, খুব বললে। খুব করলে। বলতে গেলে গোপার ভাসুর এম-এল-এ হয়েছে সে তো ওরই জোরে অনেকটা! টাকা থাকলে তো ভোট মেলে না। সে বলব পরে। তোমাদের খদ্দের এসেছে।

সত্যিই খদ্দের এসেছে—দল বেঁধে ছেলেরা ঢুকছে। দশ বারো জন। মালতী কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বসন্তের কথা জিজ্ঞেস করা হল না। বসন্ত? কোথায় সে? সে খুব করেছে। খুব বলেছে! সে এল না—তাকে দেখতে এল না? খদ্দেররা কথা বলছে। মালতীর খেয়াল নেই। সে সামনে হাটের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। গোপা। বসন্ত। বসন্ত গোপা! কেমন সব যেন, ঘষা কাচের ওপারের মত দেখা যাচ্ছে না!

—মালতী।

মালতী উত্তর দিল না।

—খদ্দের আসছে।

মালতী বললে—দেখ মাসী কি চাই।

চাই সবই চাই। ছেলের দল; বেগুনী খাবে চপ খাবে শিঙারা খাবে, চা খাবে। দু একজন ছাড়া সকলেই প্রায় সিগারেটও নেবে।

চাঁপা ঠাকুরকে বললে—আপনিও হাত লাগান ঠাকুর!

ঘষা কাচের ওপারের মত সব মিলিয়েই যাচ্ছে না, জেলখানার পাঁচিলের ঘেরার মধ্যে যেমন বাইরের শব্দও আসত না তেমনি শব্দও শুনছে না মালতী।

বসন্তদা। বসন্ত গোপা! বসন্ত গোপার জন্যে অনেক করেছে!

এরই মধ্যে শুক্রবারের হাট শেষ হয়ে গেল।

চাঁপা বললে—মালতী। কি হইল তোমার? উঠ।

—ও হ্যাঁ। বাড়ি যেতে হবে। কই সেই লোকটা এসেছে? যে রাত্রে থাকবে?

—আসছে। ওই তো বইসা রইছে বাইরে।

—টিক্‌লি কই?

—অ—মাঃ। সি সন্ধ্যা হইতে ধাও। উ দুকান থেক্যা চুনারিয়া ইখান থেকে টিক্‌লি দুই জনই ভাগছে সেই সন্ধ্যাবেলা। ডাকিনীর মতন। ঘুরছে কোথা

—হুঁ।

হাটের বাতি নিভছে।

শুধু মাঝখানে পোতা খুঁটিতে একটা ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে। এত বড় হাটের মধ্যে কেমন আবছা আবছা মনে হচ্ছে। হাটুরেরা প্রায় চলে গেছে। যাদের গাড়ি আছে তাদের গাড়ি বোঝাই হচ্ছে। ধরণী জ্যাঠার চালা অন্ধকার। চলে গেছে ধরণী জ্যাঠা। হঠাৎ তার মনে হল—ভুল হয়ে গেছে, ধরণী জ্যাঠাকে চা খাওয়ালে হত ডেকে। কিছু বেগুনী চপ ঠোঙায় মুড়ে দিয়ে এলে বুড়ো খুশী হত।

বসে বসে সে গুনে গুনে টাকা পয়সা থাক্ করে সাজালে। জুড়লে কাগজে লিখে! ষাট টাকা দশ আনা তিন পয়সা।

বাঁধলে সে টাকা থলেতে পুরে।

কিছু খাবার রাত্রে দোকানে শোবার লোকটিকে দিয়ে আর একটা ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বললে—এটা টিক্‌লিকে দিয়ো।

চাঁপা বললে—মালা!

—মাসী!

—না, চল পথে বলব।

পথে নেমে দুজনে পথ চলতে চলতে হঠাৎ চাঁপা আবার বললে—টিক্‌লিটারে কাল জবাব দিয়ো। অবে কাজ নাই। মেয়েটা ভাল না।

—ভাল আর মন্দ মাসী। তার সঙ্গে আমাদের কি বল?

—তুমি কিচ্ছু বুঝতে পার নি?

—কি?

—টিক্‌লিটার বাচ্চা হবে?

—বাচ্চা হবে?

—হ্যাঁ। পোয়াতি মাইয়াটা। কোথা আমাদের দোকানে আতুর ঘর কইবা দিবে! না!

—হ্যাঁ। তা সত্যি। তবে মাসী ওর মায়ের ঝুবড়ি আছে গাছতলা আছে—আমাদের দোকানে আসবে কেন?

ছুঁত পবিত আছে মাসী—

হেসে উঠল মালতী। তারপর হঠাৎ সে চুপ হয়ে গেল! বললে—থাক মাসী—ভাল লাগছে না। মন তার আবার সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেন শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

বসন্ত! বসন্ত গোপা! বসন্ত একবার এল না! বসন্ত গোপার জন্যে অনেক করেছে! সব মিথ্যে। ভুবনপুরের হাটের কথা মিথ্যে ভুবনেশ্বর মিথ্যে। দুখের বদলে সুখ তেতোর বদলে মিষ্টি মেলা দূরের কথা এখানে কিছুই মেলে না। বসন্ত গোপার জন্যে অনেক করেছে। আর সে সাত দিন এসেছে—একবার এলও না!

॥ পাঁচ ॥

—অনেক কিনা হিসেব করি নি। তবে হ্যাঁ করেছি বই কি, আমার যা করা উচিত, যা পারি, তাই করেছি। বসন্ত নিজেই বললে।

তিন দিন পর সোমবার দিন সকালেই বসন্ত এল। নিজেই এল। চাঁপা মালতী উঠে ভোরবেলা থেকেই হাটের দোকানে যাবার ব্যবস্থা করছিল। হাটবারে তাই যায় ওরা। অন্য দিন দেরিতে যায়। হাটের কাছেই সাবরেজেস্ট্রি আপিস—একটু তফাত—লোকজন রেজেস্ট্রি আপিসে রোজই আসে। আপিসের সামনে সদর রাস্তার উপর চা খাবারের দোকানও আছে। ভিড় সেখানেই জমে বেশী তবে হাটের ভিতরের দোকানেও কিছু কিছু বিক্রি হয়। মালতীর দোকানে সব থেকে বেশী হয়। হাটের দিন ভোরবেলা থেকেই জোর বিক্রি। যারা গাড়ি করে মাল আনে আগের রাত্রে তারা সকালে উঠেই চা খায়। ভুবনেশ্বরতলায় এখনও যাত্রী হয়; রোগের জন্যে আসে, মানতের জন্যে আসে—তাদের মধ্যে রোগীরা, মানত করিয়েরা পূজো না দিয়ে খায় না, কিন্তু সঙ্গের লোকজনে খায়। সোমবার এই সব লোকের জন্যে মুড়কি বাতাসা মণ্ডা বিক্রি হয়। সে সব নিয়ে সোমবার সকালে চাঁপা আলাদা বসে।

ভোরবেলা ওরা সব সাজিয়ে গুজিয়ে তৈরী করছে এমন সময় দরজায় ডাক উঠল—মালতী! কই মালতী?

মালতী চমকে উঠেছিল। কে? বুকের ভিতরটা ধড়ধড় করে উঠছিল। কার গলা? সে—সে নয়?

—কই বষ্টমী মাসী কই?

—আরে—! বসন্ত সোনা! কি ভাগ্য কি ভাগ্য—আস আস।

মালতী যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিল। শুধু বুকের ভিতরটার আলোড়ন বেড়েই চলেছিল। অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। ধবধবে পাজামা পরা—লম্বা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি গায়ে—চোখে চশমা—মাথার চুলগুলো রুখু লম্বা এলোমেলো—এ বসন্ত যেন আলাদা মানুষ!

বসন্তও ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মালতীর দিকে। এই—সেই মালতী?

মালতী নিথর হয়ে দাঁড়িয়েও তা অনুভব করলে—তার কান দুটো মুহূর্তে গরম হয়ে উঠল। একবার চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে আবার সে চোখ নামালে। চাঁপা বললে—কি দেখছ সোনা? এ্যাঁ?

অসংকোচেই বসন্ত বললে মালতীকে দেখছি বষ্টুমী মাসী। কি সুন্দর হয়েছে মালতী! শুধু তো তাই নয় এ যে একেবারে মডার্ন মেয়ে!

চাঁপা মালতীকে বললে—প্রণাম কর মালা!

মালতী এবার এসে তাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আর তুমি?

—কি আমি? আমার আবার কি হল?

—একবারে শহরের লীডার—চোখ মুখ দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে!

চাঁপা বললে—বস বস বসন্ত সোনা। সে একখানা আসন পেতে দিলে।

মালতী তার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য—শক্ত মুখরা মালতী কেমন যেন নুয়ে পড়েছে—বোবা হয়ে গেছে।

চাঁপা বললে—চা খাবা না বসন বাবা?

—খাব না? তোমাদের বাড়ি ভাত খেয়েছি। এখন আবার চায়ের রেস্তোঁরা করেছ। চা খাব না? কাল রাত্রে সব শুনলাম। শুনে মনে মনে তারিফ করলাম। বা মালতী! ঠিক করেছিলাম সকালে উঠে একেবারে হাটে যাব—রেস্তোঁরায় ঢুকে বসে বলব—চা দিন তো! অবাক হয়ে যাবে তোমরা।

হেসে উঠল সে।

মালতী হাসলে না। বললে—গোপাদের বাড়ি উঠেছ বুঝি?

—হ্যাঁ। আর কোথায় উঠব? গোপার দুর্ভাগ্যের কথা তো শুনেছ! আমি তাতে জড়িয়ে পড়েছি। এসেছিও ওদের কাজে।

—হ্যাঁ শুনেছি। সরকার মশাই বলছিল তুমি অনেক করেছ।

একটু হেসে বসন্ত বললে—অনেক কি না হিসেব করি নি। তবে হ্যাঁ করেছি বৈ কি। আমার যা করা উচিত, আমি যা পারি, তা করেছি।

বসন্তকে বর্ধমানে নিয়ে গিয়েছিল গোপা। গোপার বিয়ে হয়েছিল বর্ধমান থেকে কয়েক ক্রোশ দূরের এক গ্রামে। দত্তদের বাড়িতে। জমিদার ব্যবসাদার দুই-ই তারা। গোপার শ্বশুর রায় সাহেব। স্বাধীনতার পরও

তারা কংগ্রেসের সঙ্গে আপোস করতে পারে নি। গত ইলেকসনে জনসংঘের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গোপার ভাসুর; তাতে হেরেছিলেন। হঠাৎ যিনি জিতেছিলেন তিনি মারা যাওয়াতে আবার ভাসুর দাঁড়িয়েছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ইনডিপেনডেণ্ট ক্যাণ্ডিডেট হয়ে। তখন গোপার সদ্য বিয়ে হয়েছে। গোপা স্বামীকে বলেছিল—ভাসুরকে বল আমাদেব গাঁয়েব বসন্ত বাড়ুজ্জেকে আনতে। খুব ভাল বলতে পারে। এ সব খুব বোঝে। কি যে বক্তৃতা দেয় কি বলব!

বসন্তকে সেই কথাতেই নিয়ে গিয়েছিল গোপাব ভাসুর। বসন্ত সত্যিই কাজ করে নিজের কৃতিত্ব প্রমাণ করে, ইলেকসনেই সর্বেসর্বা হয় নি, গোপার ভাসুরের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিল। ইলেকসনের পরও তাঁর কাছে থাকত। একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করিয়েছিল। সম্পাদক হয়েছিল বসন্ত।

তাবপর হঠাৎ মারা গেল গোপার স্বামী। তার মাসখানেকের মধ্যে গোপার শ্বশুর।

গোপার সন্তান হয় নি। গোপার ভাসুর বললেন—সব সম্পত্তি আমার। শুধু তাই নয়, স্বামী থাকতে গোপা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত, সে বন্ধ করে দিলেন। সূত্র সিনেমা দেখা নিয়ে। বাড়ির গাড়ি নিয়ে। তিল থেকে তাল হল। গোপার বাবা গেল তাকে আনবার জন্য। তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

ঝগড়া লাগল বসন্তের সঙ্গে।

বসন্ত ওই কাগজেই লিখলে—যে লঙ্কায় যায় সেই রাবণ হয়। যে নেতা হয় সেই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়। সেই হিটলার হয়। সেই মাথা নিতে চায়। মানুষের অধিকার পদদলিত করে, নারীকে শৃঙ্খলে বাঁধে। দাসী করে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের নেতা—দত্ত মহাশয়!

শুধু তাই নয়, দত্তকে মুখের উপর বলেছে—আমি প্রায়শ্চিত্ত করব আমার পাপের। আমি গ্রামে গ্রামে যাব—মিটিং করব। বলে আসব আপনার অত্যাচারের কথা।

দত্ত ভয় পেয়ে গোপাকে বাপের বাড়ি আসতে দিয়েছিলেন—গহনাগুলি দিয়েছেন। সম্পত্তি ব্যবসা মামলায় যা হবে।

বসন্ত বললে—কতটুকু বল? গোপার শ্বশুরের সম্পত্তি—তা তার তিন চার লাখ টাকা দাম। তার সে কতটুকু পেয়েছে বল?—

একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিল মালতী। বসন্ত থামল। সে আস্তে আস্তে বললে—আমি? আমার জন্যে কতটুকু করেছ বল?

হাসলে বসন্ত। বললে—তোর জন্যে কি করার ছিল বল?

—কিছু ছিল না?

—বল—কি ছিল?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মালতী বললে—না। কিছু ছিল না। আমারই ভুল। বলে সে হঠাৎ উঠে ঘরে চলে গেল।

—আরে! মালতী!—মালতী!

তাকে অনুসরণ করে ঘরে গিয়ে ঢুকল বসন্ত। মালতী গিয়ে ওদিকের জানালাটা ধরে দাঁড়িয়েছে। বাইরে তাকিয়ে আছে।

—মালতী! আবার ডাকলে বসন্ত।

—মালতী! বসন্ত তার পিঠে হাত দিয়ে ডাকলে।—মালতী!

মালতী ঘুরে তাকাল। সে কাঁদছে। দুই চোখ থেকে জল গড়িয়ে নামছে।

—তুই কাঁদছিস!

স্থির দৃষ্টিতে মালতী তার দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত সে দৃষ্টি। বিস্মিত হল বসন্ত সে দৃষ্টি দেখে। স্থির নিষ্পলক।

—বসন্ত চা এনেছি!

চাঁপা ঘরে ঢুকেছে চা হাতে নিয়ে। কিন্তু তাতেও তার সংকোচ নেই চাঞ্চল্য নেই। মালতীর দৃষ্টি দেখে সে শঙ্কিত হয়ে ডাকলে—মালতী! মালা!

মালতীর দৃষ্টি যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল—সে চীৎকার করে উঠল—মা—সী!

—মালতী

মালতী ছুটে এল তার দিকে হিংস্র জন্তুর মত—যাও—যাও বলছি!

সভয়ে পিছিয়ে গেল চাঁপা। অস্ফুট কণ্ঠে বললে—মালা!

—মেরে ফেলব তোমাকে। যাও!

চাঁপা চলে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মালতী ফিরল বসন্তের দিকে। তার চোখ এখনও জ্বলছে। চোখের জলের নিচে দৃষ্টির সেই আগুন যেন অনেক রঙ ফুটিয়ে তুলছে ক্ষণে ক্ষণে।

বসন্ত দেখছে। সে চঞ্চল হয় নি। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু হাসি বরং ফুটে উঠেছে তার মুখে। মালতী বললে—ওই মাঠের পথে একদিন—। মনে আছে ?

—মনে আছে তোর সে কথা ? বসন্তের মুখের একপাশে হাসিটা বেশী করে ফুটে উঠল।

—তুমি আমাকে বিয়ে করবে বলেছিলে আমাকে জড়িয়ে ধরে—। এবার ভেঙে পড়ল মালতী ! ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। বসন্ত এসে তার মাথাটা বুকে টেনে নিলে।

মালতী বললে—জেলখানায় আড়াই বছর আমি শুধু তোমাকে ভেবেছি। তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

বসন্ত তাকে ছেড়ে দিয়ে বললে—বল মালতী। সে কথা আমি ভুলি নি। আমার মনে আছে।

—না না—নেই। তবে তুমি এস নি কেন এতদিন ?

—কাজে—

—কাজ ! গোপার কাজ !

—না। কাজ, কাজ ! আমার কাজ ! আমার এখন অনেক কাজ।

—জানি। তুমি এখন মস্ত বড় লোক। অনেক নাম তোমার।

—তুমি আমি তোকে ভুলি নি। তোকে আজও ভালবাসি।

মালতী দুই হাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তার মুখে মুখ রেখে বললে—তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না। না—না—না ! আবার সে কেঁদে উঠল।

—বসন ! বসন্ত !

বাইরে থেকে চাঁপা ডাকছে।

ক্ষিপ্তের মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে সে দরজার দিকে চীৎকার করে বলতে গেল—না ! কিন্তু তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বস: বললে—একটু পরে বষ্টম বউ।

—তোমারে ডাকত্যাছে। দশ বারো জন লোক আসছে। বাই: দাঁড়িয়ে আছে।

—কি বিপদ ! ছাড় মালতী ! দেখি। আমি তোকে আজও ভালবা: মালতী। ছাড়।

মালতী ছেড়ে দিল তাকে। আশ্চর্য সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল তার মুহূর্ত-পূর্বের হিংস্র-ক্ষুব্ধ মুখে। বললে—বড় লোক হওয়ার বিপদ! যাও।

বসন্ত বেরিয়ে গেল।

মালতী চোখ মুছলে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইবে বের হতে যেন লজ্জা হচ্ছে তার। চাঁপা মাসীর কাছে লজ্জার যেন শেষ নাই। একটা অপরাধবোধ তাকে যেন নুইয়ে ফেলছে। ছি-ছি-ছি! পাগলেব মত কি করলে সে! কয়েক মুহূর্ত পব নিজেকে সামলে নিয়ে বাইরে এল সে। ডাকলে—মাসী!

চাঁপা উপু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে মাটির দিকে তাকিয়ে। জিনিসপত্র সাজানো পড়ে রয়েছে। দোকানের লোকটা বসে আছে উঠোনে। চাঁপা একটু হেসে বললে—কও মাসী কি বলছ?

—রাগ করেছ?

—রাগ? হাসলে চাঁপা। না। ঘাড় নাড়লে।

—আমার মাথার ঠিক ছিল না মাসী!

—ও কথা থাক মালতী!

—ও আমার শ্যাম মাসী!

—মালা! তেমনি ভজতে পারবা কন্যা?

—পারব মাসী!

—শ্যামে বিশ্বাস কর মালা?

—না, তা করি না!

—তবে? তা নইলি হয় না মাসী।

—দেখো!

লোকটি বসে বিড়ি টানছিল। বিড়িটা ফেলে দিয়ে বললে—দেরি যে অ্যানেক হয়ে গেল গো! হাটের দিন! চলেন!

—ওঠ মাসী!

—চল।

হাট জমেছে কলরব উঠছে। আজ হাট জমাট বেশী। আজ অনেক কাঠের গাড়ি এসেছে, শালের গদি—তৈরী দরজা বোঝাই গাড়ি এসে আঁট দিয়েছে অশথ বট জঙ্গলের মধ্যে। ওরা যাচ্ছে বৈরাগীতলার মেলায়।

বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেলা। তার উপর সামনে শ্রীপঞ্চমী শীতলাষষ্ঠী। ইস্কুলের ছেলের দল, বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়ের দল ভেঙেছে সরস্বতী পূজোর হাট করতে; গৃহস্থেরা এসেছে ষষ্ঠীর হাট করতে। ডাঁটা এসেছে আজ গাড়ি বোঝাই করে। ষষ্ঠীতে ডাঁটা বিশেষ করে কাটোয়ার আলমপুরের ডাঁটার আজ খুব চাহিদা। মটর কলাই বেগুন শিম এও এসেছে প্রচুর। মটর সেদ্ধ শিম বেগুনের তরকারি আর ডাঁটা পোস্তর তরকারি শীতলাষষ্ঠীব অনিবার্য অঙ্গ। চাই-ই। ওপাশে কাঠের দোকানের বটতলার পাশে পাইকারেরা খাসী এনেছে অনেকগুলো। সরস্বতী পূজোর জন্যে ছেলেরা মেয়েরা কিনবে—ষষ্ঠীর দিন বাবুরা দিনে বাসী খেয়ে রাত্রে বাইরের বাড়িতে ইটের উনোন করে মাংস খিচুড়ি খাবে। শীত আর ক'দিন। ওদিকে কুমোরেরা বিক্রির জন্যে ছোট ছোট সবস্বতী এনেছে। দু চারখানা মাঝারি প্রতিমাও আছে। আজকালকার কলকাতার ফ্যাশনের সরস্বতী।

একজন কারওয়ালা ফিরি করে বেড়াচ্ছে—বাসন্তী রঙ বাসন্তী রঙ। আজ কার ফিতের সঙ্গেও লোকটা বাসন্তী রঙ এনেছে। মেয়েরা বাসন্তী রঙে কাপড় ছুপিয়ে পরবে।

মালতীর দোকানেও আজ খদ্দের বেশী।

মালতী আজ যেন ফুটে ওঠা পদ্মের মত ঢলঢল করছে। জীবনে আনন্দের রৌদ্রের ঝলক পড়ে যেন সব কটি দল মেলে ফুটে উঠেছে।

জীবনের কামনা সহস্র ধারায় ঝরে পড়ে লজ্জা সংকোচ সংস্কার সব কিছুকে ঐরাবতের মত ভাসিয়ে দিয়েছে। যে যা বলবে বলুক। যা হবে হোক। তার ভাবনা নাই চিন্তা নাই আশঙ্কা নাই। সে নির্ভয়। বসন্ত তাকে ভালবাসে। মধ্যে মধ্যে সে খিলখিল করে হাসছে।

শ্রীমতীর দোকানে গান বাজছে গ্রামোফোনে—
মিলনমধু মাধুরীভরা স্বপন রাতি ফুরায়ো না।
এ সুখ মম শেফালী সম ঝরায়ো না। ওগো ঝরায়ো না

ভারী ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়ে গুনগুন করে সুরে সুর মেলাতে চেষ্টা করছে।

তার দৃষ্টি আজ আর ঘষা কাচের মত কিছু দিয়ে ঢাকা নয় কিন্তু সব যেন একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। লোক লোক আর লোক—কালো মাথা—ঘোমটা দেওয়া মেয়েদের মাথা। তারই হাজার মুখ, চকিতের মত একটা মুখ চোখে পড়ছে চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে—সে হেঁট হয়ে জিনিস কিনছে কিংবা পিছন ফিরছে। কিংবা এদিক থেকে কতকগুলো মাথার পিছন দিক তাকে ঢেকে দিচ্ছে। সব অর্থহীন তবু ভারী ভাল লাগছে।

ঝনঝন শব্দ উঠল। চাঁপা আপসোস করে বলে উঠল—ভাঙলি!

ফিরে তাকালে মালতী। ধুতে গিয়ে ক'খানা ডিস দুটো কাপ ভেঙে ফেললে টিকৃলি। অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সে। মালতী রাগ করতে পারলে না। হেসে বললে—ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে ওই ময়লা ফেলা টিনটার মধ্যে ফেলে দে। চল আমি বাসনগুলো ধুয়ে দি।

কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে এগিয়ে গেল।

টিনেব দেওয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে কে মৃদুস্বরে বলছে—মেয়েটা কিন্তু চমৎকার দেখতে ভাই!

—হাসি দেখেছিস?

মালতীব সঙ্গিন হাসি পেয়ে গেল। খুক খুক করে হাসতে লাগল!

বাসনগুলো ধুয়ে সে চাঁপার সামনে নামিয়ে দিয়ে তৈরী চায়ের কাপগুলো তুলে তুলে খদ্দেরদের সামনে ধবে দিতে লাগল।

—কাপড় রাখবেন? কাপড়! ডুরে রঙিন কাপড়।

কাপড়ওলা এসে দাঁড়িয়েছে।

—খুব রসিক তুমি! কাপড় রাখবার সময় বটে।

কাপড়ওলার পিছন থেকে কে বললে—এই সর না হে! এই!

বুকখানা ধ্বক কবে উঠল মালতীর। বসন্তের গলার আওয়াজ ভরাট গলা—শুধু ভরাটই নয় গম্ভীবও বটে! মাঝারি মাথার মানুষ—কাপড়ওলার পিঠের বোঝার ওদিকে শুধু চুল দেখা যাচ্ছে। কাপড়ওলাটা লম্বা।

—শুনছ।

কাপড়ওলা সরে দাঁড়াল। মৃদু মৃদু হাসছিল বসন্ত। হেসে বললে—চা খেতে এসেছি। বসন্তের সঙ্গে ক'টি ইস্কুলের ছেলে।

সেই মুহূর্তে শীতের দিনেও যেন ঘাম ফুটে উঠলে মালতীর কপালে। সে হেসে বললে—আসুন। এস বলতে পারলে না!

বসন্ত ঢুকল দোকানে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বললে—আরম্ভ ভাল হয়েছে। কিন্তু ঘর পাকা করতে হবে। ইলেকটিক লাইট নিতে হবে।

তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললে—ও-সব দেশের কথা হাটে হয় না ভাই। অন্য সময় আমার কাছে এস।

ছেলেরা বললে—কোথায় যাব? কখন যাব?

—যেয়ো না। কাল বিকেলে—এই মালতীর বাড়ি চেন? ওদের বাড়ি যেয়ো! ওখানে থাকব।

মালতী খুশী হয়ে উঠল। নিজের চেয়ারখানা তুলে তাকে দিয়ে বললে—বসুন।

—বসলাম। খুব ভাল করে চা তৈরী কর। সিগারেট রয়েছে দেখছি—দাও আমাকে এক বাক্স দাও।

সিগরেট দিয়ে এগিয়ে গেল মালতী। চাঁপা চায়ের জল নামিয়েছিল তার কাছে গিয়ে বললে—সর মাসী আমি তৈরী করি।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করলে—চপ দিব?

—না থাক।

বসন্ত বললে—সে শুনতে পেয়েছিল কথাটা—বললে—চপ না, বেগুনী ভেজে দাও দেখি! বেশ ভাল করে ভাজ।

মালতীর বড় ভাল লাগছে। বসন্ত এসেছে দোকানে। সে তা হলে দোকান করাকে খারাপ ভাবে নি! ভারী ভাল লাগছে। চিনি একটু বেশী দেবে কিনা ভাবছে!

—বসন্ত। ভাল ভাল ভাগ্য ভাল। দেখা পেলাম।

—কি—কি খবর?

—হাট করতে এসেছি।

ফিরে তাকালে মালতী। বেশ কাপড়জামা-পরা বয়স্ক ভদ্রলোক। লোকটি ভিতরে এসে বসল।

বসন্ত বললে—দু কাপ চা কর।

লোকটি বললে—চা আমি খাব না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোমাকে?

—বলুন।

—এই কাণ্ডটি তুমি কেন করলে?

—কাণ্ড আমি অনেক করি। আপনি কোন্ কাণ্ডটির কথা বলছেন। বলুন আগে!

—আমার ভাগ্নের বিয়ে কায়স্থের মেয়ের সঙ্গে দিলে কেন? জাতটি মারলে কেন? তুমিই তাকে প্ররোচিত করেছ!

—প্ররোচিত সে হয়েই ছিল! বললে বিয়ে করব ওকে! আমি দোষের কিছু দেখি নি। বললাম—কর।

—দোষের কিছু নেই? ব্রাহ্মণের ছেলে—কায়স্থের মেয়ে—

বাধা দিয়ে বসন্ত বললে—না। কিছু দোষের নেই।

—তুমি হিন্দুসভার—

—আমি কোন সভার লোক নই! আমার মত আমার। আমি স্বতন্ত্র! হিন্দু কায়স্থতে বিয়ে কি—আমি ও বিয়েরই প্রয়োজন মনে করি নে। ওটা সমাজের একটা চাপানো নিয়মের নামে অনিয়ম। ভালবাসা হয় পুরুষে নারীতে—ভালবাসা হলে তারা একসঙ্গে বাস করবে। এর মধ্যে আবার বিয়ের ঘটা কেন?

তুমি অতি পাষণ্ড!

—আপনারা ভণ্ড। ধর্মের ষণ্ড!

—বসন্ত!

—ধমকাচ্ছেন কাকে? হাসলে বসন্ত।

আশ্চর্য! বসন্ত হাসতে হাসতেই কথা বলছে। একটা সিগারেট শেষ করে আর একটা ধরাচ্ছে। মালতী চায়ের কাপ হাতে বসেই আছে। উঠে দেবে কি না বুঝতে পারছে না।

বসন্ত লক্ষ্য করে বললে—চা দাও মালতী!

মালতী চায়ের কাপ এবার গিয়ে নামিয়ে দিলে।

লোকটি এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিল এবার অকস্মাৎ যেন বলে উঠল—নিজে? নিজে কি করবে?

—আমি? আমার অনেক কাজ মুখুজ্জেমশাই। বিয়ে করবার ফুরসত নই। আর ইচ্ছেও নেই। বিয়ে আমি করব না। হাসলে বসন্ত।

—ব্রহ্মচারী হবে? এদিকে তো মদ ধরেছ শুনেছি।

—মিথ্যে শোনেন নি! তা ধরেছি। রাত্রে খাই স্বাস্থ্যের জন্যে। আর ব্রহ্মচারী থাকব তাও বলি নে। যদি কাউকে ভালবেসে ফেলি তবে তাকে বলব এস আমরা দুজনে ঘর বাঁধি। বাঁধে ভাল। না বাঁধে, যে এইভাবে বাঁধতে চাইবে তাকে খুঁজব।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বসন্ত বললে—খাসা চা করেছ! দাও দাও মুখুজ্জেমশায়কে এক কাপ দাও। খান! খেয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা করুন।

লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে চলে গেল। বসন্ত হা-হা করে হেসে উঠল। চার পাঁচজন খদ্দের এসে ঢুকল।

—কই, দুটো করে চপ আর চা।

বসে পড়ল তারা বেঞ্চের উপর। বসন্ত উঠল।—চললাম। দাম নিবি নে?

শুষ্কভাবে তাকাল মালতী। বললে—না।

বসন্ত হাসতে হাসতে দোকানের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল- সমস্ত হাটটা ভাল করে দেখে বললে—ওঃ আজ লোক যে খুব। ওঃ।

চাঁপা মাসী বললে—হবে না? তুমি শহরে থাইকা সব ভুলে গেছ গিয়া। লীডার হইছ—

—কেন তাতে কি হল? কি ভুললাম?

—আজ হাটটা কিসের মনে করতি পার?

—ও। হ্যাঁ হ্যাঁ। সরস্বতী পূজোর হাট। তাই এত ইস্কুলের ছেলে বালিকা বিদ্যালয়ের দিদিমণিদের ভিড়।

শুধু অদের। সরকারী আফিসের বাবুদের আছে। ছুটা আছে। কেলাবের আছে। ইস্টিশানেব আছে। সেদিন ক'টা গোনলাম মালতী? দশখানা না? হাটের একখানা হ্যাঁ।

হাটেও সরস্বতী? কি সরস্বতী—লাভবিত্তের সরস্বতী?

—সে যা বল। তোমরা পণ্ডিত লোক। লীডার মনিষ্যি। শুধু সরস্বতী পূজা না। পরদিন অরন্ধন—বাসী খাওন। শীতলাষষ্ঠীর হাট।

—টিকৃলি! ডাকলে বসন্ত। টিকৃলি তাকাল তার দিকে।

বসন্ত বললে—যা তো দেখে আয় তো মুরগীর দর কি রকম? সরস্বতী পূজো শেতলাষষ্ঠী—লোকে মুরগীটা খাবে না! যা। মা সরস্বতীর জয়জয়কার হোক।

—তুমি খাবে ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে চাঁপা।

—ও তুমি বুঝি জান না ? মা সরস্বতী মুরগী খুব ভালবাসে! তা নইলে লোকে এত বিদ্বান হয় !

চাঁপা হেসে উঠল। মালতী বললে—খদ্দের কি চাচ্ছে দেখ মাসী !

একদলে পাঁচজন খদ্দের এসে ঢুকল—বাঃ বেশ দোকান হয়েছে। ঝরঝরে—

হাটের মাঝে পরম কৌতুকভরে হরি—বো ল ধ্বনি দিয়ে উঠল লোকেরা। তার মধ্যে থেকে ভিড় ঠেলে তুজন লোক পর পর বেরিয়ে এল।

—আয় ! আয়—আয়।

—চল—চল।

—হ্যাঁ আয় !

—হ্যাঁরে চল ! চল না।

—আয়। আমি বাবার সামনে ফেলে দোব পয়সা। তোকে কুড়িয়ে নিতে হবে।

—নিশ্চয় নোব। বাবার মাথায় দে না তু।

—কুঠ হবে।

—তুই শালার যে হয়েছে। শালা আমার বন্ধু। হাটধুল জোচ্চোর কোথাকার !

বলতে বলতে দোকানের সামনে দিয়েই চলে গেল তারা ভুবনেশ্বরতলার দিকে।

ঠাকুর বললে—তুই মিতনে ঝগড়া লাগল। তরকারিওলা মিতন পাল আর বোর্ডিংয়ে চালের যোগানদার মিতন পাল। আজব ব্যাপার !

মালতীও জানে ওদের। বাপের আমলে ওদের দেখেছে। বাবার কাছে ধরণী জেঠার কাছে শুনেছে, তখন বলত—দশ বছর আগে ওরা হাটে হাটধুল পাতিয়েছিল। তুজনেই মৃত্যুঞ্জয় পাল। তরকারিওলা মিতন পালের জমি-জেরাত ছিল না—তরকারি কিনে হাটে আনত। চাল কিনত বাজারে। চালওলা মিতন চাল বেচে হাট করে নিয়ে যেত। তুজনের এক নাম শুনে বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। চাল বেচে কিছুটা চাল—কোন দিন এক সের কোনদিন দেড় সের চাল চালওয়ালা মিতন তরকারিওয়ালা মিতনকে দিত খাবার জন্যে।—পায়েস করে খেয়ো।

বাস্‌ওয়ালা চাল। তরকারিওলা মিতন কোনদিন কচি লাউ দিত পায়েস করে খাবার জন্যে। কোনদিন দিত ভাল বেগুন—পুড়িয়ে খেয়ো হাটধুল। একেবারে মাখনের মত। তখনকার দশ বছর তারপর আড়াই বছর বারো বছরের উপরের দুই হাটধুলের বিবাদ—এমন বিবাদ দেখে দেখে তারও বিস্ময় লাগল!

মালতীর দোকানের একজন খদ্দের হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে হাত তুলে চীৎকার করে উঠল—এ—খা—নে! চাটুজ্জে এখানে—। ঘো—ষ।

এবার কানে ধরা পড়ল হাটের কোলাহল ছাপিয়ে যে কয়েকটা চীৎকার উঠেছে তার মধ্যে একটা ডাক—চাটুজ্জে—চাটুজ্জে!

কারওলা হাঁকছে মধ্যে মধ্যে—এই কা—র।

কেউ হাঁকছে—আলমপুরের ডাঁটা। ফু—রিয়ে গেল।

কেউ হাঁকছে—বেগুন!

—বাঁ ধা—ক—পি! তার মধ্যে একজন হাঁকছে চা—টু—জ্জে!

দোকানের লোকটি সাড়া দিলে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে—শুধু সাড়া পেলে চলবে না দেখতে পাওয়া চাই। হাটে এখন শুধু মাথাই দেখা যাচ্ছে। কালো চুল। মেয়েদের ঘোমটার সাদা কাপড়গুলো তার মধ্যে ছিটেফোঁটার সৃষ্টি করেছে। মধ্যে মধ্যে রঙিন কাপড়ও আছে। সেগুলো সাদা কাপড়ের ঘোমটার মত চোখে ঠিক পড়ে না।—চাটুজ্জে—এই যে! ঘো—ষ!

ঘোষ এসে দাঁড়াল, বললে—বেশ যা হোক। চা খেতে বসে গিয়েছেন?

—ভারী তেষ্টা পেয়েছিল। সেই রাত থাকতে বেরিয়েছি। বস, খাও এক কাপ চা খাও। দুটো চপ খাও। পেট ঠাণ্ডা করে হাট করবে।

—নতুন দোকান!

—হ্যাঁ। ভাল দোকান!

—দোকানদারনী আরও ভাল!

মালতীর ভুরু কুঁচকে উঠল।

চাঁপা বললে—আপনারা ভাল কইলেই আমরা ভাল। নইলে মন্দ!

মালতী এবার হেসে বললে—আপনাদের ভরসাতেই তো দোকান! আপনারা ভাল করে খান! তবে তো!

—তা হলে আরও দুটো করে চপ দাও।

—দাও মাসী।

—কোথায় বাড়ি তোমার? কোত্থেকে এলে গো? পূর্ববঙ্গের রেফুজী বুঝি। তোমরাই এসব পার। আমাদের দেশের মেয়েদের এ সাধ্যি নাই!

—আমি এখানকার মেয়ে।

—এখানকার? কার মেয়ে গো?

—আমার বাবার নাম ছিল শ্রীমন্ত দাস।

লোকটি হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মালতী বুঝলে সে চিনেছে তাকে! লোকটার হাঁ কি বিশ্রী! সামনের ক'টা দাঁত নেই। বাকী ক'টা কাল হয়ে গেছে। ভয় পেয়েছে নাকি? হাসি পাচ্ছে তার। তবু সে বলল—শ্রীমন্ত দাস এখানে মনিহারীর দোকান করত। তার মেয়ে বাসদেব দোবেকে কেটেছিল মাছ কোটা বঁটি দিয়ে -

—হ্যাঁ—

মুখ থেকে খানিকটা চপ পড়ে গেল চপের ডিসের উপর।

মালতী অন্য দিকে মুখ ফেরালে। অন্য সব দিকেই হাট। হাটটায় এখন কোলাহল কেমন মৌমাছির চাকের গুনগুনানি গানের মত একটানা সুরে চলছে। লোক দুটি ফিসফিস করে কি বলছে। ইচ্ছে হচ্ছে তাকাতে কিন্তু পারছে না। তাকালেই হেসে ফেলবে সে। বসন্ত চলে গেছে। ওই মুরগীর দর করছে। পাইকার ওকে বার বার সেলাম করে কথা বলছে।

—পয়সা। পয়সা নাও গো।

সেই লোক দুজনের একজন—ইনি চাটুজ্জে। একখানা পাঁচ টাকার নোট ফেলে দিলে। তারপর বললে—খাবার তোমার ভাল। বেশ চপ করেছ।

—আপনার দশ আনা হয়েছে। চারটে—

—ঠিক আছে—কেটে নাও। এক বাক্স সিগারেট দাও। জুড়ে নাও ওর সঙ্গে।

—দু' বাক্স নাও।

—দু' বাক্স?

—বৃষোৎসর্গের হাট—তাতে দু' বাক্স সিগারেট বেশী হল?

—তবে দু' বাক্সই দাও। আর একটা কথা।

—বলুন।

—তোমাদের দোকানের এই পাশে টিনের দেওয়ালের গায়ে আমাদের

হাটের জিনিস রাখব। কিছু মাটির বাসন ভেতরে রাখব, নইলে ভেঙে দেবে।

ঠাকুব জিজ্ঞাসা করলে—সরস্বতী পূজো? কোথাকার গো?

—না না। শ্রাদ্ধ। যাও ঘোষ এইখানে কপিগুলো ঢালতে বল। যাও।

ঘোষ চলে গেল।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে—কার শ্রাদ্ধ? কে মারা গেলেন?

—শ্রাদ্ধ নয় সপিণ্ডিকবণ। বর্ষাব সময় দশ দিনে সব হয়ে ওঠে নি। এখন হচ্ছে। জগৎপুবের হে। মানববাবুব পিতাব শ্রাদ্ধ। জীবনবাবুর। ওঁদের তো নিয়ম আছে। ভুজনো-পৈতে বিয়ে—শ্রাদ্ধ—এই দশকর্মের হাটবাজার ভুবনপুরের হাট ছাড়া হবে না।

জগৎপুরের বাবুদের উন্নতি এই হাট থেকে। তিন পুরুষের আগের পুরুষ নাম ছিল নরপতি চাটুজ্জে। মানববাবুব বাবা জীবনবাবু—তার বাবা গনেশবাবু—তাব বাবা নরপতি চাটুজ্জে। নরপতি গরীব ব্রাহ্মণ। ভুবনপুরের দে বাড়িতে খাতা লিখতেন—মাইনে ছিল খাওয়াদাওয়া আর পাঁচ টাকা মাইনে। খাতা লেখা ছাড়া ব্রাহ্মণ অতিথি এলে রান্না করেও দিতে হত। দে বাড়িতে তখন রাঁধুনী বামুন কি ঠাকরুন থাকত না। দে মশায়দের অনেক ব্যবসা ছিল। ধান চাল কলাইয়ের বাঁধি কারবার—তেল ঘি নুন মশলার গদি—কাপড়—সব রকম ব্যবসাই ছিল। নরপতি চাটুজ্জের মালিক এব সঙ্গে খুলেছিলেন তুলোব কারবার। শিমূল তুলো পাড়িয়ে চালান দিতেন। আট ক্রোশ দূরে বিখ্যাত শ্মশানঘাট। সেখান থেকে শ্মশানের তোশক বালিশেব তুলো কিনে তাও চালান দিতেন কলকাতায়। শ্মশানের তুলো চণ্ডালেরা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে গাদা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত। একবার নরপতি একটা ছোট গাঁট কিনেছিলেন—সে গাঁটটা দে মশায়রা নেন নি তার দুর্গন্ধের জন্য। সেটা দু'টাকায় কিনেছিলেন নরপতি বিছানা তৈরি করাবে বলে। দুর্গন্ধ দূর করবার জন্য খুলে ছাড়িয়ে রোদ্দুরে দিতে গিয়ে তার মধ্যে একটা নোটের বাণ্ডিল পেয়েছিলেন। সেই টাকায় মূলধন করে ব্যবসা ফেঁদে জগৎপুরের চাটুজ্জে বাড়ি ধনী। নরপতি লক্ষপতি হয়েছিলেন—কলকাতাতেও গদি খুলেছিলেন বডবাজারে। কিন্তু ক্রিয়াকর্মের হাট ভুবনপুরের হাট ছাড়া হবে না এই আদেশ তিনি উইলে রেখে গেছেন।

এমন কি এখানকার মালিক মানববাবুর বিয়ে হয়েছিল কলকাতায় কিন্তু তরী‹
হাট এখান থেকে গিয়েছিল।

দু'গাড়ি বাঁধা কপি—সে ছোট একটা টিপিব মত জড়ো হয়ে উঠল।
তাব পাশে আলু। বড় বড় নৈনীতাল আলু। ভুবনপুবেব হাটে নৈনীতাল
আলুও আসে। ভাল খাস নৈনীতাল। মটরশুঁটি দু' বস্তা। মস্ত ক্রিয়া
হবে—সপ্তগ্রামী নেমতন্ন।

মালতীব দোকানের ভিতরে এক কোণে মাটির গেলাস জড়ো কবছে
একজন লোক। চাটুজ্জে বাড়িব বাখাল বাগাল মান্দব বা মুনিষ জন কেউ
হবে। তা হলেও লোকটি ভাবী সুন্দব দেখতে। সুন্দব গড়ন সুন্দব
মুখশ্রী।

—হাঁ মা, ওই কি? দোকানে কি ভাজছে—চপ না কি বলছে—কত
দাম?

মালতী ফিবে তাকাল। কালো একটি মেয়ে। অল্প বয়সী। হাতে
পয়সা নিয়ে নাড়ছে এবং চপের দাম জিজ্ঞাসা করতেও খুব সংকুচিত হয়ে
উঠেছে।

টিকৃলি জিজ্ঞাসা কবলে—কি লো চপ খাবি? খুব ভাল—খা।

মালতী বললে—দু' আনা একটা।

মেয়েটি একথাব জবাব দিলে না—হঠাৎ বোঁ কবে ঘুবে হনহন কবে
হাটেব ভিতর মিশে গেল।

মালতী ডাকলে—শোন শোন।

কিন্তু সে ফিরল না।

টিকৃলি বললে—এত পয়সা কোথা পাবে?

মালতী বললে—তুই চিনিস?

—হ্যাঁ, হাটে আসে।

—কোথায় বাড়ি?

—ওই কোমরপুব। স্বামীর ঘর করে না, বাপের ঘরে থাকে। বলি
সেঙা করিস না ক্যানে—তো বলে মন।

—খারাপ মেয়ে?

—তা লাগে না। খেটেখুটে খায়। হাটের বারে ঘুঁটে নিয়ে আসে
গাঁয়ে বাজারে বিক্রি করে।

মালতীর ভাল লাগল, বললে—ওকে বলিস না আমাদের ঘুঁটে দেবে। যা—দেখে ডেকে নিয়ে আয়। একটা চপ দেব।

টিকলি চলে গেল। ঠাকুব বললে—আবে বাসন ক'টা ঘুয়ে দিয়ে যা।

মালতী বললে—কি কর কি মাসী! রাখ। কে কত জন আসছে—বামুন কায়েত তো না। নানান জাত।

—এখনই এক মিয়া খাইয়া গেল। আমি চিনি।

মালতী হেসে উঠল, বললে—জেলে জোবেদা বিবিব বাসন ধুয়েছি মাসী।

—সি জেহেলে দোষ নাই। জেহেলে বৃহৎকাষ্ঠে বিত্যাতে—ইসবের কথা পৃথক!

মালতী বললে—চা খাবাবের দোকানও পৃথক মাসী। তাছাড়া এটা তো হাট গো। ভুবনপুরেব হাট। এখানে মুসলমানেরাও মানত করে ঢেলা বাঁধে। আগের কালে ওই অশথ বটের জঙ্গলে মোরগ ছেড়ে দিয়ে যেত।

—হ—রি—বো—ল!

কোমরভাঙা এক ভিখারী এসে সামনে বসল। ভিখিরী আসে হাটে। কানা খোঁড়া কুষ্ঠরোগী—আবার বাউল আসে। আলুর দোকানে একটা ত্নটো আলু, লঙ্কাওয়ালা ত্নটো লঙ্কা, বেগুনওয়ালা কখনও একটা পোকা-লাগা বেগুন দেয়, পেঁয়াজ দেয়, বাকী যারা বড় জিনিসের কারবারী তারা কানা খোঁড়া কুষ্ঠবোগীদের এক একটা পয়সা দেয়—বাকী লোকে ভাগিয়ে দেয়। তবে আলখাল্লাপরা বাউল বা গেরুয়াপরা ভৈরব ভৈরবী এদের ফেরায় না। এবং প্রত্যেক হাটে আসেও না।

কোমরভাঙা খোঁড়া বসে বসে হাঁটে। সে আবার হাঁকলে—হ—রি—বো—ল!

মালতী বাসন ধুতে ধুতেই বললে—এ খোঁড়া কতদিন এসেছে? কোত্থেকে এল? সে বুড়ো খোঁড়া কোথায় গেল?

খোঁড়া বললে—মেদিনীপুর থেকে এসেছি মা! তুমি দোকান করেছ। তা তোমার ভাল বিক্রি হবে। খুব ভাল হবে। ও বুড়ীর দোকানে কেউ যাবে না দেখো!

চাঁপা ত্নটো বেগুনী দিলে—এই নিয়া যাও।

—একটা কি নতুন করেছ দিবে না? লোকে বলছে ভাল খেতে।

মালতী একটা ভাঙা চপ তার হাতে দিল। সে সেটা মুখে পুরে খেতে খেতে বসে-হেঁটে এগিয়ে গেল।

টিক্‌লি ফিরে এল, বললে—পেলাম না তাকে। একজন বললে সে ছুটতে ছুটতে পালিয়েছে।

মালতীর মনে পড়ছিল পুরনো কালের খোঁড়াকে। এ ক' হাটের মধ্যে তার কথা মনে হয় নি, আজ এই খোঁড়াকে দেখে মনে পড়েছে। বলল—সে বুড়ো খোঁড়ার কি হল মাসী?

—সে মাগী হাহ রাখছে। আহা জলে ডুব্যা মরেছে গ!

—জলে ডুবে?

—হঁ গ। রাত্তিরে পড়ে গেছিল একটা ডোবায়।

খোঁড়াটা মরেছে। খালাস পেয়েছে। কিন্তু ভুবনতলার হাটে তার স্থান খালি পড়ে নেই, ঠিক আর একটা খোঁড়া এসেছে।

ধরণী জেঠা দোকানের সামনে দিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছিল—ভুবনপুরের হাট—আজ জুড়লে কালকে ফাট। যাঃ বাবা—দশ পনের বছরের পিরীত—গেল! থমকে দাঁড়াল ধরণী। হেসে বললে, বাঃ এতো জোর চলছে তোমার মা!

মালতী বললে—চা খান।

—তা বেশ, খেয়ে যাই। তুমি দোকান করেছ! ভিতরে ঢুকল ধরণী। একজন খদ্দের বললে—কি হল দাস? মিটল? পারলে মেটাতে।

—নাঃ। ওই আর মেটে? এমনি করে চড় কিল ঘুষির পর? কেস হয়ে গেল। দুজনেই গেল থানায়।

ওই চালওলা মেতন আর তরকারিওলা মেতন। দুজনেই গেছে থানায়।

ধরণী বললে—দোষ দুজনারই। আগে এ ওর কাছে ছাড়া তরকারি কিনত না—এ ওর কাছে ছাড়া চাল কিনত না। এখন তরকারি মেতনের অবস্থা ফিরেছে—জমি কিনেছে, ধান হয়। চাল কম কেনে। চাল মেতন ক্রমে এ-ওর কাছে তরকারি কেনে। আজ চাল মেতন দাঁড়কার লালচাঁদের কাছে পাঁচ মন আলু কিনছিল। ওই তরকারি মেতনের রাগ। এসে বলে—তুমি তো খুব ভদ্দনোক হে বাপু। চৌদ্দ আনা পয়সা তোমার কাছে কিছু লয়! তুমি বড়নোক, আমার কাছে অনেক। চেলো মেতন বলে—কিসের পয়সা? কি বলছ তুমি? তরী মেতন বলে—তুমি আমার কাছে

কুমড়ো নিয়ে গিয়েছ মনে নাই ? কুমড়ো চেলো মেতন নিয়েছিল। সি আমি জানি। আমার দোকানে চেলো মেতন গামছা কিনতে এসেছিল কুমড়ো ঘাড়ে করে। বাহারের কুমড়ো। আমি শুধিয়েছিলাম, মেতন এ কুমড়ো আচ্ছা কুমড়ো। কোথা কিনলে হে ? আমাকে বলেছিল—আমি আবার কোথা কিনব ? হাটধুল এনেছিল আমার জন্মে। লোকে দেড টাকাও দিতে চেয়েছিল। দেয় নাই। আমি বললাম—এমনি তা হলে ? তা বললে—না, চৌদ্দ আনা কেনা দাম—ওই দামে দিলে। তা নগদ না ধার তা আমি শুধুই নাই। এখন তবী মেতন বলছে—দেয় নাই। চেলো মেতন বলছে—দিয়েছি। তাই নিয়ে তক্কাতক্কি। আমাকে সাক্ষী মানলে। যা জানি বললাম। কুমড়ো নেওয়াও বটে দামও চৌদ্দ আনা বটে। এখন ধাব কি নগদ কি করে বলব ? তখন চেলো মেতন বললে—কুঠ হবে। কুঠ হবে—তোব। বাস, তরী মেতন ঠাস করে মেরে দিলে চড। অমনি চেলো লাগালে ঘাড়ে ধবে কিল। শেষ তুজনেই গেল থানায়। লাও এখন ফৌজদাবী মামলায় সাক্ষী দাও। হাটেব প্রেম তাই বটে। সস্তা দাও মিতে—না দিলেই খাবাপ লোক। আজ তুমি সস্তা দাও তুমি মিতে—কাল আর একজনা দিলে সেই মিতে। দেওয়া থোওয়ার ব্যাপাব। একটা কথা আছে—ভুবনপুরেব হাট আজ জুড়লে কালকে ফাট। সে সব হাটেই।

মালতী শুনছিল বসে। তার ভালই লাগছিল। কথা সত্যিই বলেছে ধরণী জেঠা। মিছে বলে নি। ধরণী দাস উঠে বললে—বেশ চা মা। ভাল চা! লাও পয়সা লাও।

—না। আপনার কাছে পয়সা নিতে পারব না আমি!

—না না মা, ও করে না। লোকসান হবে। তোমার এটা ব্যবসা।

—যে ব্যবসাতে জেঠার কাছে খাইয়ে দাম নেয় সে ব্যবসা আমি করি না!

ধরণী দাস কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না, জগৎপুরের চাটুজ্জে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে—আমার সেই লোকটা কোথায় গেল ? ওই যে মাটির বাসন সাজাচ্ছিল ?

মালতী ঘরের কোণের দিকে তাকালে। সত্যিই তো সেই লোকটা নেই। মাটির গেলান কপ্‌টেগুলো সেই আধসাজানো হয়ে পড়ে আছে। সে কই ?

মালতী বললে—তা তো জানি নে! কোথাও গিয়ে থাকবে!

—কোথা গেল?

—তা কি করে জানব বলুন? বলে তো যায় নি। এত লোকে ভিড়ের মধ্যে দেখি নি তো।

—লক্ষ্মী! ওরে ও লক্ষ্মী! লখা—আ—লখা—আ। কি বিপদ! ঢাল— কুমড়োগুলো ঢাল ওই বাইরে।

বস্তা বস্তা কুমড়ো এনেছে। ঢালতে লাগল।

মাসী কুমড়োগুলো দেখে হঠাৎ বলে উঠল—আঃ একটা বিলাতী কুমড়ার জন্য! আর এত বিলাতী কুমড়া! আঃ! গড়াগড়ি যায়। এ্যাঁ!

চাঁপার আপসোস হচ্ছে—একটা বিলাতী কুমড়োর জন্যে দুই মেতনের এত বড় ঝগড়াটা হয়ে গেল!

মালতী হাসলে। চাঁপা মাসী বেশ!

আবার বসন্ত এল। পিছনে একটা লোক একটা হেজাক বাতি জ্বেলে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল। বসন্ত বললে—এই নে এটা রাখ। জ্বেলেই নিয়ে এলাম। রাখ রে রাখ।

মালতীর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল একবার, পরক্ষণেই সে দীপ্তি রইল না। বললে—কোত্থেকে আনলে?

—আনলাম। এত খবরে তোর দরকার কি? পেলি—দোকানে টাঙিয়ে দে। শুনলাম, গত হাটে শ্রীমতী হেজাক জ্বেলেছিল। ধর। হাসলে বসন্ত।

বসন্ত দোকানে ঢুকে বসল—বললে—আর এক কাপ চা দে।

চাঁপা বললে—নতুন দেখি বসন্ত মানিক!

—হ্যাঁ নতুন।

মালতী চায়ের কাপ এনে সামনে নামিয়ে দিলে। প্রশ্ন তার মনে উঠেছিল কিন্তু চারজন খদ্দের বসে খাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করা হল না।

বসন্ত আলোটা টাঙাবার জন্যে তার বেঁধে আংটা তৈরী করে এনেছে। ঠাকুর টিকুলি সকলেই খুশী হয়ে উঠেছে আলো দেখে। ঠাকুর আলোটা টিনের চালের বাঁশে তারের আংটা লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে বললে—বাঃ!

বসন্ত চা শেষ করে উঠে যাবার সময় মালতী বললে—বসন্তদা।

বসন্ত ঘুরে দাঁড়াল।

—আলোটার কত দাম নিলে ?

—কেন ?

—দামটা দিতে হবে তো !

বসন্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে –ওটা তোকে আমি দিলাম।

—দিলে ?

—হ্যাঁ। সে আর দাঁড়াল না চলে গেল। মালতী তাকিয়ে রইল আলোটার দিকে। দিনের আলো শেষ হয়েছে কিন্তু রাত্রির অন্ধকার এখনও ফোটে নি। আলোর দীপ্তি এখনও ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে। মালতীর মনটায় যেন কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বসন্ত যেন দিনের আলোর মধ্যে ওই হেজাক আলোটার নিষ্প্রভ দীপ্তির মত নিষ্প্রভ হয়ে গেছে হঠাৎ। আজ প্রথম হাটের সময় যে-কথাগুলো সে ওই লোকটাকে বলেছে সেই কথাগুলো তার মনে ঘুরছে। বসন্ত যেন তার অচেনা মানুষ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে না। জোবেদা বিবি বলত—শুনে রাখ তুই ছুঁড়ি কচি ; শুনে রাখ তোর কাজে লাগবে—

হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল শ্রীমতী। কাল মোটা শ্রীমতীর পরনে হাতিপাঞ্জা শাড়ি, হাতে দুগাছা সোনার রুলি ; মাথার চুল টেনে বাঁধা, ছোট্ট একটা ঝুঁটি। কানে দুটো ফুল—নাকে নাকচাবি, গালে পান। শ্রীমতী মোটা বিশ্রী কিন্তু চোখ দুটো বড় বড়। এখনও তার বাহার আছে। শ্রীমতী দুই হাত কোমরে রেখে বেশ ভঙ্গি করে দাঁড়াল। মালতী প্রশ্ন করলে—কি পিসী ?

কাটা কাটা কথায় শ্রীমতী বললে—কি আবার ! দেখতে এলাম।

—কি ?

—আলো !

চাঁপা বললে—নতুন এল।

—হুঁ বসন্ত ঠাকুর দিয়ে গেল। শুনেছি। তাই দেখতে এলাম। বলি হেজাক আলো তো দেখেছি। তা প্রেমমার্কা হেজাক আলোর আলো কেমন খুলেছে তাই দেখতে এলাম।

মালতী বললে—তোমার হেজাকটা বুঝি এখন বিরহ-মার্কা হয়ে গেছে পিসী !

—কি ? কি বললি বেহায়া ছুঁড়ি—

—যা বলেছি তুমি শুনেছ।

—মালতী !—চীৎকার করে উঠল শ্রীমতী।

মালতী চট করে একখানা ছাঁকনা হাতে নিয়ে বললে—শোন পিসী। এর পর বেশী চেঁচাবে তো এই ছাঁকনার ঘায়ে মুখটা তোমার ছেঁচে দেব।

শ্রীমতী পিছিয়ে গেল সভয়ে। মালতী চীৎকার করে উঠল—হ্যাঁ জ্বেলেছি—প্রেমমার্কা হেজাকই জ্বেলেছি। বেশ করেছি। আমি বেহায়া—আমি জেলখাটা মেয়ে পিসী—তুমি যাও। তুমি যাও।

চাঁপা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে ডাকলে—মাসী ! মালতী ! কন্যে !

মালতী যেন পাগল হয়ে গেছে অকস্মাৎ। সে থরথর করে কাঁপছে। দেখতে দেখতে লোক জমে গেছে। হাটের লোকেরা যারা সামনের ফাটল পথ ধরে যাচ্ছিল তারা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, যারা দূরে ছিল তারা ছুটে এসেছে। আরও আসছে। শ্রীমতী ভিড়ের মধ্যে মিশে নিজের দোকানে চলে গেল। ভুবনেশ্বরতলায় কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। অন্ধকার ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় হয়ে উঠছে। হেজাক আলোটার আলো ক্রমশঃ শুভ্র দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠছে।

মালতীর এতক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরল। সে ছাঁকনাখানা ফেলে দিয়ে বললে—দোকানে একটু ধুনো দাও মাসী ! সামনে ভিড় করবেন না। সরুন। আর তো কিছু নাই—। সে বসল তার চেয়ারে।

ভিড় সরতে লাগল। একজন কে বললে—লে বাবাঃ আজ হাটে নারদ এসেছে !

জগৎপুরের চাটুজ্জে এসে ঢুকল দোকানে—সঙ্গে ঘোষ। শুধু ঘোষ নয় আরও তিনজন লোক। তাদের বললে—নে সব তুলে গাড়িতে বোঝাই কর। আগে মাটির বাসনগুলো নে বাবা। দোকান জুড়ে আছে। নে। দেন গো আমাদের চা দেন দেখি। চপ খানকতক ভেজে ঠোঙায় মুড়ে দেন।

চাটুজ্জে বসল। ঘোষ বললে—দেখো বোতল না ভাঙে। চপ নেওয়া মিছে হবে।

মালতী নিজে হাতে ওদের চায়ের কাপ নামিয়ে দিলে। আবার সে শান্ত হয়ে গেছে। বললে—শিঙাড়া কচুরি ?

—ডিম দাও দুটো করে। বেশী নয়। হ্যাঁ আর শিঙাড়া গোটাকতক দাও তো ঠোঙায় করে গাড়োয়ানদের জন্মে।

মালতী ফিরে তাকাল যে বাসন তুলছিল তার দিকে। তার মনে পড়ে গেল সেই ছোকরার কথা। প্রিয়দর্শন সেই লখার কথা। হঠাৎ কোথায় চলে গিয়েছিল সে। সে প্রশ্ন করলে—তাকে পেলেন? সেই লখাই আপনাদের?

হেসে উঠল চাটুজ্জে—বলবেন না আর তার কথা। বেটার শ্বশুরবাড়ি কাছেই। অবিশ্যি যাবার কথা বলে এসেছিল। বলেছিল হাটের কাজ সেরে সে শ্বশুরবাড়ি যাবে। কাল ফিরবে। তা বেটাব আর তর সয় নাই—বেটা সেই চারটের সময়েই ভেগেছে।

একটা বড় ঢঙ শব্দ করে ভুবনেশ্বরতলার কাঁসার ঘণ্টা থামল। ধ্বনি উঠল অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠে—জয় বাবা ভুবনেশ্বর!

"বাবা ভুবনেশ্বরো মনের বাঞ্ছা পূবণ করো।" হাটুরেরা দাঁড়িয়ে উঠে প্রণাম কবছে।

॥ ছয় ॥

চাঁপা বাড়িতে জিনিসপত্র সামলে গা ধুয়ে মালতীর অপেক্ষায় বসেছিল। মালতী হাটেব দোকান বন্ধ করে ভুবনেশ্বরতলায় প্রণাম করে আসছে। চাঁপা তার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল, যুবতী মেয়েকে রাত্রিকালে একলা ভুবনেশ্বরতলায় আর ভাঙা হাটে কি করে রেখে আসবে। মালতী হঠাৎ রেগে উঠেছিল। মালতীর যেন আজ কি হয়েছে। বলেছিল—আমার পাশে সে রাত্রে দাঁড়িয়ে থেকে বাসুদেব দোবেকে কোপ মারা বন্ধ করতে পেরেছিলে? আমাকে তুমি রাগিয়ো না মাসী। তুমি বাড়ি যাও। তুমি থাকলে হবে না আমার। যাও!

চাঁপা করুণভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আজ তুমি এমন কেন করছ মালা?

মালতী বলেছিল—মাসী পায়ে পড়ি, তুমি যাও।

পরক্ষণেই বলেছিল— এই টিকৃলি তো থাকল আমার সঙ্গে। ও বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—টিকৃলি! মালা—

—বুঝেছি মাসী। টিকৃলি সঙ্গে থাকলে লোকে বেশী মন্দ বলবে। বলুক মাসী—বলতে দাও। লোকে যা বলবে আমি তাই। যাও তুমি, ভয় নেই।

চাঁপা অগত্যা একলাই বাড়ি এসে গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বসে আছে। মালতী এলে সে গৌরাঙ্গকে শয়ন দিয়ে জপ করবে। এর মধ্যে উনোনে কাঠকুঠো দিয়েছে। ধোঁয়াচ্ছে। জ্বললেই দুটো ভাতেভাত চড়িয়ে দেবে। দাওয়ায় হেজাক বাতিটা জ্বলছে। মালতী এসে নিভুবে।

—বৈরেগী বউ! মালতী!

ডাক শুনে সচকিত হয়ে উঠল চাঁপা। বসন্ত ডাকছে। বসন্ত এসেছে। মালতীর জন্যে সে শঙ্কিত হল, উৎকণ্ঠিত হল। বসন্ত এসে যদি শোনে মালতী এখনও হাটতলায় ঘুরছে, আসে নি, একা ঘুরছে তা হলে সে রাগ করবে। নিশ্চয় করবে। পুরুষেরা করে। কি করবে সে? একজেদী রাগী মেয়েটা নিজের সর্বনাশ একবার করেছিল, আবার করবে।

—মালতী! মালতী!

চাঁপা অগত্যা দরজা খুলে দিল।

বসন্ত বললে—কি গো? এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলে না কি?

—ঘুমাইব? সেই কপাল গরীবের? লীডার মানুষ এই কথা কইলা কি করে? নাও—বস। সে একখানা আসন পেতে দিল।

বসন্ত বললে—মালতী কই?

—সে!—একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললে— কি যে তার আজ হইছে সেই জানে বসন। সে আজ যেন ক্ষেইপা গিয়া—সে কি মূর্তি মা! যেন রণরঙ্গিনী।

—শ্রীমতীর সঙ্গে তো?

—তুমি শুন্যাছ?

—শুনি নাই? শুনেছি। হাটের গোল!

—বড় তেজী কন্যাটা—কি যে কপালে আছে ওর—

—ভালই আছে। ভেবো না। আমি শুনে কি খুশী যে হয়েছি। সেই জন্যে তো এলাম।

—বল কি? সত্যি খুশী হইছ?

—নিশ্চয় সত্যি।

একটু চুপ করে থেকে চাঁপা বললে—তুমি অরে ভালবাস বসন্তসোনা—কন্যাটাও ভালবাসে। হাটের মাঝে কইল কি—হাঁ হাঁ—ও আলো আমার প্র্যামেব আলোই বটে। তা—। আবার একটু থেমে বললে—তুমি ওরে বিয়া কব বসন। তুমি নিজে জাতি মান না। লীডারও বট। ত্যাশে নামও হবে। ধর্মও হবে বসন।

হাসলে বসন্ত। বললে—কি দরকার। ওবেলা তো বলেছি। মালতী যদি সত্যিই ভালবাসে তবে না হয় তোমাদের রাধার মত কলঙ্কিনীই হবে। মাথায় করে নেবে।

—কি বল বসন। রাধা কি মানুষের কন্যা হতে পারে?

—হয়। হতে পারলেই হয়।

মালতী ঠিক এই মুহূর্তে বাড়ির বাইরের দরজায় ঢুকে থমকে দাঁড়াল। বললে—বসন্তদা?

—হ্যাঁ রে? এসেছিস। ভাল হয়েছে—জিজ্ঞেস কর চাঁপা বউ। ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

—কি? মালতী রাধা হতে পারে কি না?

—হ্যাঁ। তুই শুনেছিস? বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলি বুঝি?

—শুনছিলাম।

—তা হলে, বল শুনিয়ে দে মাসীকে। তুই শ্রীমতীকে বলেছিস হাটে, তা ওর বিশ্বাস হয় নি।

মালতী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না বসন্তদা। কথাটা তখন রেগেই বলেছি। নইলে মাসী ঠিক বলেছে। মানুষের মেয়ে রাধা হয় কি হয় না জানি না তবে আমার কান্নাকাটি পোষাবে না। ও-বেলাতেও অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা যখন হয়েছিল তখনও মাথার ঠিক ছিল না। কি বলতে কি বলেছি। জোবেদা বিবির কথাটা মনে পড়ে নি। জোবেদা বিবি বলেছিল—কেতাবের কথা, গানের কথা মিছে কথা রে মালতী। মরদগুলা হল শয়তান বদমাশের জাত। ওরা মরদ কোকিলের মত, ডাকে ভাল কিন্তু বাসা বাঁধে না। দু'দিন পাশে পাশে থাকে—ওড়ে এক সঙ্গে। তারপর ছেড়ে পালায়। কোকিলের

মেয়ে কাঁদে না। কাকের বাসায় ডিম পেড়ে খালাস। মানুষের মেয়েরা তা পারে না—কাঁদে! বলেছিল—মালতী, শাদি না করে মহব্বতি যদি কোন মানুষের মেয়ে করে তবে সে যেন গলায় দড়ি দেয়, নয় তো—

চুপ করে গেল মালতী।

বসন্ত তার মুখের দিকে তাকিয়েই ছিল। বিচিত্র চরিত্র বসন্ত, একালের বিচিত্র নবভাবের মানুষ—সে কৌতুক অনুভব করছিল মালতীর কথা শুনে। মালতী চুপ করতেই সে বললে—নয় তো—কি?

—সে খারাপ কথা। জেলখানায় কথাটা বেরুতো, আটকাতো না। এখানে কেমন আটকে যাচ্ছে জিভে। নিজেরই আশ্চর্য লাগছে।

—বুঝেছি জোবেদা বিবি হয়তো বলেছে বেশ্যা হয়! হয়তো ঠিকই বলেছে। কিন্তু আমি তো তেমন ভালবাসার কথা বলি নি রে। আমার ইচ্ছে তুই এ যুগে এখানে একটা আশ্চর্য মেয়ে হয়ে উঠবি। পড়বি। চিরদিন কেন দোকান করবি? পড়ে কাজ করবি আমার সঙ্গে! কত মেয়ে একালে লীডার হচ্ছে। বিয়ে করছে না—সারাজীবন দেশের কাজ করছে।

—না। বিচিত্র হেসে মালতী বললে—না। ও আমার পোষাবে না। সাধও নাই। তুমি বরং অন্য মেয়ে-চ্যালা দেখো।

—তুই পারতিস মালতী।

মালতী বললে—না পারতাম না। আমার বড্ড মাথা ধরেছে বসন্তদা —আমি শুচ্ছি গিয়ে। যাবার সময় ওই আলোটা নিয়ে যেয়ো।

পরের দিন সকালে চাঁপা আর মালতী দোকান খুলে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে বসতে না বসতে খদ্দের এল। শ্রীমতীর দোকান এখনও খোলে নি। ঠাকুর এখনও আসেনি। টিকৃলি বসে আছে। টিকৃলি বললে—ঠাকুর হয়তো আসবে না দিদি।

—আসবে না? কে বললে?

—কাল ঠাকুর বলছিল।

—কি বলছিল?

—বলছিল—এত খাটুনি। আমি পারব না। মাইনে কম।

—মাইনে তো আমি ঠিক করিনি। কুণ্ডুমশাই ঠিক করে দিয়েছে।

—তা জানি না।

—তুই একবার দেখে আয় না।

টিক্‌লি দেখতে গেল। ঠাকুর থাকে খানিকটা দূরে গন্ধেশ্বরী বাজারের কাছে। বামুনের ছেলে ঠাকুর। প্রৌঢ়বয়সে কেলেঙ্কারী করে ফেলেছে। একটা ছোটজাতের মেয়েকে নিয়ে ঘর করছে। রান্না খুব ভালই জানে। এককালে দে বাবুদের কলিকাতার গদিতে কাজ করত। সেখানে রান্নাবান্না শিখেছিল ভাল। তারপর সেখানেও ওই একটা খারাপ মেয়ের পাল্লায় পড়ে। বহুকষ্টে সেখান থেকে মুক্ত হয়ে দেশে এসে আবার ওই কাণ্ড করে দেশের সমাজে পতিত হয়েছে। লোকে কেউ বাড়িতে ওকে রাখে না। সামাজিক খাওয়াদাওয়াতেও ওর স্থান নেই। এতদিন এখানে 'ওখানে ফিস্টিটিস্টিতে রান্না করে দিত। আর কুণ্ডুব দোকানে বসে থাকত। কুণ্ডুর প্রিয়পাত্র। কুণ্ডু গাঁজা খায়—সেই গাঁজা তৈরী করত ঠাকুর। কুণ্ডুই দোকানে ওকে একটা কাজ দিয়েছিল—সেটা প্রায় চাকরের কাজ। মালতীকে দোকান করে দিয়ে কুণ্ডুই তাকে পাঠিয়েছে। সমাজে না চলুক, ঘরে না চলুক, চা চপের দোকানে কথা উঠবে না এটা কুণ্ডু জানে। লোকটি মন্দ নয়। ভালই। হঠাৎ তার মাথায় মাইনের পোকা উঠেছে। একালের ধর্মই এই।

এদিকে খদ্দের এসেছে। এবা হাটে আঁটের যাত্রী। মানে রাত্রে সড়ক ধরে গরুর গাড়ি করে যাচ্ছিল—পথে ভুবনপুরের হাটে গাড়ি নামিয়ে বিশ্রাম করছে। সকালবেলা প্রাতঃকৃত্য করে আবার রওনা হবে। কিংবা হয়তো গন্ধেশ্বরী বাজাবেই বেচাকেনা করবে। হাটে গাড়ি রেখে ঘুমিয়েছে। সারাদিন এখানে বেচাকেনার কাজ সেরে রওনা দেবে। কিংবা রেজিস্ট্রি আপিসে এসেছে। দলিল রেজিস্ট্রি হবে। দূরে বাড়ি। রাত্রে এসে প্রথম আপিসেই কাজ সেরে ফিরবে।

ভুবনপুরের রেজেস্ট্রি আপিস প্রায় হাটের সামনে—সড়ক রাস্তাটার ওপাশেই, রাস্তার উপরে। বলতে গেলে রেজেস্ট্রি আপিসও হাটের সামিল। কেবল ওদের লাইনটা আলাদা। হাটের ওদিকটায় রাস্তার উপরে পাঁচ. সাতখানা ঘরে রেজেস্ট্রি আপিসের দালালরা কাজ করে। দলিল লেখে। সনাক্ত দেয়। তবে দলিলের মাথায় শ্রীদুর্গা সহায়ের পাশে ৺ভুবনেশ্বর সহায় লেখে। অনেকে ভুবনেশ্বরতলায় এসে প্রণাম করে বলে বাবা সাক্ষী,

খুশী হয়ে বেচলাম—ছেলেপিলে নিয়ে ভোগ কর। আর একজন বলে—বাবার দয়ায় এই বিক্রির দামেই তোমার কাজ সুশেষ হোক। দুঃখ থাকলে ঘুচুক। অভাব থাকলে মিটুক। তারপর প্রসাদী মণ্ডা খেয়ে দীঘির ঘাটে জল পান করে বাড়ি যায়। আজকাল একটা কুয়ো হয়েছে। দীঘির জল দূষিত হয়।. সে জল খায় না। তবে স্পর্শ করে।

নিজেই চা তৈরি করলে মালতী। খদ্দের চারজন। চার কাপ চা সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে—বিস্কুট দোব? ভাল বিস্কুট আছে।

—বিস্কুট? তা দাও খান চার করে। শিঙাড়া হয় নি?

—না। বাসী গরম করে আমরা দিই না। এই সব তৈরী হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হয়ে যাবে।

ফিরে এসে সে মাসীর সঙ্গেই লাগল। শিঙাড়া নিমকির বিক্রি বেশী সকালবেলা, ওগুলো তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। শরীর ভাল নেই। কাল রাত্রে তার ঘুম হয়নি। জেগেই ছিল প্রায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত। ভোর রাত্রে একটু তন্দ্রা এসেছিল কিন্তু সে তন্দ্রাই। এলোমেলো স্বপ্নে ভরা।

কাল রাত্রে সে বসন্তকে কথাগুলো বলে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। মনটা তার কেমন হয়ে গিয়েছিল। এখনই রাগ হচ্ছিল—তারপরই তার মন যেন কান্নায় নুয়ে পড়ছিল। আবার কিছুক্ষণ পর মন ফিরছিল দোকানের কাজের দিকে। তখন কান্না রাগ দুই ঝেড়ে ফেলে দিতে চাচ্ছিল সে। আবার কিছুক্ষণ পরেই আপনাআপনি মন উদাস হয়ে পড়ছিল।

—তুমি নিজে লেগে পড়েছ যে গো?

মালতী ময়দায় জল দিয়ে নিমকির ময়দা মাখছিল। সে মুখ তুলে তাকালে। ঠাকুর বলছে। ঠাকুর এসেছে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। কালকের মনের সেই অবস্থা যেন এখনও রয়েছে। থাকারই কথা। হঠাৎ রাগ হয়ে যাচ্ছে। ভুরু কুঁচকেই সে বললে—খদ্দের—এসেছে। টিক্‌লি বললে—তুমি আজ আসবে না—মাইনে—।

থেমে গেল সে। মনে হল খদ্দেরদের সামনে মাইনের কথা তুলে ঝগড়া না করাই ভাল।

চাঁপা বললে—থাক না মালা। ওই কথাগুলি হবে অখন। নাও এখন কামে লাগ বাবাধন। এত বেলা করে মানিক।

ঠাকুর গায়ের কাপড় খুলে দড়ির আলনায় ঝুলিয়ে দিতে দিতে বললে—মাইনের কথা আমি বলি নাই। ও টিকুলি ভুল শুনেছে। গা জ্বর জ্বর কবছে কাল রাত থেকে। তাই বললাম—কাল তো মঙ্গলবার, হাট নাই, কাল হয়তো—। নাও সর।

মালতী ছেড়ে দিয়ে এসে তার জায়গায় বসল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। মনটা তার আবাব উদাস হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে বসন্ত তাকে তারপবও ডেকেছিল।

—মালতী! শোন।

সে জবাব দিয়েছিল—না বসন্তদা ওই সব কথা আমি শুনতে পারব না। লীডার হতে আমি পারব না। তোমার ওই ভালবাসা আমার সহ্য হবে না। আমি সামান্য মেয়ে—তার উপর জেলফেরত। তুমি মস্ত লীডার মানুষ। তুমি ফিবে যাও, আলোটা নিয়ে যাও। আর বললাম তো শরীর আমার ভাল নাই!

বসন্ত এরপর চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর চাঁপা তাকে ডেকেছিল।

—কত হল আমাদের?

—চার কাপ চা, ষোলখানা বিস্কুট। আট আনা।

—বিস্কুট এক পয়সা কবে?

—হ্যাঁ।

এক টাকার নোট ফেলে দিয়ে লোকটি বললে—বিড়ি দু' বাণ্ডিল।

দাম কেটে নিয়ে পয়সাগুলি নামিয়ে দিলে মালতী। লোকটি বললে—সুপুরি মসলা কিছু নাই?

—এই যে। সুপুরির ডিসটা বের করতে ভুলে গেছে মালতী। মন তাব এখনও কালকের কথায় ঘুরছে। কালকের কথাই তো নয় সে কথা আজকের কথাও বটে। শুধু আজকেরই বা কেন? আসছে কালের কথাও বটে। পরশুর কথাও বটে। সে জেলখানায় প্রথম ধাক্কা সামলাবার পর থেকে বসন্তর কথাই ভেবে এসেছে। মধ্যে মধ্যে জোবেদা তাকে বলত—মালতী, জেল থেকে খালাস পেয়ে খুব হিসেব করে চলবি। খবরদার—অনেকে ভুলাবে তোকে। ভয় দেখাবে। খুন করে

জেল হয়েছে তোর। খুব শক্ত হবি। শাদি করিস্ যদি আঁটঘাট বেঁধে শাদি করবি, খাঁটি শাদি। যেন ভুয়া শাদি না হয়। আর দেহটাই যদি বেচতে হয় তবে গাঁয়ে থাকিস্ না শহরে যাস্। প্রেমের ভুলে ভুলিস্ না। খবরদার।

সে হাসত। বলত—আমার শাদি ঠিক হয়ে আছে। সেও জেলখাটা লোক জোবেদা দিদি। জোবেদা বিবি তার গল্প শুনেছিল। জানত। সে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিল—সেই একদিন মাঠের মধ্যে তোকে বুকে নিয়েছিল বলে বলছিস্। ছোকরা বলছিস্ বামুন। বক্তৃতা করে। একটু থেমে হেসে বলেছিল—তোর জেল আর তার জেল এক নয় মালতী। সে জেল থেকে বাহিরে আসলে তার কালোরঙ গোরা হবে। খাতির বাড়বে। সে শাদি করবে এ আমার মনে নেয় না রে। তার রাগ হত। সে শুধু বলত—তুমি তাকে জান না জোবেদা দিদি। জোবেদা জবাব দেয় নি এর। সে রাত্রে শুয়ে কল্পনা করত বসন্ত তাকে দেখবামাত্র দু' হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নেবে। তারপর বলবে—তোর জন্যে আমি বসে আসি। চল্ সদরে গিয়ে রেজেষ্ট্রি করে আসি। তারপর জেলখানার উঁচু ছাদ আর মোটা দেওয়ালের মধ্যে সে নানান কল্পনা করত। বিয়ের পর কি করবে? কল্পনা তার লীডারী করারই ছিল। কিন্তু সে কল্পনার সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিশত জোবেদা বিবি নীহারদিদির নানান কল্পনার গল্প। বাধাবন্ধ পাপ পুণ্য ন্যায়-অন্যায় সমস্ত চুরমার করে ভেঙে দেওয়া সে এক কামনাবাসনার রাজ্য বল রাজ্য, সংসার বল সংসার।

জোবেদা বিবি ছিল সব থেকে সমঝদার—সব থেকে বেশী জানা মেয়ে। আইন জানত—মানুষের মন বুঝত। বিচার করত পণ্ডিতের মত। তর্ক করত উকিলের মত। বসন্তর চেয়েও ভাল। যেবার সেই বড়লোকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সতীনপোকে বিষ দিয়ে মেরে জেলে এল সেইবার তাকেই বলেছিল জোবেদা বিবি। জোবেদা বিবি সন্ধ্যের পর জমিয়ে বসে খারাপ গল্প বলছিল—সেই বড়লোকের স্ত্রী দূরে বসে ছিল। সে হঠাৎ উঠে এসে বলেছিল—তুমি কি? এই সব গল্প এই সব কথা বলছ?

জোবেদা তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারপর তার চোখ জ্বলে উঠেছিল।—তুমি কখনও ভাব নি? না? মনে মনে?

—না।

—মিছে কথা। দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার, সতীনপোকে বিষ দিয়ে মারে যে সে এসব ভাবে নি? সতী আমাব! পুণ্যবতী আমাব! তুই জপ করিস। তোর ইষ্টদেবতা আছে—বল্ তাকে সাক্ষী করে বল্—ভাবিস নি?

—না—না—না! সে আমার দিকে খারাপ চোখে চাইত তাই—

—মিছে কথা মিছে কথা! তুই চাইতিস—সে চাইত না—হয়তো বাপকে বলে দেবে বলেছিল তাই তুই তাকে বিষ দিয়ে মেরেছিস। দেখ্ আমি স্বামীকে মেবেছি আব একজনকে ভালবাসতাম বলে। তুই আমার চেয়েও পাপী, ভালবাসার লোককে পেলিনি বলে বিষ দিয়ে মেরেছিস!

সে বড়লোকেব মেয়ে কেমন হয়ে গিয়েছিল। এক কোণে তার খাটে গিয়ে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়েছিল।

জোবেদা বলেছিল—পাপ! পুণ্যি! কিসেব পাপ পুণ্যি! তারপর সে মানুষের মনেব যে চেহাবাধ কথা বলেছিল তা শুনে সবাই শিউরে উঠেছিল কি না জানে না মালতী। তবে সবাই চুপ করে শুনেছিল, অনেকে মুচকে মুচকে হেসেছিল কিন্তু মালতী মনে মনে শিউরে উঠেছিল। আবার অবাকও হয়েছিল। যেন সত্যিই বলেছে জোবেদা।

পরে জোবেদাকে সে এ কথা বলেছিল। এক শান্ত অবসরে, নিভৃতে জোবেদা হেসে বলেছিল—তোর মনটা কচি রে মালতী। বড় বাচ্চা আছিস তুই! মানুষের মন রে—সে সুখ নইলে বাঁচে না। সুখের পথে পাপ পুণ্য বাছাবাছি তার নাই। বাছতে সে চায় না। এ হল দুনিয়ার নিয়ম। মানুষ পাপ পুণ্য বেছেছে তৈরি করেছে। দুঃখ সয়ে পুণ্য করে কেঁদে যারা সুখ পায় তাদিকে সেলাম। পাপ করে লজ্জার ভয়ে বিষ খায় গলায় দড়ি দেয়, আবার পুণ্যি করার দুঃখ সইতে না পেরে গলায় দড়ি দেয় বিষ খায়। এও যেমন ঝুট সেও তেমনি ঝুট। দেখ্—আমি নিজেব সুখের জন্য স্বামীকে বিষ দিয়েছি। ওই বড়লোকের বউটা আরও পাপী। তুই পাপী নস। বাপকে বাঁচাতে হঠাৎ খুন করে ফেলেছিস। আমি জজ হলে তোকে খালাস দিতাম। তবু তুই দাগী হয়ে গেলি। বাইরে গিয়ে শুধু এই মনে রাখিস—দুঃখ কাউকে দিস না। দুঃখ করে সুখও খুঁজিস না। আবার সুখের লেগে পাগল হয়ে সুখ খুঁজিস না।

আড়াই বছরে আকণ্ঠ কামনার তৃষ্ণা নিয়ে সে ফিরেছিল। দেহের

রোম কূপে কূপে তার কামনা। কিন্তু বসন্ত তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করেছে এই আশাও তার ছিল অফুরন্ত। সব আশ্চর্যভাবে যেন গোলমাল হয়ে গেল। বেরিয়ে এসে সাত আট দিন—যত দিন বসন্ত আসে নি তত দিনও তার স্বপ্ন আশা সব ঠিক ছিল ; তার জেলখানার বাতাসে জলে তৈরী বাসনার রাজ্যের সঙ্গেও কোন বিরোধ ছিল না। ভুবনপুরে ঢুকে সে আশ্চর্য হয়েছিল—কিছুই চেনা যায় না। সব বদল হয়ে গেছে। বদল ঠিক নয় সব যেন উজ্জ্বল ঝকঝকে ঝলমলে হয়ে উঠেছে। তার আশাও আরও উজ্জ্বল হয়েছিল। বসন্ত উজ্জ্বলতর হয়েছে মাসী তাকে বলেছিল। কাল সকালে বসন্ত যখন বিয়ে না-করে ভালবাসার কথা বলছিল তাতেও সে নেশার ঘোরে সায় দিয়েছিল। কিন্তু কাল বিকেলে হাটের সময় বসন্ত ওই একটি লোককে যে সব কথা হাসতে হাসতে বললে তাতে তার একটা আতঙ্ক হয়ে গেল, যে আশা তার উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল সে আশা কালো হয়ে গেল। বসন্ত হয়তো দেবতা। না হয়তো খুব খারাপ। দু'দিক দিয়েই হাত বাড়ানো তার নাগালের বাইরে।

—"বিয়ে আমি করব না।" এ কথাটায় সেই মাঠের কথাটা মনে পড়েছিল।—"আমি তোকে ভালবাসি। জাত মানি না। বাবা মরলেই তোকে আমি বিয়ে করব।"

খচ করে বুকে যেন একটা খোঁচা বিঁধেছিল।

যেমন একটা নিষ্ঠুর কোপের মত আঘাত সে অনুভব করেছিল—বাসুদেব দোবেকে কোপাবার পর তার রক্তাক্ত দেহ দেখে—তেমনি নিষ্ঠুর আঘাত। জেলে ঢুকবার সময় যেমন ভয় হয়েছিল তেমনি ভয়। আদালতে রায়ের সময় যেমন সে অসাড় হয়ে গিয়েছিল তেমনি অসাড় হয়ে গিয়েছিল সে।

তাই রাত্রে হাটের পর মাসীকে বাড়ি পাঠিয়ে সে গিয়েছিল ভুবনেশ্বরতলায় এই কুঁচলতা জড়ানো অশথগাছটার দিকে। একটা টর্চ নিয়ে গিয়েছিল। আর একটা ছাঁকনা। সেই ছাঁকনার আঘাতে সে সেই বাঁধা ঘুটিংকে কেটে কেটে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

ভুবনপুরের হাটে কতজনের বাঁধা ঢেলা খসে পড়ে যায়। ভুবনেশ্বর বলেন 'পূরণ' হবে না। ঢেলাগুলো মাটির তলায় ধুলোর মধ্যে হারিয়ে যায়। লাভের আশায় এসে কতজন লোকসান করে ফিরে যায়। তার ঢেলাটাও যাক্।

বাড়ি ফিরে বসন্তকে ফিবিয়ে দিয়েও সে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। ভাবছিল। কখনও কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু কাঁদেনি। কখনও কখনও দারুণ ক্রোধ হচ্ছিল—সেও সে সামলাচ্ছিল। কখনও ইচ্ছে হচ্ছিল সে নিজেই মরে। কিন্তু তাও যেন পাবা যায় না। থমকে দাঁড়াতে হয়। ভয় কবে।

মাসী এসে তাকে ডেকেছিল। দবজা খুলে দিয়ে সে ফিরে এসে আবার শুয়েছিল বিছানায়। মাসী মাথাব শিয়বে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল—মালা!

মালতী উত্তব দেয় নি।

মাসী বলেছিল—লেখাপড়া শিখ্যা—বসন্ত যা কইল—লীডাব হতে পাবব না?

—না!

আবাব কিছুক্ষণ পব মাসী বলেছিল—এব থেক্যা চল মাসী আমরা নবদ্বীপ যাই। মাসী বুনঝি—মা বেটী—

মধ্যপথেই মালতী বাধা দিয়ে বলেছিল—না!

আবাব কিছুক্ষণ পব মাসী বলেছিল—কি করবা?

—যা কবছি। ভুবনপুবেব হাটে বেচাকেনা কবেই চলবে মাসী!

—সাবাজীবন মালা—

—হ্যাঁ মাসী। অনেক লাভ করব। পয়সা করব। হাসব খেলব—কেটে যাবে।

মাসী আর কথা বলেনি।

মালতী বলেছিল—আলোটা নিয়ে গেছে মাসী?

—হুঁ।

—চল মাসী ভাত খাইগে। ক্ষিদে পেয়েছে। কাল একটা হেজাক বাতি কিনব।

নিমকি শিঙাড়া ভাজার গন্ধ উঠছে। দালদার গন্ধ। শব্দ উঠছে—দালদা ফুটছে কড়াইয়ে।

দুজন লোক হাটের সীমানায় ঢুকছে। এখনও ওপাশেব দোকানগুলো খোলেনি। এখনও সকাল রয়েছে। খাঁ-খাঁ করছে হাটতলাটা। জমাদার বসে ঝিমুচ্ছে। হাটের দিন জমাদারেরা আকণ্ঠ মদ খায়। গুঁইদের

দোকানে ঝাঁট পড়েছে। আশ্চর্য আজ শ্রীমতীর দোকান এখনও খোলে নি। কতকগুলো হনুমান লাফালাফি করছে খেলা করছে গুঁইদের ছাদে। গাছের উপর বসে গোদাটা মধ্যে মধ্যে চেঁচাচ্ছে।

মাসী বললে—টুলু চৌধুরী আসে, সঙ্গে মক্কেল যেন শাঁসালো। ঠাকুর চেন না কি?

ঠাকুর দেখে বললে—না। বাইরের লোক।

—বেশ শাঁসালো লাগে না?

—হ্যাঁ।

—এই দিক পানে আসে

—চা খাবে। ওই তো আঙুল দেখাচ্ছে। টিক্‌লি বেঞ্চিটা মোছ! ভাল করে।

মালতী তাকিয়ে দেখল। হ্যাঁ টুলু চৌধুরী তো। এসে অবধি ওকে দেখে নি মালতী। টুলু চৌধুরী রেজেস্ট্রি আফিসে দলিল লেখে। এখানকার জায়গা জমির খবর খতিয়ান দাগ নম্বর সব ওর হাতে। আবার মামলা মকদ্দমার তদ্বির করেও বেড়ায়। বয়স হয়েছে অনেক। বসন্ত ওকে বলত —টুলু পাণ্ডা। একালের আসল পাণ্ডা। ভুবনেশ্বরের পাণ্ডা। আর টুলু হল বিষয়েশ্বরের পাণ্ডা। রেজেস্ট্রি আপিসটা হল বিষয়েশ্বরের মন্দির। ভুবনেশ্বর আদর কম হওয়ায় একালে বিষয়েশ্বর হয়ে বসেছেন। ভূতি সরকারকেও তাই বলত।

ভূতি এবং টুলুর সামনেই বলত।

টুলু বলত—থাম রে বাবা থাম। নবুঠাকুরের ভিটেতে বসে লীডারির আপিস করেছিস। ওই ভিটের দলিল কেন্দুলীর মেলায় এই পাণ্ডা ছিল বলেই হয়েছিল। আমি লিখেছি দলিল। খতেন দাগ নম্বর সব আমার ঠোঁটস্থ—তোর বাবা হাতে ধরে বললে, লিখে দিলাম। শ্রীমন্ত দুটো টাকা দিয়েছিল তার দলিলের জন্য। তোর বাবার কাছে পয়সা নিই নি! আজ বলবি বইকি পাণ্ডা।

হঠাৎ খোকাঠাকুরকে মনে পড়ে গেল। তার গান করা মনে পড়ল। তার বাবার সঙ্গে গাঁজা খাওয়া মনে পড়ল। তারপরই মনে পড়ল ধরণী জেঠার কথা।—মা এককথায় দলিলে সই করে দিয়ে চলে গেল।

বসন্ত বলত—পাগলা। একটা উল্লুক।

ওস্তাদ বলত একটা গর্দভ! মাথায় গোবর পোরা আছে!

টুলু চৌধুরী আর সেই ভদ্রলোকটি এসে দোকানে ঢুকল। টুলু বলল—বেশ ভাল চায়ের দোকান হয়েছে তোমার মালতী। আমাকে চিনতে পারছ তো?

মালতীকে উদাসীনতার মধ্যেও সচেতন হতে হয় খদ্দের এলে। এ ক'দিনেই তা একটু একটু করে অভ্যাস হয়ে আসছে। সে একটু হেসে বললে—চিনতে পারব না কেন? আপনি টুলুকাকা!

—ঠিক চিনেছ। দাও আমাদের চা দাও। আর খাবার কি হয়েছে? নিমকি শিঙাড়া। তাই দাও। ঠাকুরও ভাল পেয়েছ। ঠাকুর ইনি শহরের লোক। খাস বর্ধমানের। ভাল করে ভাজ। বুঝলে!

মালতী নিজে উঠে এসে বেঞ্চিটা পরিষ্কার করে দিলে। এবং চায়ের জায়গায় এগিয়ে গেল। টুলু চৌধুরী আর বর্ধমানের ভদ্রলোকটি মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল। হঠাৎ টুলু বললে—মালতী ওই ভাল সিগারেট কি আছে দাও দেখি।

ভদ্রলোকটি বললে—গোল্ডফ্লেক। টিন রয়েছে—খোলা না গোটা আছে?

—গোটাও আছে। মালতী চায়ে দুধ মেশাতে মেশাতে বললে। চা দু' কাপ এনে নামিয়ে দিয়ে সিগারেটের টিন এনে দিলে। টুলু বললে—মালতী ইনি বসন্তের খোঁজে এসেছেন। বসন্ত তোমার বাড়িতে আছে না কি?

মালতী চকিত হয়ে তার দিকে তাকালে। খপ্ করে রাগ হয়ে গেল তার। ভুরু কুঁচকে বললে—আমার বাড়িতে?

—হ্যাঁ। উনি ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছিলেন গোপার বাবার ওখানে। তা ওরা বলেছে এখানে নেই, কোথা তারা জানে না। তা বসন্ত একখানা বাড়ি করেছে—সেখানে গিয়েছিলেন—সেখানেও আসে নি। ওইখানে শ্রীমতী বললে তোমার বাড়িতে উঠেছে।

বেশ কঠিন কণ্ঠে মালতী বললে—না। আমার বাড়িতে কেন উঠবেন তিনি? তবে কাল এসেছিলেন।

—হ্যাঁ সেই তো! কাল দোকানে এসেছিল। শ্রীমতী বললে নতুন হেজাক বাতি কিনে দিয়ে গিয়েছে। তারপর—

—হ্যাঁ সন্ধ্যের পরও একবার গিয়েছিলেন। তা আমার বাড়িতে উঠবেন কেন?

—তুমি রাগ করছ ক্যানে! আগে তো বসন্তের তোমাদের বাড়িতে আড্ডা ছিল। তোমাদের বাড়িতে ভাত পর্যন্ত খেতো।

স্তম্ভিত হয়ে গেল মালতী। কি বলতে চায় টুলু চৌধুরী?

টুলু বললে—খেতো না?

মালতী বললে—খেতো। থাকত। আড্ডা ছিল আমাদের বাড়িতে।

—তাই তো বলছি।

—তখন তার ভাল লাগত—আমাদেরও ভাল লাগত—

—ভাল লাগত?

—বেশ ভালবাসতাম। আসত থাকত খেতো। এখন ভাল লাগে না ভালবাসি না। কাল এসেছিলেন—চলে গেছেন। কিন্তু আপনি চান কি? বলুন তো!

ভদ্রলোকটি বললে—তুমি মিছে চটছ বাপু। সে কোথায় উঠেছে তাই জানতে চাচ্ছি।

—তা আমি জানি না।

—তোমাকে বলে নি?

ঝট করে মনে পড়ে গেল বসন্ত বলেছিল সে গোপাদের বাড়িতে উঠেছে। তবু সে বললে—না।

টুলু বললে—ভালবাসা চটল কি করে মালতী? কাল তো তোমার দোকানে নতুন হেজাক কিনে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছে শুনলাম!

—আপনাদের হল?

—ঠাকুর আর দুটো শিঙাড়া আর দুটো নিমকি দাও।

ভদ্রলোকটি বললে—তুমি তাকে বলে দিয়ো বর্ধমানের—

মাঝপথে বাধা দিয়ে মালতী বললে—মাপ করবেন—আমি কাউকে কিছু বলতে পারব না।

—তাতে তার ভাল হবে—

—তার ভাল সে দেখবে। তার ভাল মন্দর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

বিশ্বভুবন যেন তেতো হয়ে গেল এই সকালবেলায়।

তেতো মন নিয়েই বসে ছিল। খদ্দের আসছে যাচ্ছে। বেশীর ভাগ আজ রেজেস্ট্রি আপিসের খদ্দের। মালতী চুপ করে বসেই ছিল। এর মধ্যে

একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল। হনুমানগুলো খেলা করছিল গুঁইদের ছাদে এবং তার পাশের আমগাছে। দুটো বাচ্চা হনুমান লাফালাফি করতে করতে ইলেকট্রিকের তার লাফিয়ে ধরে আর্তনাদ করে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। মরে গেল। মা-টা ছুটে এল—এসে তার সে কি আকুতি! নেড়ে চেড়ে ডেকে—সে আকুতি দেখে মালতীর চোখে জল এল। মা শেষ পর্যন্ত মরা বাচ্চাটাকেই বুকে তুলে এক হাতে ধরে গাছের উপর উঠে গেল।

বসে থাকতে থাকতে তার অকস্মাৎ মনে হল সেও ঠিক এমনি করে মরা ভালবাসা বুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে।

—সেই চপ না কি বলে—আছে? একটি তরুণ আর একটি তরুণী। বিস্ময়ের সীমা রইল না মালতীর। কালকের সেই লখাই আর সেই কালো মেয়েটি যে চপ কিনতে এসে দাম শুনে পালিয়েছিল।

—তুমি তো লখাই?

—হ্যাঁ।

—তুমি তো কাল চপ কিনতে এসেছিলে। দাম শুনে পালিয়ে গেলে?

লখাই বললে—না। উ কাল আমাকে দেখে পালিয়েছিল।

—তোমাকে দেখে? কেন?

—উ আমার বউ। আগ করে তিন মাস বাপের বাড়ি পালিয়ে আইচে। চপ খেতে মন হয়েছিল। কিনতে এসে আমাকে দেখে—

একটু হেসে চুপ করে লখাই।

মালতী বললে—তাই তুমিও বুঝি পিছন পিছন ছুটেছিলে!

—হুঁ। এখন বাড়ী চললাম ওকে নিয়ে। তা বলি—খা চপ খা। কাল ত খেতে এসে খেতে পাস নাই!

প্রসন্ন কৌতুকের আনন্দে মুহূর্তে মালতীর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। সে একা নয়, চাঁপা হেসে উঠল, ঠাকুর হেসে উঠল, টিকলি খিলখিল করে হেসে উঠল। মেয়েটা লজ্জায় ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বললে—খাব না আমি চপ। তুমি চল।

মালতী বললে—না—না—না! বস তোমরা দুজনে বস। ভেতরে এসে বস। ঠাকুর চপ তৈরী করে দাও। সব ছেড়ে চপ ভাজ। সব তো ওবেলার জন্যে তৈরী করাই আছে?

—দশ মিনিট। এখুনি দোব।

মেয়েটি কিন্তু কিছুতেই ভেতরে এল না। দোকানের একপাশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। হাসিমুখে চেয়ে রইল মালতী ধুলোভরা বে-হাটবারের হাটের দিকে। চোখ একবারও পড়ছে না যেখানটায় হনুমানটার বাচ্চাটা পড়ে মরেছিল সেখানটার দিকে।

হাটতলায় রোদ ঝলমল করছে। সকালবেলা পুবদিকের ক'টা বড় বটগাছের ছায়া পড়ে। সূর্য গাছগুলোর মাথায় উঠেছে। অল্প অল্প গরম হয়ে রোদ মিষ্টিও হয়েছে। মালতীর মনের মধ্যেও খুশীতে ভরে গিয়েছে। বসন্ত না, টুলু চৌধুরী না—কোন কিছু নেই সেখানে। মনের এক কোণে ওর বাসুদেবের মাথাটা পড়ে থাকে—সেটা আছেই পচে না। ভুবনেশ্বরতলায় বাঁধা ঢেলা পড়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে লাখে লাখে কিন্তু বাসুদেবের মাথাটা মনের মধ্যে পচেও না হারায়ও না। সেটা আশ্চর্যভাবে যখন তখন মনের চোখে পড়ে। বেশী করে খুশীর সময়। গোল মাথাটা যেন ঢালে গড়িয়ে এসে মাঝখানে থামে। সেটাও আসছে না।

ভুবনপুরের হাটমাহাত্ম্য সত্যি। এই সুখ এই দুখ, এই দুখ এই সুখ। আজ লাভ কাল লোকসান, কাল লোকসান পরশু লাভ। আজ জুড়লে কালকে ফাট এই হল ভুবনপুরের হাট। আজ ফাটলে কালকে জোড়া যার হয় না তার কপাল পোড়া।

চমকে উঠল মালতী।

গোঁ গোঁ শব্দে প্রবল গর্জন করে খান তিনেক জীপ গাড়ি রাস্তা থেকে বেঁকে হাটের ঢালে বট অশথের বেরিয়ে থাকা শিকড়গুলোর উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ঢুকে পড়ল হাটে। সামনের জীপে একজন হাত বাড়িয়ে পথ দেখাচ্ছে। যেতে যেতে থামল জীপখানা। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের গুলো।

টপ টপ করে নেমে পড়ল হাওয়াই সার্ট পেণ্টুলুন পরা দেশী সায়েব। আট দশ জন।

—দেখ—চা দেখ। জলদি করতে বল।

একজন ব্যস্ত হয়ে এসে বললে—ভাল কাপ ডিস আছে তো? দেখি!

মালতী ব্যস্ত হয়ে বললে—নতুন আছে স্যর, বের করে দিচ্ছি।

স্যার সে জেলখানায় শিখে এসেছে। পোশাক দেখে রকম দেখে বুঝেছে এরা সরকারী কর্মচারী।

চায়ের কাপ কেনা ছিল। থাকে দোকানে। চায়ের কাপ ডিস ভাঙছেই ভাঙছেই। সব কাপ ডিস বের করে ও নিজেই ধুতে বসে গেল।

একজন কর্মচারী জিজ্ঞেস করলে—ওইটে তো বট অশথতলা ভুবনেশ্বরের ?

ঠাকুব বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাপ ডিস ধুয়ে এনে সাজালে মালতী টেবিলের উপর। জলটা এখনও ঠিক ফোটে নি। সে এগিয়ে এসে বললে—বিস্কুট আছে ভাল। দোব স্যার ?

সকলেই তার দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রয়েছে। মালতী রাঙা হয়ে উঠল একটু। মুখ নামিয়ে বললে—দোব স্যার ?

—কি বিস্কুট ?

—থিন অ্যারারুট—সার্কাস—

—বাঃ! দাও চারখানা করে দাও।

মালতী বয়ান খুলে বিস্কুট বার করতে লাগল। শুনতে পেলে একজন বলছেন—ভদ্রলোকের মেয়ে মনে হচ্ছে। চায়ের দোকান করছে। দোকানের মালিকের আইডিয়া আছে!

মনে মনে প্রচুর কৌতুক অনুভব করলে মালতী। চাঁপা অবাক হয়ে গেছে মালতীর কথাবার্তা বলবার রকম দেখে! এতটুকু ভয় নেই! তা মালতীর নেই। জেলে জেলার জেল-সুপারদের সে দেখেছে—মধ্যে মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলারও অভ্যাস আছে। বিস্কুট বের করে সে ঠাকুরকে বললে—ঠাকুর বেঞ্চি দুখানা বের করে দাও। সাহেবরা বসুন।

এর মধ্যে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। টুলু চৌধুরীও আছে।

সায়েবরা চা খেয়ে খুশী হয়ে দাম দিয়ে বললেন—বেশ তোমাদের সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওপারে আমাদের সেটেলমেণ্টের ক্যাম্প পড়ছে। দোকান ভাল করে কর।

জীপ হাঁকিয়ে চলে গেল সায়েবরা ওই অশথ বট বনের ওদিকে। দোকানের সামনে দিয়ে—ভুবনদীঘির ঘাটের উপর দিয়ে—চুলকাটার জায়গাগুলো মাড়িয়ে মড় মড় করে গোঁ গোঁ করে চলে গেল।

মালতী খুশী হয়ে গেছে খুব। সায়েবরা সব খুশী হয়েছে। এতটুকু ভুল করে নি। এতটুকু ভয় করে নি।

ঠাকুর বললে—মাসী এবার আরও লোক রাখ। খদ্দেরের ভিড় খুব হবে।

মালতী ভাবছিল চেয়ার টেবিল হলে ভাল হয়। আরও জায়গা হলে ভাল হয়।

টিকৃলি ছিল না—সে ওই লখাই আর তার বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গিয়েছিল। সে ফিরে এল। বললে—মজার খবর মালতী-দিদি! চিমতী দোকান খোলে নাই ক্যানে জান? সে, তার কে হয়—বিধবা অল্পবয়সী মেয়ে, তাকে আনতে যেয়েছে! দোকানে বসাবে!

মালতী হাসলে। কিন্তু সে নিয়ে মনে তার কোন চঞ্চলতা এল না। দোকানের কথা ভাবছিল। ভাল স্নুন্দব দোকান।

॥ সাত ॥

দু'বছর পর। ভুবনপুরের হাটে সোমবারের হাটের সকালবেলা। হাট বিকেলে বসে কিন্তু সকাল থেকেই যেন হাট বসে গেছে। অনেক মানুষ এসে জমেছে হাটতলায়। অন্ততঃ একশো দেড়শো। দোকানও এসে বসে গেছে। তবে তরকারির কাঁচা বাজার নয়। তালপাতার চ্যাটাই কুলো ডালা আসে নি। তবে মোড়া এসেছে—খেজুর চ্যাটাই এসেছে। খাসী মুর্গী আসে নি তবে একটা গাছতলায় ডালে কাটা পাঁঠা ঝুলছে। কার ফিতে ফেরিওলা এখনও আসে নি। খাবারের দোকান খুলেছে, চায়ের দোকানে লোকের ভীড়ের শেষ নেই। ধরণী দাস প্রভৃতিরা কাপড়ের দোকান খুলে বসেছে। পান বিড়ি সিগারেটের দোকান বসেছে—টবের বাক্স নিয়ে ফলওয়ালা দোকান তুলেছে।

হাটের চেহারাও পালটে গেছে। হাটের মাঝখানের জায়গাটা ঘিরে চারিপাশেই কায়েমী দোকানঘর গড়ে উঠেছে। পাকা ইটের দেওয়াল পাকা ছাদ। পাকা দেওয়াল টিনের চাল। মাটির দেওয়াল টিনের চাল খড়ের চাল। একখানা দুখানা নয়।

টুলু চৌধুরীই শুনছিল, শুনে হরিপুরের বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী এককালের

জমিদার পাটু চক্রবর্তীকে বললে—তের নয় বারো। ওই যে ফলওয়ালার আর তরকারি পরোটার দোকান ওটা একখানাই। মাঝখানে পাঁচিল থাকলেও চাল একটা। মালিক একজন। ভাড়াটে দুজন। আমাদের হরি মিস্ত্রি পাণ্ডা ছিল—তার পরিবারের গহনাটহনা বেচে ঘরটা করলে, প্রতুল ঠিকেদার ঠিক এক মাসে তুলে দিলে। ওই ঘর করে ভাড়া দিয়ে বিধবা বেঁচে গেল। দুটো দোকানে তিরিশ টাকা ভাড়া। প্লট একটা—ভুবনপুর মৌজার তিনশো চার খতেনের পঁয়ত্রিশ নম্বর প্লট।

পাটু চক্রবর্তী বসে ছিল গাছতলায় একটা মোড়ার উপর। নতুন মোড়া। একখানা খেজুর চ্যাটাইয়ে তার কর্মচারীরা বসে আছে। দাঁড়িয়ে আছে টুলু চৌধুরী।

সব সেটেলমেণ্ট আপিসের মামলায় এসেছে। কারও উপর নোটিশ হয়েছে—কাগজ দেখাতে হবে। কেউ এসেছে ডিসপিউট দিতে। তার জমি অপরের নামে রেকর্ড হয়েছে। কিছু নিরীহ মানুষ কিছু জটিলচরিত্র বিষয়ী লোক। নিরীহদের জমি তাদের নামে ওঠে নি। কুটিলচরিত্রের বিষয়ীরা এসেছে সম্পত্তি বেনাম করে রেকর্ড করাতে অপর একজন বিষয়ীর সঙ্গে এক জমি নিয়ে জটিল জট পাকিয়ে। এখন থেকেই তারা সাবধান হচ্ছে। জমিদারি গিয়েছে—জমিও নাকি পঁচিশ তিরিশ একরের বেশী থাকবে না, সেগুলি এখন থেকেই তারা দলিল করে ছেলে বউ মেয়ে নাতিদের নামে আলাদা আলাদা নামে রেকর্ড করাচ্ছে। জমিদারেরা জমিদারির খাস পতিত যা জমিদারির স্বত্বের সঙ্গে জড়ানো—পতিত জমি, মাঠের পুকুর, বিল, খাল সেগুলিকে যা পাচ্ছে সেলামী নিয়ে বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। নইলে জমিদারির সঙ্গে ওগুলিও চলে যাবে সরকারের হাতে। পুরনো আমলের চেক কেটে পুরনো স্ট্যাম্প ডেমিতে লিখে দিচ্ছে। চাষীরা বুভুক্ষুর মত গিলছে। চাষীদের যাদের জোতজমা আছে তাদের অবস্থা এখন ভাল। ধানের দর দশ টাকার নীচে নামে না। আষাঢ় মাস থেকে উঠতে উঠতে ষোল সতের আঠারোতে ঠেকছে। তাদের জমির ক্ষুধা আশ্চর্য। ডাঙ্গা বাছে না, খাল বাছে না, বিল বাছে না—নিয়েই যাচ্ছে। তারাও আইন জানে। জমিদারদের থেকে কম বোঝে না। তাদেরও সমস্যা আছে পঁচিশ একর তিরিশ একরের—তারাও এসেছে সেটেলমেণ্ট আপিসে। এদের চোখে স্ফূর্তি, মুখের কথায় কৌতুক। ঠোঁটে হাসি। যারা নিরীহ তাদের চোখ

মুখ দেখলেই ধরা যায়। শঙ্কিত ত্রস্ত দৃষ্টি। সর্বাঙ্গে একটি অসহায় অক্ষমতার ক্লান্তি। এরা আজ দু'বছর হাঁটছে এখানে। প্রথম প্রথম কম ছিল—এখন যত দিন যাচ্ছে তত বেশী লোক আসছে, পাঁচ দিন সাত দিন অন্তর আসছে। দিনের পর দিন পড়ছে। অনেকে দিন না থাকলেও আসছে। সেটেলমেন্টের কর্মচারীরা বলছে—কাজ পাহাড়ের মত—সে হাতে ঠেলে কতটুকু ঠেলব। আমরা তো হাতী নই। জানোয়ার নই—মানুষ।

লোকে বলছে ঘুষের প্যাঁচ।

দুই-ই সত্যি। এই দুই সত্যের টানা পোড়েনে ভুবনপুরের হাটে নিত্য হাটের মত ভিড়। এই ভিড়ের পায়ে পায়ে চারিপাশে আর ঘাসের চিহ্ন নেই। হাটের মাঝখানটা খাল হয়ে যাচ্ছিল বলে ইট বিছিয়ে জোড়ের মুখে মুখে সিমেন্টের পয়েন্টিং হয়েছে। দোকানীরা যাদের জমি নিজেব ছিল তারা কায়েমী ঘর করেছে। পাণ্ডারা দে বাড়ির শরিকেরা আপন আপন জায়গায় ঘর তুলে ঘর ভাড়া দিয়েছে। তার মধ্যে দোকান বসে গেছে। মোড়াওয়ালা খেজুর চ্যাটাইওলারা এখন রোজ আসে। রোজই পাঁচটা দশটা মোড়া বিক্রি হয়। খেজুব চ্যাটাই কেনে লোকে বসবার জন্যে। কাঠওয়ালার দোকানে চেয়ার টুল বিক্রিও হয়, ভাড়াও মেলে।

পাটু চক্রবর্তীর মোডাটা কিন্তু বাড়ি থেকে আনা। চামড়া দিয়ে বাঁধানো। শান্তিনিকেতনী মোড়া। টুলু চৌধুরীবও এখন খুব চ"তি, বলতে গেলে সেটেলমেণ্ট আদালতে উকিল মোক্তারের কাট ক"টে। হাটের মধ্যে নতুন আপিস করছে। বেজেস্ট্রি আপিসের কাজের জন্যে পুবনো আপিসটা ঠিক আছে—সেটা ওর ছেলে চালায়। পাটু চক্রবর্তী টুলু চৌধুবীর মক্কেল। পাটু চক্রবর্তী এই প্রথম আসছে বলতে গেলে। এবার স্বত্বের একটা জটিল প্যাঁচ। তবে এর আগে রেজেস্ট্রি আপিসে এসেছে বছর দেড়েক আগে।

চক্রবর্তী দেড় বছর আগের সঙ্গে এখানকার হাটের চেহারা দেখে বিস্ময় প্রকাশ ঠিক না করলেও তারিফ করছিল। কায়েমী ঘরেব সংখ্যা গুনতে গিয়ে তার হল তেরখানা—টুলু চৌধুরী সংশোধন করে বললে—বারোখানা। টুলু চৌধুরীর একটু বেশী কথা বলা অভ্যেস, না বললে আর চলেও না; খতেন নম্বর প্লট নম্বর আপনি বেরিয়ে আসে মুখে।

চক্রবর্তী চারিদিক তাকিয়ে দেখে বললে—মালতীর রেস্টুরেন্টটা কিন্তু

আচ্ছা হয়েছে। অল্প জায়গার উপর সুন্দর করেছে। দেড় বছর আগেও টিনের চাল টিনের দেওয়াল ছিল। একেবারে পাকা দালান বানিয়ে ফেললে। ইলেকট্রিক লাইট।

টুলু বললে—ওর কথা বাদ দেন। খুনে মেয়ে—জেল খাটা মেয়ে—পাখোয়াজ মেয়ে। তার ওপর জেলে যাবার আগে শাগরেদ ছিল বসন্ত বাঁড়ুজ্জের। গান গেয়ে মিটিং করে বেড়াত।

—অকর্ম কিছু নাই—না ?

—শুনি তো। কুণ্ডুকে শুষে নিলে! কুণ্ডুর জায়গাতেই তো ঘর! কুণ্ডু লিখে দিয়ে গিয়েছে, একতলায় ওই দোকান-ঘর আর একখানা ঘর সেই করেও দিয়েছে। ওপরতলাটা ও নিজে করেছে।

—শুনেছি বটে। বুড়ো বয়সে কুণ্ডুর মতিভ্রম হয়েছিল। পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। প্যারালিসিস।

—হ্যাঁ। তখন মেয়েটা সেবা করেছে ওর। তা করেছে! ও এক আশ্চর্য মেয়ে মশাই। প্রথম বললাম না বসন্তের মেয়ে চেলা ছিল। তখনই বসন্তের সঙ্গে খারাপ হয়েছিল। ও আর গোপা। বসন্ত তো কেষ্ট ঠাকুর। হাজার গোপিনী। সব নাকি ওর বান্ধবী। প্রথম প্রথম বলত বিয়ে করব না। ব্রহ্মচারী থাকবে, লীডারি করবে। এ মেয়েটা মানে মালতী যখন জেল থেকে ফিরল তখন বসন্ত গোপার সঙ্গে জড়িয়েছে। এটা কি করবে ? ও কুণ্ডুকে ধরলে! তা বসন্তও গুছিয়েছে গোপাকে বিয়ে করে। এও গুছিয়েছে!

একজন কর্মচারী ছুটে এল—বাবু, সায়েব ডাকছে। খুব চটেছে।

চক্রবর্তী বিষয়কর্মে ধীর মানুষ, বিচলিত সহজে হয় না, সে বললে—ক্যানে হে ? খিদে লেগেছে সায়েবের সবুর সইছে না ?

টুলু বললে—বলছি আপনাকে লোকটা রগচটা। টাকাটা আগে থেকে দিয়ে রাখলে ঠাণ্ডা থাকত।

—তুমিই তো দেরি করলে। কথায় মজে গেলে। তা মজার কথায় মজে সবাই। তুমিও মজেছ আমিও মজেছি। নাও—টাকা নিয়ে যাও।

কর্মচারী বললে—আপনাকে যেতে হবে। ডাকছে।

—আমাকে যেতে হবে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

টুলু বললে—চলুন না। কি হবে! একবার তো হাজরে দিতেই হবে।

উঠল চক্রবর্তী বাবু। মোটা মানুষ, তার উপরে মানুষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা অভ্যাস। তবু চলতে হচ্ছে দায়ে পড়ে একে পাশ কাটিয়ে ওকে এড়িয়ে। হাটের প্রাঙ্গণটায় এখনও সকালের রোদ উঠতে দেরী আছে? উঠলে আরও একটু আরাম হবে। অগ্রহায়ণের শেষ। শীতও এবার ঘন। হাটের দোকানে কেনা বেচা চলছে। বেশীর ভাগ খাবার পান বিড়ির দোকানে। চায়ের দোকানে বেশী ভিড়। মালতী রেস্টুরেণ্টে ছখানা টেবিলে ছাব্বিশ সাতাশখানা লোহার চেয়ারের একটাও খালি নেই। শ্রীমতীর দোকানেও ভিড়। শ্রীমতীর দোকানও বেড়েছে। মাটির ঘরে পাকা থামের উপর টিনের চালের বারান্দা ছিল—সেটা ছাদ হয়েছে। পাশে একখানা ঘর বেড়েছে। উপরে কোঠা হয়েছে। টুলুর আপিস শ্রীমতীর কোঠায়। সে বললে—দাঁড়ান, আমি জামাটা পালটে আসি। জামাটায় ঘামের গন্ধ। অফিসারটা চটে ঘামের গন্ধে।

শ্রীমতীর দোকানেও সামনে চেয়ারে বসে আছে একটি যুবতী বিধবা মেয়ে। সুন্দরীও বটে যুবতীও বটে, হাসেও খুব। কিন্তু একটু বেশীরকমের হালকা অশালীন।

শ্রীমতী চক্রবর্তীকে চেনে। সে হেসে বললে—বাবু যে গো!

—হ্যাঁ চিনতে পারছ?

—আপনাকে চিনতে পারব না?

—না। বুড়ো হয়েছি তো।

—আমি হই নাই না কি? তা চা খান!

—না। ডাক পড়েছে। সায়েব নাকি কামড়ায় দেরি হলে!

হেসে উঠল শ্রীমতী। তারপর বললে—ওঃ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে গো!

—কালের মহিমে! তা ইটি কে?

হেসে শ্রীমতী বললে—আমার সম্পর্কে বুনঝি! তা কি করি বলুন। হরকল্লা ছুকরি এসে পাশে দোকান করলে। আমার দোকান কানা পড়ল। বুড়ীর দোকানে খাবে না কেউ। তাই ছুড়ীই আনলাম। নমস্কার কর না লো সাবি—!

সাবি হেসে ফেলেই নমস্কার করলে—নমস্কার বাবু! আসবেন—এখানেই চা খাবেন যেন।

টুলু চৌধুবী এসে পড়ল। চলুন।

শ্রীমতীব দোকান ছাড়িয়ে মালতীব দোকান। অনেক ভিড়। ভিতরে চারটে বাচ্চা ছেলে খাটছে। ঠাকুর দুজন। পুরনো ঠাকুরের সঙ্গে এখানকার আর একজন ছোকরা কাজ করে। আগে চাকবের কাজ করে বেড়াত—হারাধন নন্দী। চাঁপা নেই। চাঁপা নবদ্বীপ চলে গেছে।

কুঞ্জুব বাড়িতে মালতী যাওয়া আসা শুরু করতেই সে একদিন বলেছিল—মাসী এবার আমায় বিদেয় দাও।

মুখের দিকে তাকিয়ে মালতী বলেছিল—ভাল লাগছে না মাসী? সে বলেছিল—না!

মালতী বলেছিল—তা হলে যাও। মাসে মাসে আমি টাকা পাঠাব কিছু করে।

—না। দবকাব নাই!

মালতী বলেছিল বেশ!

কথা তার মনে অনেক এসেছিল কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করে নি।

* * *

আজও মালতী চাঁপার কথা ভাবছে। চাঁপা মাসীর চিঠি এসেছে। অসুখে পড়েছে চাঁপা মাসী। কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। চুপ করে ভাবছে আর সামনেব দিকে তাকিয়ে আছে। ভুবনপুবেব হাটে এমনি করেই চেয়ে রইল সে। যে চেয়ে থাকাব মধ্যে দেখা কিছুই হয় না। মনের মধ্যে হিসেব করে আর স্মরণ করেই বেলা কাটে। অভ্যেস হয়ে গেছে। ক্বচিৎ কখনও হঠাৎ কিছু কিছু শোরগোল তুলে ঘটলে সেটা দেখা হয়ে যায়। সে ভাবছিল চাঁপা মাসীকে সে নিয়ে আসবে।

একবার মনে হচ্ছিল আনবে—খুব করে সেবা করবে। তারপর বুঝিয়ে বলবে—মাসী আমি পাপ যাকে বল তা করি নি। · করি নি। করি নি। যাকে পাপ বল মাসী তা দূরের কথা মনও দিই নি। তবে খেলা করাকে যদি পাপ বল আমি পাপী। আমার মন দেওয়া ভালবাসাটুকু সেই হনুমানের বাচ্চাটার মত মরে গিয়েছিল; কিছুদিন' মরা বাচ্চাটার মত মরা ভালবাসা বুকে ধরে বসেছিলাম। মিথ্যে বলব না। বলবই বা কেন মাসী! আমার

আশা নাই—আমি আমার নিজের হাতের বাঁধা ঢেলাটা খুলে দিয়ে এসেছি। মিছে বলব না—সাধ হয়। সাধ আছে। না থাকলে তো চলে যেতাম শহরে বাজারে গো! তাতে আর কত কলঙ্ক হত? যে কলঙ্ক মাথায় চাপছে একটার পর একটা তার চেয়ে কি সে বেশী ভারী হত? হত না। আমার সাধটা যে কিছুতেই ছাড়তে পারছি না গো! আমার সাধ তো বসন্তকে ঘিরে নয় মাসী। যে দিব্যি করতে বল করতে পারি। তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি। বসন্তকে নিয়ে সাধ করেছিলাম—বসন্তোর দোষ দোব না—দোষ আমার হিসাবের ভুলের। বসন্তের পাপ পুণ্যও নাই। ও যে কি তা আমি জানি না। ওর ভয়ও নাই ভালবাসাও নাই। ওর কাজ আছে আর মেয়েদের মন নিয়ে খেলা আছে। গোপা আমাকে নিজে বলছে ওর বিধবা হওয়ার পর যখন ভাসুরের সঙ্গে মামলা বাধে, তখন বসন্ত ওর ভাসুরেরই একখানা সাপ্তাহিক চালাতো। তার চাকর। তবু সে তার মনিবের প্রতিবাদ করেছিল—ঝগড়া করেছিল—ভাসুরের কাগজই ভাসুরের কীর্তি প্রকাশ করে দিয়েছিল। সেই যে যেদিন গোপা ভুবনপুরে এল পরদিন এল বসন্ত! সেই যে গো যেদিন আলো নিয়ে কাণ্ড—যেদিন চমকালাম বসন্তের কথা শুনে—যেদিন তার সঙ্গে চুকিয়ে দিলাম। বললাম—আলোটা নিয়ে যাও; বিয়ে না করে মন দিয়ে ভালবাসা—ও আমার সাধ্যি নাই। পরদিন এল টুলু চৌধুরী বর্ধমানের বাবুটিকে নিয়ে। সেদিন কি হয়েছিল জান? বসন্ত কাগজের দলিল চিঠি সব সরিয়ে নিয়ে চলে এসেছিল—তাতে ছিল গোপার ভাসুরের মৃত্যুবাণ। ওরা পুলিশে খবর দিয়েছিল।

—চার কাপ চা—চারটে চপ—আটখানা নিমকি।

নড়ে উঠল মালতী। চোখ তুললে। একসঙ্গে খদ্দের এসে দাঁড়িয়েছে। যে চাকরটা ওকে খাবার দিয়েছে সে যা দিয়েছে তা বলে। মালতীকে হিসেব করে দাম নিতে হবে।

মালতী হাসলে একটু। হেসে কথা বলতে হবেই! বললে—এক টাকা চার আনা।

দেড়টা টাকা দিয়ে ভদ্রলোক বললে—বাকীটা সিগারেট। উইল্‌স!

মালতী সিগারেট বের করে হাতে হাত ঠেকিয়েই দিলে সিগারেটগুলি।

তারপর মসলার প্লেট বাড়িয়ে ধরলে।

চলে গেল ভদ্রলোক।

তারপর মাসী আবার একদিন টুলু চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন তোমার গৌরাঙ্গের ঝুলন ছিল—তুমি দোকানে এস নি ; তখন আমার সঙ্গে বসন্তের ছাড়াছাড়ির কথা রটেছে। কথা কি করে রটে তা তুমি জান, তার উপর ভুবনপুরের কথা। কথায় আছে 'হাটের মাঝে পড়ল কথা এক নিমিষে যথা তথা।'

তার উপর ভুবনপুরের হাট। টুলু চৌধুরী বলেছিল—টিকুলি বলেছে। তার হবে। টুলু বলেছিল—আমি যদি লিখে দি যে চৌদ্দ পনের বছরে জেলে যাবার আগে বসন্তের চেলাগিরি যখন করতাম তখন থেকে গোপা আমি দুইজনেই তাকে ভালবাসতাম। সেও আমাদের দুজনকে ভালবাসত। আমাকে বলেছিল—বিয়ে করব। ও জাত মানে না—কিছুই মানে না। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সে আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে না। তার কারণ গোপাকে সে ভালবাসে। তার সঙ্গে তার গোপন আসক্তি হয়েছে।

বলেছিল—এ তো মিথ্যে বলা হবে না। ও গোপাকে ভালবাসে। না হলে তোমাকে কথা দিয়ে এখন না বলছে কেন ? আর তুমি তো হাটে বলেছ ওকে ভালবাসার কথা। কথাগুলো লিখে দিলে তোমাকে গোপার ভাসুর এক হাজার টাকা দেবে। আর ওকে তোমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে।

আমি বলেছিলাম—না। তবে গোপাকে ও যে ভালবাসে তার প্রমাণ পেয়েছিলাম, বুঝতে দেরি হয় নি। তোমাকে বলি নি। হনুমান মা-টার মত মরা ভালবাসা বুকে করে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম।

ভালবাসা ভুবনপুরে কেন তিনভুবনেও বোধ হয় নেই। হয়তো থাকে—তা যেমন জন্মায় তেমনি মরে। মন দিয়ে মন পাওয়া যায়—মন আর মানুষ দুটো পাওয়া যায় না। মানুষ নিজেকে দিয়ে আর একটা মানুষকে পায়, সেখানে মানুষের সঙ্গে মন থাকে না। মন মানুষ দুই দিয়ে দুই পেলেও হয় কি জান—আপন আপন মন ঘুরে নেয়। গোপার বেলাতেও তাই হয়েছে মাসী। আমার মনও আমার কাছে—আমার আমিও আমার মাসী—কাউকে দিইনি। দিয়েছি—হাসি দিয়েছি—কথা দিয়েছি পেয়েছি পয়সা টাকা। সুখ—হ্যাঁ সুখও বটে বইকি !

—পাঁচ কাপ চা দশখানা বিস্কুট। একবাক্স সিগারেট ক্যাপস্টেন।

এক দল খদ্দের এসে দাঁড়িয়েছে, পয়সা দেবে।

—আমার এক কাপ চা শুধু।

—একটু দাঁড়ান। এরটা নিই। মিষ্টি হাসে মালতী।—একটু একে একে। আমি তো একা মানুষ।

দশটা শিঙাড়া বারোখানা নিমকি, দুটো বড় রসগোল্লা এনে দিয়েছি!

মোটরের হর্ন বাজছে। সেটেলমেন্ট ক্যাম্পের জীপ বেরিয়ে যাচ্ছে কোথাও।

গাছ থেকে একটা চিল ছোঁ মেরেছে একজনের হাতের ঠোঙায়, সে ঠোঙায় মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছিল।

বেলা একটা বাজছে। এখন চায়ের দোকানে ভিড় কমেছে। তবে শিঙাড়া কচুরি বিক্রি চলছে। মালতী উঠল। স্নান করবে খাবে। তারপর এসে আবার বসবে। ঠাকুরেরা চাকরেরা পালা করে উঠে যাবে স্নান করবে। সেটেলমেন্টের মক্কেলরা খেতে যাচ্ছে। এখন হোটেলে ভিড়। তিনটে হোটেল হয়েছে। খুব চলতি তাদের। দীঘির ঘাটে স্নান করছে। অনেকে কুয়োতলায় মাথা ধুচ্ছে। হাটের আঙিনা খালি করে মক্কেলরা সব উঠে হাটের বাইরে গাছতলায় ডেরা পাতছে। সোমবারের হাট। হাট বসবে। ভুবনেশ্বরতলায় পাণ্ডারা এসে জমেছে। এখন তাদেব চলতি খুব। হাটের আমদানি এরই মধ্যে এসে ঢুকতে শুরু করেছে। শীতের মরসুম এখন তরকারির সময়, তার উপর এবার তরকারি জন্মেছে ভাল। এবং ভুবনপুরের হাটের পাশে সেটেলমেন্ট ক্যাম্প বসায় হাটে আমদানি হচ্ছে দূরদূরান্তর থেকে। সেটেলমেন্ট ক্যাম্প এখন নামেই ক্যাম্প—আপিস হিসেবে ক্যাম্প বলা চলে। নইলে আপিসের জন্য বাড়ি করে দিয়েছে পাণ্ডাদের অবস্থাপন্ন শরিক দেবেন মিশ্র। ওই অশথ বট বেলতলার ডাঙা পাণ্ডাদের। সেবাইত সূত্রে দখল করে ওরা।

আরও বাড়ি তৈরী হচ্ছে। অন্য পাণ্ডারাও দেখাদেখি তৈরী করাচ্ছে। মামলাও চলছে ডাঙা নিয়ে। পাণ্ডাদের সঙ্গে পাণ্ডাদের।

বাড়িতে কুয়ো আছে মালতীর। ছোট্ট উঠোন। এল্ শেপের খানিকটা বারান্দা। রেস্টুরেন্ট ঘরখানা ছাড়া দুখানা ঘর। ঘর দুখানা মালতী ইস্কুলের দিদিমণিদের ভাড়া দিয়েছিল। কিন্তু দিদিমণিরা উঠে গেছে।

মালতীর এখানে দুর্নাম অনেক। ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটি আপত্তি করেছিল। কিছুদিন সেটেলমেণ্টের বাবুদের দিয়েছিল। তাতেও তাদের নামে দরখাস্ত হয়েছে। একটা বেশ্যা শ্রেণীর মেয়ের বাড়িতে ভাড়া আছে সরকারী কর্মচারীরা। তারাও উঠে গেছে। তাতে লোকসান খুব হয় নি মালতীর। বাইরের দিকে দরজাওয়ালা ঘরখানাকে ভাড়া দিয়ে বাকী ঘরখানা থাকতে দিয়েছে বুড়ো ঠাকুরকে। বুড়া ঠাকুরের আশ্রিতা মেয়েটাও থাকে। সে মালতীর কাজ করে দেয়। বাচ্চা চারটের একটা সেও এখানে থাকে।

স্নান সেরে উনোনে ভাত চড়িয়ে দিয়ে মালতী জানলার ধারে বসে ছিল। দোতলায় থাকে সে। ঘরদোরগুলি বেশ গোছানো সাজানো। বাড়িখানা সত্যিই তাকে কুণ্ডু করে দিয়ে গেছে। ওই বর্ধমানের বাবুটি যেদিন এসেছিল তার মাস তিনেকের মধ্যে কুণ্ডুর অসুখ হল। অসুখ হল প্যারালিসিস। ছেলেরা বউরা তাকে নিয়ে বিব্রত হল। তারা বললে নার্স রাখতে। কিন্তু তা রাখলে না কুণ্ডু। সে বাড়ির একটা একপাশের ঘরে থাকতে লাগল। মোটা টাকা দিয়ে চাকর রাখলে। হাসপাতালে মরতে যাবে সে? সে নিজে গড়েছে এত বড় ব্যবসা এবং ভাগ্য—মেলায় মেলায় ঘুরেছে। এতকাল পর শেষ কাল সবারই আসে সবারই আসবে কিন্তু এতকাল ঘুরে সে ঘরে মরবে না? মালতী কুণ্ডুর উপকার ভোলেনি। বরং তার দহরম মহরম একটু বেশীই হয়েছিল।

ওই হেজাক আলোর কথাটায় সে হাটেই শ্রীমতীকে চেঁচিয়ে যা বলেছিল তাতে গাঁ কেন ঢাকলায় গোলগোলাট হয়েছিল কথা অনেক রঙচঙ মেখে। আর বসন্ত নিজেই কুণ্ডুর দোকানে আলোটা কিনবার সময় বলে এসেছিল—কি টাকা আপনি দিয়েছেন কুণ্ডুমশাই হিসেব করে রাখবেন—ওটা আমি দিয়ে দোব। তারপর মিষ্টি মিষ্টি অথচ খুব ধারালো—যাকে মিছরীর ছুরি বলে তাই দিয়ে আঘাত করেছিল কুণ্ডুকে। একটা আঠারো বছরের মেয়ে—আর আপনার বয়স কত? সোত্তর? আপনার বড় নাতনীর ক'টি ছেলে হয়েছে কুণ্ডুমশাই!

কুণ্ডু অদ্ভুত চরিত্রের লোক—সে খুব হেসেছিল। বলেছিল—তা বেশ তো বসন্তবাবু। আপনার বাবা শরৎ ওস্তাদের আমি ভক্ত ছিলাম; কত খানাপিনা করেছি আনন্দ করেছি। ওস্তাদ, আমাকে তবলা শেখাতে

চেয়েছিল—তা একতালার কাওয়ালীতে ঠেকে গেল তালে। বলেছিলাম—আমার বাজিয়ে কাজ নাই ওস্তাদ আমার শোনাই ভাল। সে বলেছিল—সেই ভাল কাকা। আমাকে কাকা বলত। তা সে সম্বন্ধ আপনার সঙ্গে ধরে কাজ নাই, আপনি লীডার মানুষ। তা বেশ তো—আপনার বয়স চব্বিশ পঁচিশ। নতুন কালের মানুষ—লীডার। ওকে নিয়েই আপনি যা হয় করুন।

বসন্ত বলেছিল—আপনারা জাল ফেলে মানুষ ধরেন। ওটা গুটিয়ে তুলে নিতে হবে। আমি দিয়ে দোব ওটা। বুঝেছেন!

পরদিন তখন বসন্ত বর্ধমানের ওই বাবুটি আসার খবর পেয়ে সাইকেলে করে সাঁইতে হয়ে চলে গেছে কোথায়। সাপ্তাহিক কাগজের আপিসের কাগজপত্র সে সরিয়ে নিয়ে এখানে এসেছিল। সেদিন পড়ন্ত বিকেলবেলা কুণ্ডু নিজে এসেছিল মালতীর দোকানে। বে-হাটবার মঙ্গলবার ছিল। মালতীর মন তখনও ওই সদ্য মরা বাচ্চা বুকে-করা হনুমান-মা'টার মত। অবুঝ কান্নায় ভরে আছে। ডাকলে সাড়া দেয় না নড়ে না। লাফালাফি করে বেড়ায় না। অথচ তার কল্পনায় আর সে তখন বসন্তকে নিয়ে ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারছে না। চুপ করে বসে আছে।

কুণ্ডু এসে হেসে বলেছিল—হ্যাঁরে আমি যে একবার এলাম। একটা কথা তোকে বলতে এলাম।

মালতী বলেছিল—বলুন।

—বলছিলাম তুই কি দোকান করবি, না?

—কেন? এ কথা বলছেন কেন?

—বসন্তবাবু কাল হেজাক আলো কিনে আনলে আর বললে সে তো অনেক কথা! তবে বুঝলাম তুই দোকান বোধ হয় করবি না।

ঠিক সেই সময়েই একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে এল ঠাকুর। টিনের চালের বাঁশে টাঙিয়ে দেবে। কুণ্ডু বলেছিল—এ কি? লণ্ঠন ক্যানে রে? হেজাক কি হল?

মালতী বলেছিল—সে আমি ফিরে দিয়েছি কুণ্ডুমশাই। সে যার জিনিস সে নিয়ে গিয়েছে।

—নিয়ে গিয়েছে? সে কি?

—আমি ফিরে দিয়েছি, বললাম তো।

—ফিরে দিয়েছিস? বাজারে হৈচৈ-এর জন্যে? দূর দূর দূর!

—বাজারে হৈচৈএ কি হবে আমার কুণ্ডুমশাই? আমি জেলখাটা মেয়ে।

—তবে?

—সে অনেক কথা।

—বলা যায় না?

—খুব যায়। তার সঙ্গে কি আমার পোষায় কুণ্ডুমশাই! সে এক মানুষ আমি আর এক মানুষ।

কুণ্ডু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলেছিল—দেখ্, ওই শ্রীমতীর আমি অনেক করেছি। মেয়েটা সে আমলে বড় তুফানী মেয়ে ছিল। কথা কইত বড় ভাল—হাসত ভাল, চলত ভাল। আমার সেকেলে মুখ রে—খারাপ কথা বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে। ওকে ভাল লাগত। আমার বাড়ি যেত। আমার পরিবারের সঙ্গে ভাব ছিল। তার কাছে গান গাইত নাচত। হরকল্লা মেয়ে ছিল। খারাপও ছিল। আমাকে পাকড়াবার ওর তাক ছিল। তা কুণ্ডু মাছ ধরত জলে নামত না। হাসিমস্করা—বড়জোর হাত টানাটানি। কিছু মনে করিস না।

মালতীর মন মানুষের মন। সে মন কথায় কথায় মরা বাচ্চাটার কথা ভুলে গিয়েছিল; বুক থেকে নামিয়ে কখন পাশে রেখেছিল খেয়াল নেই। সে কুণ্ডুর কথায় হেসেই বলেছিল—আমিও জেলে আড়াই বছর ছিলাম। বলুন আপনি।

কুণ্ডু বলেছিল যা জোবেদা বলত। বলেছিল—জেল যে সংসারটাই জেল রে। মনে মনে যা হয় যা বলি। তা থাক। যা বলছিলাম। শ্রীমতী অনেক ঝঞ্ঝাটে অনেকবার পড়েছে। ওর স্বামী ওকে ছেড়েছিল। আমিই তাকে ডেকে বুঝিয়ে বলেছিলাম ঘরের পাগল ছেড়ে দিলেই পথে ন্যাংটো হবে! ধরে নাও। ঘরে রাখ। টাকা দিয়ে ব্যবসা করে দিয়েছিলাম, টাকা ওরা দিয়েছে। দেয় নাই তা বলছি না! বেশই সদ্ভাবে ছিল। এক নিচ্ছিল এক দিচ্ছিল। স্বামী মরল। ওই হাটের জায়গা আমারই সস্তা দামে দিলাম। হাট তখন জমছে। এতকাল ভাড়ার বাড়িতে দোকান করত। হাটে দোকান করে ফাঁপল। গাঁঠ লাগল আমার ছ'মাস আগে পরিবার যখন মরল তখন। পরিবার ভুগে মরেছিল। গ্রহণী রোগ দিন রাত্রি বিছানা কাপড় ময়লা করত। গায়ে গন্ধ ঘরে গন্ধ। বউর

করে। কিন্তু দায়ে পড়ে। শিয়রে একা আমি। যেদিন মারা যায় সেদিন ঘরে আর কেউ থাকতে পারে না। ও আসত, বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে যেত। সেদিন আমি বলেছিলাম—শ্রীমতী আজ রাতটা তুই থাকবি? তা আমি পারব না—বলে পালিয়ে এল। ছুটে পালাল—যেন আমি ধরে বেঁধেই ফেলব। তারপর সেই রাত্রে সে মরল। আমি গাঁয়ের, গাঁয়ের কেন চাকলার একজন বড় মহাজন ব্যবসাদার—লোক এল—পুরুষ মেয়ে তত্ত্ব করে গেল। কিন্তু ও এল না। উপরন্তু কানে এল সেদিন যাবার সময় আমাকে গাল দিতে দিতে গিয়েছে। বলে গিয়েছে—তোর দোকানে ধার নি—আমি তোর খাতক, তাই বললি ওই নরককে রুগীর নরক ঘাঁটতে। যা তোর দোকানে আর নেব না। মহাজন। গলাকাটা মহাজন। তারপরও এসেছিস দোকানে মাল নিতে, আমি দিই নি। সাঁইতেতে গিয়ে আমার নামে যা তা বলে এসেছে। বলেছে—আমি বলেছি তুই থাক রাত্রে শ্রীমতী, মরা আগলে বসে আছি রঙ্গরসে সময়টা কাটবে ভাল। তা বলুক। বুঝলি ওতে আমার ছ্যাঁকা লাগে না। দাগও লাগে না। আমি বলি নাই। যদি বলতামও তাতেও লজ্জা পেতাম না। কিন্তু বলে এসেছে আমি গলাকাটা জোচ্চোর ব্যবসাদার! ও আমার সহ্য হয় না। আমাকে শূল বেঁধে। কাঁকড়াবিছের কামড়ের চেয়েও জ্বালা করে। সাঁইতেতে মাল নামিয়ে এখান পর্যন্ত এনে আমি সাঁইতের দরে মাল দি। আমার এত নাম। কখনও খদ্দেরের ওপর নালিশ করি না। যা হোক তা হোক করে শোধ নি। আমার রাগ সেইখানে। এ আমার মনসার রাগ। বুঝলি। তাই তোকে দেখে তোর চেহারা দেখে আর ব্যবসা করবি শুনে রাত্রে মনে হল তোকে যদি পাশে ওই দোকান করে বসিয়ে দি তা হলে ওকে মারতে পারব। তাই তোকে বললাম—তুই রাজী হলি বসিয়ে দিলাম। তুই না করিস তো আমি দোকান তুলব না, আর এক জনকে এনে বসাব।

মালতী বলেছিল—আমি দোকান করব কুণ্ডুমশাই। বললাম তো তার সঙ্গে আমার হয়ে গিয়েছে।

কুণ্ডু উঠে পড়েছিল। বলেছিল—তা হলে আমি যাই। একটা আলো এখুনি জ্বেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা আলো জ্বেলেছে তোকেও জ্বালতে হবে। কাল একটা গ্রামোফোনের ব্যবস্থা করব। বুঝলি। পারিস তো কাল আস একবার।

বিশ মিনিটের মধ্যে একটা আলো জ্বেলে নিয়ে এসেছিল। এ আলোটা বসন্তের আলো থেকে বড়, দামী, দেখতেও ভাল।

শ্রীমতী দোকানে ছিল। সকালে টিক্‌লি বলেছিল ওর কোন বোনঝিকে আনতে গেছে।

সেদিন দোকান থেকে ফেরার পথেই মালতী গিয়েছিল কুণ্ডুর বাড়ি। কুণ্ডুর বাড়ি পাকা বাড়ি, কিন্তু নিজে থাকে মাটির দেওয়াল খ'ড়ো চালের বাংলাবাড়িতে। নিজের চাকর আছে। খ'ড়ো ঘর হলেও ইলেকট্রিক আলো পাখা আছে।

কুণ্ডু হেসে বলেছিল—মরতে রাত্রে এলি ক্যানে?

—রাত্রেই এলাম!

—আমার বদনামের শেষ নাই, তোরও হবে। মরবি।

—আমি জেলখাটা মেয়ে আমার ভয় নাই। আপনি সব কথা বলে এলেন—আমার সব কথা বলে যাই!

—ভাল ভাল ভাল। রাধার বৃন্দে ছিল। তোর আমি। মনের কথা বলবার তো লোক চাই!

না। রাধা আমি নই—হব না।

—ক্যানে?

—রাধার মতন আমি কাঁদি না! কাঁদতে আমি পারি না!

—সাবাস, সাবাস, সাবাস! কিছু খাবি?

—না। বৃত্তান্তটা বলে চলে যাব। আপনি মহাজন আমি খাতক। আপনি যেচে ডেকে বসিয়েছেন দোকানে। সবটা না বললে চলবে না। জীবনের প্রায় সব কথাই সে বলেছিল। বলে বলেছিল—ভুবনপুরের হাটে মন দিয়ে মন পাওয়া যায় বলে। আমি ঢেলা বেঁধেছিলাম খুলে দিয়েছি কালকে। মন দিয়ে মন নিয়ে আমার কাজ নেই। ওর মত মিছে কথা আর হয় না—মন মানুষ মিললে তবে মেলে। মানুষ নিজেকে দিয়ে মানুষকে পায়—তাতে মন পায় না এ হয়। আবার পায় এও হয়। কিন্তু মন দিয়ে মন মানুষ বাদ দিয়ে এ হয় না।

—ওরে! চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল কুণ্ডুর। অবাক হয়ে শুনছিল সে মালতীর কথা। কথা শেষ হতেই চোখ বিস্ফারিত করে বলেছিল—ওরে! তুই এত কথা জানিস!

—শিখেছি জেলে, জোবেদা বিবির কাছে।

—সেটা কে রে ?

—মালতী জোবেদার গল্প বলেছিল তাকে। কুণ্ডু হাত জোড় করে নমস্কার করে বলেছিল—ওরে বাপরে! কালী তারা বলব না কিন্তু, এ যে ডাকিনী যোগিনী রে!

ঢং করে ঘড়িতে আধ ঘণ্টা বেজেছিল। চশমা চোখে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কুণ্ডু বলেছিল ও বাবা সাড়ে এগারটা! দেখ দেখি ফ্যাসাদ!

—কি ফ্যাসাদ ?

—এই রাত্রে বাড়ি যাবি।

—আমি চলে যাব দিব্যি।

—না। আলো নিয়ে দিয়ে আসুক তোকে। কলঙ্ককে তোর ভয় নাই। হোক কলঙ্ক! তবে একটা কথা শুনে যা।

—কি ?

—গোপাকে নিয়ে বসন্ত জড়িয়েছে। বর্ধমানের লোক আমার কাছেও এসেছিল। বসন্ত লুকিয়েছে।

বসন্ত লুকোয় নি ঠিক। বসন্ত বিচিত্র মানুষ। ও একজায়গায় থাকে নি, চারিদিকে ঘুরেছে আর গোপার ভাসুরের সঙ্গে লড়েছে। শুধু লড়া নয় লড়ে জিতেছে। বসন্তের হাতে এমন কাগজ কিছু ছিল যার ভয়ে গোপার ভাসুর গোপার সঙ্গে মিটমাট করতে বাধ্য হয়েছিল। পঁচিশ হাজার টাকা নগদ, গোপার স্বামীর জিনিসপত্র, বর্ধমানে একখানা বাড়ি দিয়ে মিটেছিল মকদ্দমা। তা ছাড়া নিজের গয়নাগাঁটি তো ছিলই। গোপা গিয়েছিল বর্ধমানে মামলা মিটমাটের জন্যে। মামলা মিটবার পর সে বসন্তের হাত ধরে গিয়েছিল বিয়ের রেজেস্ট্রি আপিসে। তারা বিয়ে করেছিল।

ভুবনপুরে কথাটা আসতে দেরি হয় নি। শুধু কথাই নয়, বসন্তও এসেছিল। এসে তার দোকানেও এসেছিল। চা খেয়েছিল কিনে।

যাবার সময় তাকে বলেছিল—ভুল—একটু ভুল আমার হয়ে গেল মালতী—কথাটা ঠিক রাখতে পারলাম না। তবে তার জন্যে দায়ী গোপা

—না থাক—দায়ী তাকে করে লাভ কি? তবুও সংশোধন করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু উপায় ছিল না। গোপার সন্তান হবে!

মালতী অবাক হয়ে শুনেছিল।

এখনও মধ্যে মধ্যে আসে। মিটিং এখনও করছে। হাটেই মিটিং করে। একদিন মিটিংয়ে কে জিজ্ঞাসা করেছিল—নিজের কৈফিয়তটা দিন তো আগে! দে'দের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করলেন কেন? গোপাকে?

গর্জে উঠেছিল বসন্ত।—বিধবা বিবাহ আইনসংগত বলে, বিধবা বিবাহ ধর্মসংগত বলে। গোপা আমাকে ভালবাসত—আমি গোপাকে ভালবাসতাম বলে। আর জাতিভেদ? জাতিভেদ পাপ। জাতিভেদ অন্যায়। জাতিভেদ আমি মানি না।

আশ্চর্য, এক কথায় চুপ হয়ে গিয়েছিল সকলে।

বসন্ত সেদিনও এসেছিল। এখনও প্রায় আসছে। একটা গোলমালে পড়েছে। পড়েছে সেটেলমেণ্টের পাকে। ভুবনপুরের মাটিতেও বটে। ভুবনপুরের মাটিতে ওর পা বসে গেছে। বাড়ি তৈরি করছে বসন্ত গোপার টাকায়। বর্ধমানের বাড়ি বিক্রি করে এখানে বাড়ি করবে। কিন্তু গোল বেধেছে জায়গাটা নিয়ে। ওই দেখা যাচ্ছে জায়গাটা—ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাদের জায়গার মধ্যে দশ কাঠা জায়গা। জায়গাটায় ইট চুন বালি ঢালার পর পাণ্ডারা আপত্তি দিয়ে বন্ধ করেছে। জায়গাটা ছিল খোকাঠাকুরের। খোকাঠাকুর শরৎ ওস্তাদকে একটা স্ট্যাম্পে বসতবাড়ি লিখে দিয়ে গিয়েছে—বলে গিয়েছে নেবেন আপনি আমার যা আছে সব। কিন্তু দলিলের মধ্যে দাগ নম্বর দিয়ে এ জায়গাটা লেখা নেই। তখন এ জায়গাটা ছিল হাটের মানুষের ময়লামাটির জায়গা। এখন পাণ্ডারা আপত্তি করেছে—এ জায়গার মালিক তারা নিরুদ্দেশ খোকাঠাকুরের জ্ঞাতি হিসাবে।

গোপার কাছে বসন্ত টাকা নিয়েছে—প্রেস কিনবে কাগজ করবে। এখানেই করবে। গোপার সন্তান হয়েছিল মারা গেছে।

দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরে ওরা মিটিং নিয়ে মেতে আছে। গোপা নাকি ভোটে দাঁড়াবে। গোপা তাকে বেশ হাসতে হাসতেই বলেছে কেমন ওরা মিটিং করে বেড়িয়ে ঘরে নিজে নিজেকে নিয়ে থাকে।

মালতী জিজ্ঞাসা করেছিল—বেশ সুখে আছিস গোপা?

—সুখ অসুখ বুঝি না—বেশ আছি। ও মদ খায় আমি সিনেমা দেখি। ও বান্ধবী নিয়ে থাকে। আমারও বন্ধু আছে।

তারপর কানে কানে বলেছিল—জানিস, আমিও মধ্যে মধ্যে খাই।

—কি ?

—মদ! পার্টি-টার্টিতে যাই তো। বাড়িতেও মধ্যে মধ্যে খাই। এ তো আজকালকার ফ্যাশন।

দুনিয়াতেই নিত্য নতুন। ভুবনপুরেও তাই। হাটে তাব মেলা বসে। সে পারলে না। সে চিরকেলে খেলা খেলে গেল। ভুবনপুরের হাটে আজ মন দিয়ে মন নিয়ে আজকাল কালপরশু ফেরত-ঘোরত হচ্ছে।

ভাতটা ধরল না কি ?

তাড়াতাড়ি উঠে সে একটু জল দিয়ে নেড়ে দেখলে হ্যাঁ ধরেই গেছে। আজ ভাগ্যে পোড়া ভাত। নামিয়ে ফেললে ভাতটা।

প্রায়ই হয়—নতুন নয়। সংসারে সেই বুঝি পুবনো থেকে গেল। নতুন হতে-হতে হতে পাবলে না। মধ্যে মধ্যে ভাবে যদি সে গোপার মত ধরতে পারত বাঁধতে পারত বসন্তকে তবে সেও গোপার মত সুখ অসুখ না বুঝেই বেশ থাকত। মিটিং কবত। বসন্ত মদ খেত, ও সিনেমা দেখত। পার্টিতে মদ খেত।

না তা সে পারত না। তার মধ্যে একটা আশ্চর্য তৃষ্ণা আছে।

শুধু মন নয় শুধু মানুষ নয়, মন মানুষ দুই নিয়েও হয়তো তার তৃষ্ণা মিটবে না। কিন্তু সে আর পারছে না জীবনকে টানতে! অথচ কলঙ্কের শেষ নেই!

ওঃ! প্রথম কলঙ্ক কুণ্ডুকে নিয়ে।

কলঙ্ক হল—মাসী চলে গেল। তার মন বললে—যাও।

কুণ্ডুর প্যারালিসিস হল। একলা একরকম পড়ে থাকত সেই বাংলোতে। সে গিয়ে দেখে, তার মাথার কাছে বসে বললে—ঘরদোর যে বড় নোংরা হয়ে রয়েছে কুণ্ডুমশাই!

হেসে কুণ্ডু বলেছিল—কে করবে, কাকে বলব? ছেলেরা বলে হাসপাতাল যাও। সে আমি যাব না। মরবার সময় আমার মাথার গোড়ায় তুলসীগাছ দেবে, মুখে দুধ গঙ্গাজল দেবে। আমি হাসপাতালে যাব?

—একটা নার্স রাখুন।

—নার্স? দূর দূর দূর!

—বেশ তো আমাকে রাখুন।

—তুই? তুই থাকবি?

—থাকব। দু'বেলা পরিষ্কার করে দিয়ে যাব।

—উঁহু—থাকতে পারবি?

—তা—। একটু ভেবে হেসে বলেছিল—পারব। রাখুন।

পাশের কামরায় জায়গা করে দিয়েছিল কুণ্ডু। ঢি ঢি পড়েছিল ভুবনপুরে। কুণ্ডুর ছেলেমেয়েরা বিরক্ত হল। তারা আপত্তি করলে।—কলঙ্কের কথাটা শুনছেন না?

কুণ্ডু বললে—না!

মাস দুয়েক সেবার পর সুস্থ হল কুণ্ডু। একটু একটু করে হাঁটছিল লাঠি ধরে।

ওদিকে দোকান দু'মাস লোকসান খাচ্ছিল। শ্রীমতী তার বোনঝিকে নিয়ে ব্যবসা জমিয়ে তুলেছিল। মালতী দোকানে আসছিল না কুণ্ডুকে ফেলে। কুণ্ডু শুনে বলেছিল—তা হবে না। চল রিক্সা করে নিজে যাব আমি।

দোকানে এসে ঠিকেদার ডেকে বলেছিল—তিন মাসের মধ্যে পাকা বাড়ি একতলা হওয়া চাই। করে দাও। দর বেশী দেব।

চার মাস লেগেছিল। ততদিন টিনের দোকানটা খানিকটা সরিয়ে চড় ভাড়ার জায়গায় করিয়েছিল কুণ্ডু। চার মাস পর কুণ্ডু নিজে এসেছিল এই বাড়িতে বাস করতে। দানপত্র করে দিয়েছিল বাড়িটা মালতীকে।

দোকান সাজিয়ে কুণ্ডুই দিয়ে গিয়েছে।

মালতী দোকান করত—মধ্যে মধ্যে উঠে যেত। কুণ্ডুকে দেখে আসত বাইরে খদ্দের আসত ভিড় করে। সে হাসতে হাসতে এসে চেয়ারে বসত।

তারপর কুণ্ডু মারা গেল। এই বাড়িতেই মারা গেল।

মাথার শিয়রে সে তুলসীগাছ দিয়েছিল। ছেলে বউদের ডেকে এনেছিল তারা দুধ গঙ্গাজল দিয়েছিল।

তারপর একে একে কতজনের সঙ্গে কলঙ্ক হল। হিসেব নেই।

মন কখনও কখনও চঞ্চল হয়েছে। সেটেলমেণ্ট আপিসের এব

অল্পবয়সী. বাবু। বেশ লাগত তাকে। সে মালতীকে চেয়েছিল। মালতী চঞ্চল হয়েছিল। কিন্তু শুনেছিল বাবুটির বউ আছে। সে তারপর থেকে রসিকতাই করেছে। তার বেশী নয়।

আরও কতজনের সঙ্গে। কিন্তু এ তার অসহ্য হয়েছে। আর পারে না। মধ্যে মধ্যে পালা শেষ করতে মনে হচ্ছে। তার কামনা বাসনা যেন মধ্যে মধ্যে নদীর বান ডাকার মত ডেকে যায়।

ভগবানকেও ডাকতে পারে না। ভগবানেও তো তার বিশ্বাস নেই। থাকলে, মাসী, মালতী তোমার কাছেই যেত!

শ্রীমতীর দোকানে গ্রামোফোন বেজে উঠল। নাচের গান বাজছে। হাট শুরু হল।

না। এখনও দেরি আছে, দেড়টা বাজছে। ঠাকুর এসে দাঁড়াল। তরকারি এনেছে। আলুভাজা কপির তরকারি মাছের অম্বল। আবার ওটা কি?

ঠাকুর বললে—ডিমের ডালনা।

মালতী বললে—বাপরে এত কেন?

—খাও মা। পৃথিবীতে খাবে না তো করবে কি?

দপ করে রাগ হয়ে গেল। ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু আত্মসংবরণ করলে, বললে—না। নিয়ে যাও। ওটা নিয়ে যাও।

—খাবে না?

—না। বেশ চীৎকার করে উঠল।

ঠাকুর নিয়ে চলে গেল ডালনার বাটি। খেতে বসল সে। অকস্মাৎ া হল তার। সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একখানা দা নিয়ে বাসুদেবকে যেমন কেটেছিল তেমনি কাটতে ইচ্ছে করছে নিজেকে।

গ্রামোফোনে বেজে উঠল এবার আর একখানা গান।

মম অঞ্চল বিজনে·········

ফিতে কারওয়ালা হাঁকছে তার জানালার নীচেই—ফিতে কার। কার তে। জামাই বাঁধলে খুলবে না—

সে উঠে পড়ল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে হাট বসে গেছে। াজ সকালে সকালে বসে গেল হাট। তবে বেলা দুপুর গড়াচ্ছে। এখন য়ের খদ্দের কম। সিগারেট বিড়ি বিক্রি হবে।

সে হাত ধুয়ে একটু শুয়ে পড়ল। তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙল —ঠাকুর ডাকছে।—মা—মা!

—কি?

—বসন্তবাবু গোপা এঁরা এসেছেন—ডাকছেন—

—বসন্ত গোপা? কেন?

—বসবেন একটু।

বিরক্তিভরে উঠল মালতী। দরজা খুলে বেরিয়ে এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে গোপা। বাইরের দরজায় বসন্ত রিক্শার ভাড়া মেটাচ্ছে। তার সঙ্গে একজন কে। একজন নয় দুজন। একজনের বিচিত্র পোশাক, গেরুয়া আলখাল্লার মত লম্বা জামা। পরনের কাপড়টা সাদা। মাথায় একটা গেরুয়া পাগড়ি, চোখে নীল চশমা, লম্বা চুল। মুখে বসন্তের দাগ। একজনের হাত ধরে ঘরে ঢুকছে। অন্ধ না কি? কে? কাকে নিয়ে এল বসন্ত!

সম্ভবতঃ মিটিং করবে। এও একজন পাণ্ডা। বিরক্ত হল সে।

ভরাট গলায় বললে—এই বাড়ি?

বসন্ত বললে—হ্যাঁ।

লোকটি অন্ধই বটে। খুব সাবধানে ঠাওর করে পা ফেলছে। সে ডাকলে—মালতী!

কে? বিস্মিত হল মালতী।

বসন্ত ডাকলে—মালতী!

মালতী সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

ওদিকে গ্রামোফোনে আবার বাজছে—এবার বাজছে তার রেস্টুরেন্টে—বাজছে সেই গানটা—

প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা কোন ভুবনের কোন ভবনে!

মালতী বারান্দায় নামল। নীরসকণ্ঠেই বললে—এস। কিন্তু তার সে ডাক কেউ শুনতে পেলে না। নীল চশমা-পরা পাগড়িধারী লোকটি বলে উঠল—হায় হায় হায়! তারপরই সেই সঙ্গীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে হাত মেলে দিয়ে গেয়ে উঠল—

বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে!

ওরে—

ওরে কোন গেরামে কোন নগরে কোন বিপিনে কোন বিজনে।

ও আমার প্রাণের রাধার—

তারপর হঠাৎ গান ছেড়ে দিয়ে বললে—গাবগুবাগুবটা কই—আমার গাবগুবাগুব।

বসন্ত তার গায়ে হাত দিয়ে বললে—হবে, পরে হবে।

—পরে হবে? কেন?

—ওই দেখ মালতী দাঁড়িয়ে?

এ্যাঁ! মালতী! বলিহারি বলিহারি বলিহারি! কই রে? দুষ্টু মেয়ে কই রে? বীর মেয়েটা কই রে? বাপকে বাঁচাতে বাসুদেবের মত পালোয়ান, অসুর রে একটা, তাকে কেটে জেল খাটলি—বীর মেয়ে তুই কই রে তুই? আমি অন্ধ রে! তুই কই?

মালতী বললে—কে? তার বিস্ময়ের সীমা নেই। গ্রামোফোন রেকর্ডের গানের গলা আর এর গলা এক!

বসন্ত বললে—চিনতে পারছে না?

—চিনতে পারছে না! হা-হা করে হেসে উঠল লোকটি। তারপর গান ধরে দিলে—ওই নীল উজল তারাটি—!

খোকাঠাকুর? নবু ঠাকুর? কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে! মুখে বসন্তের দাগে ভরা। সে রঙ যেন থেকেও নেই! লম্বা—রোগা। চোখ নীল চশমায় ঢাকা। বলছে অন্ধ হয়ে গেছে। সেই দুটি চোখ! কী চোখ! আঃ—! মনের মধ্যে নিঃশব্দে উচ্চারিত হল একটি আঃ আর সঙ্গে সঙ্গে এ কী হল? চোখ জ্বালা করে উঠল—ঠিক জ্বালা করার মত—সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলে চোখে তার জল এসেছে। তার মনের মধ্যে ভাসছে খোকাঠাকুরের সেই রূপ সেই কান্তি। মাসী বলত—সোনাঠাকুর! আঃ! জল বুঝি গড়িয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি মুছে ফেললে চোখের জল। তারপর এগিয়ে এসে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

—মালতী! বাঃ বাঃ—! প্রণাম করছিস। সে হেঁট হয়ে তার মাথার চুলে হাত দিলে। মালতী উঠে দাঁড়াল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলল দাঁড়া দাঁড়া! দেখি দেখি কেমন হয়েছিস তুই! হাত দুখানি মাথার চুল থেকে কপালে তারপর বার কয়েক বুলিয়ে দেখে বললে—বা—বা—বা—এ যে তুই খুব সুন্দর হয়েছিস রে! খুব সুন্দর!

মালতী বুঝতে পারলে পাগলাই হয়েছে খোকাঠাকুর। সে কথাটাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—তোমার একি চেহারা হয়েছে ঠাকুর ?

—কি হয়েছে ?

মালতীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—দেখতে পাও না ?

চোখের চশমা খুলে ফেললে খোকাঠাকুর।—কি করে দেখব ?

ওঃ চোখ দুটো গলে গেছে! আঃ। আবার চোখে জল আসছে।

বসন্ত বললে—চল্ আর উঠোনে দাঁড়িয়ে নয়। একটু বসবার জায়গা দে! সকালে ট্রেনে চেপেছি হাওড়ায়। কি স্নান করবে তো ?

—ওরে বাপরে! নইলে তো মরে যাব গো! কিন্তু সে পরে। আগে তোমার কাজ! হ্যাঁ যা করতে আসা। বুঝেছ! ওরে বাপরে, শুনে অবধি শান্তি নাই! দত্তাপহারী। বাপরে বাপরে! দলিলে না থাকলে কি হবে! আমি তো ওস্তাদকে বলে গিয়েছিলাম, যা আছে সব নিয়ো তুমি। গুরুদক্ষিণে দিলাম। টুলু সরকার সাক্ষী, ধরণী দাস আছে সাক্ষী, শ্রীমন্ত মরে গিয়েছে!

মালতী ঘরে জায়গা করে ওদের নিয়ে গেল। বসিয়ে একটা টেবিল ফ্যান লাগিয়ে খুলে দিয়ে বললে—একটু জল খাও বসন্তদা।

বসন্তদা বললে—চা দে!

খোকাঠাকুর—একটু জল, আমাকে একটু জল। আর আমার চেলাকে চা-টা দে। কি কি খাবে মনা ?

মনা অল্পবয়সী ছেলে। সে বললে—চা-ই খাব।

মালতী চলে যাচ্ছিল। খোকাঠাকুর বললে—তোর লোকজনকে বল, তুই বস। তুই বস।

ঠাকুর বললে মাসী চলে গিয়েছে নবদ্বীপ। তোর সঙ্গে বনল না। তুই খুব ভাল দোকান করেছিস। পাকাবাড়ী হয়েছে। ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে। খুব লাভ। বাহবা বাহবা! তা চাকরদেব বল। তুই বস। কুণ্ডুর তুই খুব সেবা করেছিস শেষকালটায়। আমি বলি—বা বা বা।

মালতীর মন মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু আত্মসংবরণ করলে বললে—একটু পর বসছি ঠাকুর। চাকরে কি পারে এসব ? কতদিন পর এলে। তোমাদের যত্নটত্ন করি! বসন্তদা লীডার মানুষ। পান থেকে চুন খসলে মিটিংয়ে বলে দেবে কোন দিন। গোপা চান করবে ব্যবস্থা করে দি।

খোকাঠাকুর বলে উঠল—ঠিক ঠিক ঠিক। ঠিক বলেছিস। যা যা যা!

মালতী চলে গেল—শুনতে পেলে ঠাকুর গুনগুন করছে। প্রথমেই গোপাকে নিয়ে গেল কুয়োতলায়; স্নান করবে গোপা। গোপা তাকে বললে—খোকাঠাকুর এখন বিখ্যাত লোক রে! গ্রামোফোন রেকর্ডে ওর গান ওঠে। ওই যে 'কোন সজনী কোন স্বজনে' ও তো ওরই গান। বেশ ভাল টাকা পায়। কালচারাল ফাংশনে পয়সা দিয়ে নিয়ে যায়।

অবাক হবার শক্তিও নাই মালতীর। কেমন নির্বাক হয়ে গেছে ভিতরটা। যে কথাগুলো বলে এল সেগুলো যেমন সে দোকানে বসে ভাবতে ভাবতেও হেসে খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলে—দাম নেই, তেমনি ভাবেই বলেছে। আপনার মনের মধ্যে সে ভাবছে সেই খোকাঠাকুরকে সোনাঠাকুরকে আর এই শীর্ণ অন্ধ মলিন দেহবর্ণ লোকটিকে। কিছুতেই মিলছে না। শুধু মিলছে কথায় মনে—সেই মানুষটিই সেখানে!

অনেক নাম খোকাঠাকুরের, অনেক আয় খোকাঠাকুরের। সে কথাটা তার মনে যেন ঢুকল না।

সে একটু হেসে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল চাকরের হাতে ট্রেতে চা চপ শিঙাড়া সাজিয়ে; নিজে হাতে নিয়ে এল শরবতের গ্লাস। আর একটিন গোল্ডফ্লেক সিগারেট। ঠাকুরের বিড়ি খাওয়া গাঁজা খাওয়া মনে পড়ল। ঠাকুর ঘরে বসে তখনও গুনগুন করছে। বসন্ত ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বের করে দেখছে।

সে শরবতটি ঠাকুরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে—খাও।

—এযে মিষ্টি গন্ধ উঠছে রে। রোজ সিরাপ বুঝি। বা বা বা! তুই বড় ভাল হয়েছিস মালতী। বড় ভাল। জানিস চোখ গিয়েছে আজ পাঁচ ছ বছর। বসন্ত হয়ে গেল। তারপর থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম। আমি পারি। মুখে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারি রূপ কেমন! আর গায়ের গন্ধে বুঝতে পারি মন কেমন। ওসব সাবান তেলের গন্ধ নয় রে! একটা গন্ধ আমি পাই। তোর গায়ের গন্ধ আমি পেয়েছি।

—খাও, শরবতটা খেয়ে নাও।

শরবতটুকু খেয়ে গ্লাসটা রাখতে যাচ্ছিল ইশারায় ইশারায়। মালতী তার হাত থেকে গ্লাসটা নিলে।—দাও। দিতে গিয়ে হাতে হাত ঠেকল।

—দাঁড়া—দাঁড়া।

হাতের উপর হাত বুলিয়ে বললে—দেখি। ভারী নরম হাত। ভারী মিষ্টি।

—ছাড়। নাও। সে সিগারেটের টিন এবং দেশলাই তার হাতে দিলে।—খাও! সে বিড়ি টানতে—তার উপর—

হা হা করে হেসে উঠল খোকাঠাকুর।—মনে আছে? হা—হা—হা—হা! একটানে একটা বিড়ি টেনে শেষ করে দিতাম। আর সেই মাস্টারের কান ধরা। হা—হা—হা—হা—।

ঘরখানা কাঁপছে হাসিতে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে—কিন্তু আমি তো আর এসব খাই না রে।

—খাও না? এবার বিস্ময় লাগল মালতীর।

বসন্ত হাত বাড়িয়ে সিগারেট দেশলাইটা নিয়ে বললে—আমাকে দাও। গোল্ডফ্লেক! বাঃ!

—তা ঠাকুর যে এখন বিখ্যাত লোক—অনেক রোজগার—গোল্ডফ্লেক ছাড়া দিতে পারি? তা তুমিও বিখ্যাত লোক—তুমিই নাও!

বসন্ত বললে হ্যাঁ। নবীন বাউল মস্ত লোক। বিখ্যাত লোক! আচ্ছা, আমি ক্যাম্প থেকে ঘুরেই আসি। তুমি বস নবু।

গোপা স্নান করছে। খোকাঠাকুরের সঙ্গের ছেলেটি হাট দেখতে গেল। চলে গেল বসন্ত। বসে রইল মালতী আর খোকাঠাকুর। মালতী বললে—তুমি এ সব ছেড়ে দিয়েছ? অবাক লাগছে!

খোকাঠাকুর হেসে বললে—গলা বসে যেতে লাগল। কিছুতেই সারে না। কোম্পানি বললে ডাক্তার দেখাও। ডাক্তার বললে ক্যান্সার হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। আমি বললাম—তা হোক গলাটা সারিয়ে দেন। ব্যাস তা হলেই হল। তা বললে সিগারেট বিড়ি গাঁজা খেলে গলা দিন দিন বসবে। ক্যান্সারও হবে। বুঝলি—কি করব? গান গাইতে পারব না? ওরে বাপরে বাপরে! দিলাম ছেড়ে।

—ক্যান্সার! এবার কেঁদে ফেললে মালতী। বললে—চিকিৎসা করাও নাই?

—করিয়েছি। পরীক্ষা টরীক্ষা করলে। গলার মাংস-টাংস দেখলে। বললে, না ক্যান্সার হয় নি। তবে সিগারেট গাঁজা খেলে হবে। ক্যান্সার হলে গলাও বসে যাবে। গলা সারল। সেরে গিয়েছে। বলেই সে হাত বাড়িয়ে আ—বলে সুর ধরে গেয়ে উঠল—

কুল আর কলঙ্ক দুয়ের কারে রাখি বলবে কে সে ?
কুল আমার সোনার শয্যে কলঙ্ক মোর কালো কেশে।
কুল রাখি না শ্যাম রাখি হায়—
কুল রাখিলে শ্যাম যে হারায়—
কুল হারালে অকূল পাথার—তল নাই তার ডুবি শেষে !
কুল গিয়েছে শ্যাম গিয়েছে—
সোনার রাধা লুটাইছে—
তবু রাধা কলঙ্কিনী নাম রটেছে দেশে দেশে।

মালতীর চোখের জল আর বাধা মানল না। গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। এ যেন তাকে নিয়েই গান। এ যে সেই। কুলও গেছে তার শ্যামকেও পায়নি। শুধু কলঙ্কের বোঝা বয়ে ভুবনপুরের হাটে সওদা করে চলেছে। জীবনে তার আকণ্ঠ তৃষ্ণা। এক মানুষের কাছে তার নিজের মন নিজেকে দিয়ে তাকে পায় নি, পেলে না। ভুবনপুরের হাটে শুধু পয়সায় জিনিসে বিকিকিনি। তা ছাড়া সব মিথ্যে।

গানটা থামিয়ে খোকাঠাকুর বললে—গলায় আমার কিছু নেই। গলা আমার ভাল হয়েছে। আরও খুলেছে। বুঝলি। এ গানেরও খুব কদর। খুব। গানও আমার। আমার। আমি লিখেছি ! কি চুপ করে রয়েছিস যে ! তারিফ করলি না ? মালতী—চলে গেলি ?

মালতী সরে গেল। খোকাঠাকুর হাত বাড়াচ্ছে তার মুখের দিকে। দেখছে আছে কি না।

খোকাঠাকুর আবার ডাকলে মালতী ! তোর গন্ধ পাচ্ছি তো। চলে তো যাস নি !

মালতী উঠে দাঁড়াল। চোখ মুছে বললে—কি খাবে বল তো ? মাছ টাছ খাও তো ?

—খাই। বুঝলি—মাংস একটু মাংস চাই।

—মাংস খাও ?

—খেতে হবে। ডাক্তার বলেছে। জানিস মালতী ক্যান্সার তো হল না। হল কিন্তু টি-বি। দেখছিস না রোগা হয়ে গিয়েছি।

—টি-বি ?

—হ্যাঁ। জ্বর হতে লাগল। তারপর মুখ দিয়ে গয়েরে রক্ত বেরুল। ভাবলাম গান গেয়ে গলা ফেটেছে। তা আবার ডাক্তার দেখালাম। ওরা ফটো টটো তুললে বুকের। বললে টি-বি। বলে হাসপাতালে যাও। আমি বলি—না। গান বন্ধ হবে। সিটিং হবে না। মরব—গান গেয়েই মরব। মরবার সময়ের জন্যে একটা গান লিখব। একটা লিখেছি সেটা ঠিক মরবার সময়ের নয় একটু আগের। শুনবি—

সঙ্গে ধরে দিলে গান—আ—!

মালতীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে। সে বলতে পারলে না—না থাক!

খোকাঠাকুর গান ধরে দিয়েছে।—

হাটের বেলা ফুরিয়ে গেল ঘাটের খেয়ার ঐ ইশারা।
মাথার বোঝা রাখব কোথায় পাথার নদী নাই কিনারা।
কই দরদী আপন জনা—
কে নেবে মোর মাথার সোনা—
মন মানে না ফেলতে জলে পাওনা আমার যত্নে গোনা।

থেমে গেল হঠাৎ, বললে—তুই কাঁদছিস আমি বুঝতে পারছি। থাক!

মালতী চোখ মুছে বললে—তুমি কোথায় এসেছ এখানে? ওই জায়গা তুমি বসন্তকে দিয়েছ তাই বলতে সেটেলমেন্ট আদালতে?

—হ্যাঁ রে। বসন্ত বাহাদুর খুব বাহাদুর—খুঁজে ঠিক বার করেছে। ঝলি! বললে—আমি এসেছি—তুমি কিছু টাকা নাও। নিয়ে একটা লিখে দাও আমাকে। তোমার তো অভাব নাই।—তা নাই। তা আমি এখন ভাল পাই। তা পাই চাই নাই পাই, গুরুকে মুখে দিয়েছি—লিখতেই ভুল হয়েছে তা বলে টাকা নিতে পারি! তা ছাড়া বসন্ত বাহাদুর—ভাল লোক—বুকের পাটাওলা মরদ। গোপাকে বিয়ে করেছে তো! চোর জোচ্চোরের কাজ করে নি তো! লীডার লোক। ভক্তি করি। এমন লোককে ভক্তি করি। বললাম—টাকা কেন লাগবে গো! টাকা কিসের! চল চল—বলে দিয়ে আসি। আমি দান করেছি। গুরুকে দিয়েছি—বসন্ত আমার গুরুপুত্র! চলে এলাম। বলে দোব—কাজ হয়ে যাবে। কাল চলে যাব। তোদের দেখা হল। ভুবনেশ্বরকে প্রণাম করে এসেছি। যাবার সময় আর একবার করব।

বাইরে হাট চলেছে। একটা বিরাট চাকে মানুষ মৌমাছি ভনভ
গুনগুন করছে। মধ্যে মধ্যে দু' চারটে খুব উঁচু গলায় চীৎকার উঠছে।

হয় ঝগড়া বাদানুবাদ—নইলে কেউ কাউকে ডাকছে। নইলে কে
উঁচুগলায় নিজের জিনিসের নাম করে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু মালতীর মনে হ
সমস্ত ভুবনপুর মধ্যরাত্রির মত স্তব্ধ নিস্তব্ধ। কোথাও কেউ জেগে নেই
তার মধ্যে সে হারিয়ে যাচ্ছে। কথা ফুরিয়ে গেছে—ভাবনা হারিয়ে গেছে—
জীবনটাই—বুঝি ফুরিয়ে যাবে।

* * *

বিচিত্র খোকাঠাকুর। নবীন বাউলের নাম শুনে সেটেলমেণ্ট আপিসের
সায়েব বললে—গান শোনাতে হবে।

খোকাঠাকুর খুব খুশী, বললে—নিশ্চয়। ওই হাটতলায় কিন্তু।

হাটতলায় জোরালো ইলেকট্রিক লাইট জ্বেলে আসর বসল। লোক
খুব হয়েছিল। গোটা ভুবনপুরের লোক।

মালতী বারণ করলে—না। এ কি করছ?

সঙ্গের ছেলেটি নিজে বারণ করতে পারে নি, মালতীকে বলেছিল বারণ
করতে। কিন্তু খোকাঠাকুর হা হা করে হেসে উঠল।

মালতী বললে—তুমি হেসো না ঠাকুর, নিজের ভালমন্দ বোঝ না।

অন্ধ খোকাঠাকুর পায়ে ঘুঙুর বাঁধতে বাঁধতে বললে—ওরে ভুবনপুরের
হাটে গান গেয়ে যাই আমার প্রাণের ঝুলি উজাড় করে। বলেই উঠল—এ
যে পদ হয়ে গেল রে! বাঃ বাঃ—বাঃ—

ওরে ভুবনপুরের হাটে আমার গান গেয়ে যাই
আমার প্রাণের ঝুলি উজাড় করে।
আমার দুখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে সুখ নিয়ে যাই—
প্রাণের রসে তেষ্টা মেটাই কণ্ঠ ভ'রে।
ভুবনহাটের ধুলোর তলায়
হারিয়ে যাওয়া মানত ঢেলায়
কোন জাদুতে করলে মানিক পরব রে গলায়—
কামনারই সোনার সুতোয় গেঁথে পরে যাই।
এ সুখ আমি রাখব কোথা কারে দেব' রে।
আমার প্রাণের ঝুলি উজাড় করে!

অবাক হয়ে গেল মালতী। তার মুখে কথা সরল না। হাতে ধরে আসরে নামিয়ে দিলে, দেখতে দেখতে নবুঠাকুর আলাদা মানুষ হয়ে গেল। হাটের আসরে আলখাল্লা পরে মাতোয়ারা হয়ে গান ধরলে—প্রথমেই ওই গান। তারপর গানের পর গান। সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙুর পায়ে নাচলে। লোকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাহবা দিলে ও নিজেই। হায় হায় হায় করে সরস বাহবা নিজেই দিলে। কখনও বললে—আহা—হা।

সাড়ে দশটা বাজবার পর ভাঙল আসর। তারপরও তার রেহাই হল না। মালতী কেবিনের সামনে চেয়ার পেতে সেটেলমেণ্টের সায়েব বসল—মাঝখানে বসালে খোকাঠাকুরকে। বললে—এবার আপনার কথা শুনব।

নবুঠাকুর হেসে খুন।—কথা আবার কি।

—আপনার গল্প। এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন বাউল হয়ে।

নবুঠাকুর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললে—মানুষের মন দেখুন। রাগ হয়ে গেল। দূর দূর দূর! মানে তখন মনে খুব দুঃখু ছিল। বুঝেছেন। গুরু মন্দ বলত, লোকে মন্দ বলত। গাঁজা খেতাম। হঠাৎ জয়দেবের মেলায় এক বাউলের গান শুনে খুব ভাল লাগল। তাকে ধরলাম! আমাকে শেখাবে? বললে—পারবি? বললে—তবে শোনা একপদ কেমন গান শুনি! তাকে তারই গান গেয়ে শুনিয়ে দিলাম। সে খুশী হল। বললে—চল। কষ্ট কিন্তু অনেক। ওস্তাদ ছিল মেলায়, শ্রীমন্ত ছিল। শ্রীমন্তকে পুকুর দিলাম। আঃ! ওই দেখুন। মুখের কথায় দান—বাবু্‌'া কথা ফিরিয়ে কী কাণ্ডটা কবলে দেখুন। মালতী মেয়েটা ভারী ভাল মেয়ে। ভারী ভাল লাগত! আমার গান শুনবার জন্যে ছুঁকছুঁক করে বেড়াত। তার কি হল দেখুন!

একটু চুপ করে থেকে বললে—তা যা হয়েছে তাই হয়েছে—ভুবনপুরের হাটে নিত্যি ফৌজদারি। ও মানুষের স্বভাব। মারে—মার খায়। দণ্ড ভোগে। ভুগেও কিন্তু মেয়েটা জিতেছে। কী ব্যাপার করেছে দেখুন!

কে বললে—আপনার কথা বলুন।

—আমার কথা? এও তো আমার কথা। মালতীকে দেখে যে কী আনন্দ হল! কী বলব। তেমনি আনন্দ বসন্তকে দেখে! বাহবা বেটাছেলে। তা আমিও বাহবা। বুঝেছেন। আমারও বাহবা আছে। কিছুদিন দু'বছর ঘুরতে ঘুবতে বসন্ত হল। বুঝলেন। ভয়ানক বসন্ত প্রথম

হল গুরুর। গুরু গেলেন—আমার হল। কি করে বাঁচলাম জানি না। বাঁচলাম—চোখ দুটি গেল। তারপর ঘুরি পথে পথে। গুরু বলেছিল যা তোকে দিলাম তু নিজে অভ্যেস করিস—পথে পথে গেয়ে বেড়াস—লোকে শুনবে—তোরও অভ্যেস হবে। ওতেই যা পাবি তাতেই পেট ভরবে। যা ভাববি মনে ভাববি। বুঝলি—মনে রাখবি পাপ নাই পুণ্যিও নাই। যাতে সুখ নাই তাতে পুণ্যি নাই—যাতে দুখ তাতেই পাপ। তবে হিসেব। ওই হিসেব করে সুখ কোথা খোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে কষ্ট পাবি—আবার আনন্দ পাবি—মনের ওই ভাব ছেঁদে গাঁথবি,—পদ হবে। গেয়ে গেয়ে বেড়াবি। তাই বেড়াচ্ছিলাম। একদিন এক জায়গায় নদীর ধারে অনেক গোলমাল। চোখে তো দেখি না। লাঠি ধবে হাতড়ে চলি। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ভাই ? না ছবি তুলছে। বায়স্কোপ। তখন সিনেমা ফিলিম জানতাম না। এখন অনেক শিখছি। অনেক। এখন বই পড়তে হয় লেখাপড়া করি। তা আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। কথা শুনে বুঝছি কিছু কিছু। এমন সময় ওদের একজন লোক আমার পোশাক দেখে বললে—কি ? তুমি কি দেখছ ?

—বললাম—শুনছি বাবা। শুনে বুঝছি।

—বাউলের পোশাক ! গাইতে পার নাকি ?

—তা পারি ! শুনবেন ? শোনানোই আমাব কাজ বাবা !

বললে—বস তা হলে।

কিছুক্ষণ পর ওবা খেতে বসল। আমাকে বললে খাবে ? বললাম—দাও। বললে—মুরগী। বললাম যা দেবে বাবা তাই খেতে গুরুর আদেশ। তবে মুরগী খাই নাই—মাংসটা দিয়ো না—বাকী সব দাও।

খুব হাসি ওদের। তারপর গান শোনালাম। ওই গানটা—বুঝেছেন—প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা। শুনে ওরা খুব খুশী। খুব। বললে—পূর্ণর থেকে কম যায় না। পূর্ণর গান তখন শুনি নাই পরে শুনেছি। ভাল ভাল খুব ভাল। সে যাক—ওরা তুলে নিলে গান—আমাকে কুড়ি টাকা দিলে। একজনা ওরই মধ্যে আমাকে বললে—আমার সঙ্গে কলকাতা চল। ভাল হবে। নাম হবে। রেকর্ডে উঠবে গান। তা চলে এলাম। এই দু'বছর আগেব কথা। লোকে বলে তিনি ঠকিয়েছেন আমাকে। আমার গান রেকর্ড করিয়ে আমাকে একশো টাকা দিয়ে রয়ালটি তিনি নেন। তাঁর

কাছ থেকে এলাম আর একজনের কাছে। তারপরে চ্যালা জুটল। বাসা হল। এখন খুব খাতির করে লোক। তবে লোকে বলে আমাকে ঠকায়। আমি জানি। ছু' তিন জন মেয়ে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ভাবি কি বিপদ! কেউ টাকা নিয়ে সরে। কেউ সুর শিখে সরে। কেউ বলে বিয়ে কর। তা বুঝসেন। বিয়ে কাকে করব। ওখানে আমার গুরুর হিসেব। যে মেয়ে আমার সব হবে। যে মেয়ে আমার মধ্যে ডুববে সে ছাড়া কাকে বিয়ে করব। তা গুরু ত্রাণ করলেন—যেই শুনলে আমার টি-বি হয়েছে অমনি সব ভাগল। আমি বলি টি-বি নয়। গুরুর আশীর্বাদ। জয় গুরু। বুঝলেন। একবার হাজার টাকা রাখলাম বালিশের নিচে—একটা মেয়ে দেখেছিল নিয়ে ভাগল। তারপরে বলে টাকা ধার চাই বাড়িতে অভাব। পরিত্রাণ পেয়েছি। এখন আমাকে ভূতের মত ভয় করে।—

বলে হা হা করে হেসে উঠল।

তারপর বললে—আমার বসন্তদাদা গুরুপুত্র—আমার যা করলে তা গুরুপুত্র ছাড়া কে করবে? ভুবনপুরে নিয়ে এল। মাটিব বাঁধন ঘুচিয়ে দিলে। ভুবনপুরের হাটে বলেই সুরে গাইলে—আহা—

ভুবনপুরের হাটে আমার গান গেয়ে যাই।

বুঝলেন—এটা আজই বাঁধলাম!

মালতী নিজের চেয়ারটিতে বসে শুনছিল।

ঘুম এসেছিল বোধ হয়। টেবিলে মাথা রেখে যেন শুয়েছিল!

আসর ভাঙল—তখন রাত্রি বারোটা।

ঘরে বিছানায় বসেছিল নবুঠাকুর। তার শুয়ে ঘুম হয় নি।—ছেলেবেলাব কথা মনে পড়েছে। ছবির পর ছবি ভেসে যাচ্ছে মনে!

মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে কোথায় একজন কেউ জেগে আছে। বাকী সব নিস্তব্ধ। রাত্রি বোধ হয় তিনটে।

হঠাৎ যেন দরজা খুলে গেল!

নবু বললে—কে! তারপরই সে বললে—মালতী? গায়েব গন্ধ পেয়েছে সে।

মালতী বললে—হ্যাঁ!

—কি রে?

অসংকুচিত কণ্ঠে মালতী বললে—তোমার কাল সকালে যাওয়া হবে না। যেতে পাবে না।

—কেন রে?

—শুধু কাল নয় বরাবরের জন্যে! আমি তোমার সেবা করব।

—মালতী! মালতী! কাছে আয়—শোন।

মালতী এসে কাছে বসল তার। নবুঠাকুর তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বললে—আমার সেবা করবি? তুই আমার সেবা করবি?

—তোমার সেবা করব। তোমার চিকিৎসা করাব, তোমাকে বাঁচাব। ঠাকুর তোমার টাকা আমি চুরি করব না—ধার চাইব না। সুরও শিখব না। যদি পার তোমার নিজেকে আমায় দিয়ো!

—তুই কাঁদছিস? চোখের জল পায়ে পড়ছে। মালতী তুই আমায় নিবি?

মালতী তার পায়ে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে বললে আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে নাও।

নবু বললে—চল। আমার হাত ধরে নিয়ে চল—ভুবনেশ্বরতলায় বাবাকে সাক্ষী রেখে তোকে নিয়ে আসি। নে হাত ধর।

পথে কে কাতরাচ্ছিল জন্তুর মত। একটা মেয়ে। ও টিকলির বোন। পূর্ণগর্ভা ছিল। তার সন্তান হচ্ছে।

নবু বললে—কে? কি?

ওদিকে কে কাঁদছে। ও চুনারিয়া কাঁদছে। তার বাবার অসুখ ছিল।

সে বললে—কিছু নয়। চল।

ওরা ভুবনেশ্বরতলায় গিয়ে উঠল।

শেষ